আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২

# দারুল উলূম দেওবন্দ

এর

# শত্রু-মিত্র

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ -২

# দারুল উলূম দেওবন্দ -এর
# শত্রু-মিত্র

**লেখক :** মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

**প্রকাশক :** মাকতাবাতুস সিদ্দীক
**পান্থনিবাস**, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
বই পেতে: ০১৮৪৫ ৯১৩৬১৩

প্রকাশকাল : রবীউল আউয়াল ১৪৩৯ হি., ডিসেম্বর ২০১৭ খৃ.

মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশত টাকা মাত্র)

وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزلل.

"কিন্তু যদি ব্যক্তি কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে তার জন্য ফাতওয়ার যিম্মাদারী গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক। বলা যায়, ফাতওয়া প্রদান হচ্ছে পুলসিরাত। শত্রুতাভাবাপন্ন ও হঠকারী হওয়া তাকে নিয়ে যেখানে ঝাঁপ দেয় সেখানে তাকে অপাত্রের ভক্তির কারণে তা তার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। মুফতীর কলম তখন ভক্তি শ্রদ্ধার গীতিকার হয়ে যায় বা জল্লাদের তলোয়ার হয়ে যায়। তাকে মুফতীর কলম বলাকে বোকামীসুলভ অপরাধই বলা যেতে পারে"।

"দারুল উলূম দেওবন্দ তার মানহাজের বিচারে এ ক্ষেত্রে কী করবে? যে একজন নাস্তিককে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে কুরআনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাকে দারুল উলূম দেওবন্দ মিত্র হিসাবে কাছে টেনে নেবে না কি তাকে শত্রু হিসাবে দূরে ঠেলে দেবে? দারুল উলূম দেওবন্দকে আমরা যতটুকু জেনেছি, তার শত্রু-মিত্রু চেনার মত যোগ্যতা আছে। যে একটি জাতির ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাকে দারুল উলূম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে এতটা দেউলিয়া হয়ে যায়নি। হোক তার শিরনাম ছোট বা বড়। কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় শত্রু-মিত্র নির্ণয় করার মত যোগ্যতা দারুল উলূম দেওবন্দের রয়েছে"।

"কিন্তু এসব সত্য সত্য হয়ে কী হবে? মায়াকান্নাতো আর সত্যের জন্যও নয়, বড়র জন্যও নয়। মায়াকান্নাতো নিজের মতলবের জন্য। মতলবের বিপরীত হওয়ার কারণে এ জীবনে আমরা কত সত্য আর কত বড় বড়কে বাম হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। নিজের মতলবের সমর্থক হিসাবে সলফের যে অঙ্গকে খুঁজে পেয়েছি সে অঙ্গকে বড় থেকে আরো বড় বানিয়ে বাকি সব অঙ্গকে ছোট থেকে ছোট বানানোর সকল ব্যবস্থা করেছি। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রতিভার কোন তুলনা হয় না"।

“আমরা ছোটদের ছোট মনে আঘাত করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে চলার জন্য তাদের যে সাহস ও হিম্মতের যোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিল সে যোগান না দিয়ে সে হিম্মতের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদের জীবনের বৈপরীত্যগুলো থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তাদেরকে আরো বৈপরীত্যের অনুশীলন করার জন্য তালকীন করেছি”।

“আর যে ভাষা জাসসাস, কাযী ইয়ায, ইবনুল জাওযী, খতীব বাগদাদী, ইবনে খালদূন, ইবনে তাইমিয়া, যাহাবী, ইবনে কাসীর, ইবনে হাজার, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মানাযের আহসান গীলানী রাহিমাহুমুল্লাহ বুঝতে পারেননি সে ভাষা বোঝা আমাদের জন্য কতটুকু জরুরী”?

“কোন একটি ভুলের প্রচার যদি ব্যাপকভাবে করা হয়। লক্ষ লক্ষ জনতার মহাসমাবেশে, হাজার হাজার মুসলমানের মাহফিলে, হাজার হাজার মুরিদের ইসলাহী বয়ানে, হাজার হাজার মানুষের পঠিত বই-পত্রে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পঠিত ও শ্রুত সামাজিক গণমাধ্যমে, -তখন সে ভুলের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, সংশোধন কীভাবে হওয়া উচিত? এবং সে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার সীমারেখা কী হওয়া উচিত”?

“স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নির্ণয়ের শরয়ী মাপকাঠি কী? একটি পক্ষের সঙ্গে কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে পরে সে বিপক্ষ হয়ে যাবে? এবং তার মতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য খুব বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হবে না। আর কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে সে বিপক্ষ হবে না; বরং স্বপক্ষের আওতায় থেকে যাবে? এবং তার কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে অনেক বেশি শক্তিশালী দলিল লাগবে এবং দলিল আসার পরও তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অসম্ভব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে”।

“বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুসলমানরা যখনই কোন ফরয আমল আদায় করার ইচ্ছা করেছে, তখনই প্রশ্ন এসেছে রাষ্ট্রীয় আইনে তার বৈধতা আছে কি

না? যে ফরয আদায় করা রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ সে ফরয আর আদায় করা হয়নি। এক প্রজন্ম আদায় করেনি। আর এর পরবর্তী প্রজন্ম ইজতিহাদের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, ঐ ফরযটি ফরয নয়। এর পরবর্তী প্রজন্ম একই তরিকার ইজতিহাদের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, ঐ ফরযটি হারাম। এর পরবর্তী প্রজন্ম যখন ফরযের তালিকা তৈরি করেছে তখন কুরআন-হাদীস-ফিকহের স্বীকৃত সে ফরযটি আর ফরযের তালিকায় স্থান পায়নি"।

"মনে রাখতে হবে, আমলের জন্য ইলম, আর ইলমের জন্য মাদরাসা। আমাদের কোন আচরণে যেন এমন বোঝা না যায় যে, আমরা ইলমের ব্যস্ততার কারণে আমল করতে পারছি না, আর মাদরাসার ঝামেলায় ইলম অর্জন করতে পারছি না। যে ইলম আমলের জন্য সহায়ক ছিল সে ইলম যেন আমলের জন্য বাধা না হয়ে যায়। এমনিভাবে যে মাদরাসা ইলমের জন্য সহায়ক ছিল সে মাদরাসা যেন ইলমের জন্য বাধা না হয়ে যায়"।

"জাল হাদীস বর্ণনা করা শুধু মাত্র একটি উদ্দেশ্যে জায়েয। আর তা হচ্ছে, এ কথা বলার জন্য যে, এ হাদীসটি জাল। এটি আল্লাহর রাসূলের হাদীস নয়। এর উপর বিশ্বাস করা যাবে না এবং এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা যাবে না"।

"মনে রাখতে হবে, ইসলামের ইতিহাসের সকল বাতিল ফিরকা জাল হাদীসের উপরই টিকে আছে। শিয়া, রাফেযী, নাসেবী, খারেজী, মুতাযিলা, মুস্তাশরিক, বেরেলভী, ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগীসহ আরো যত নামী বেনামী বাগী আছে সবাই এ জাল হাদীসগুলোর উপরই টিকে আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআহ তথা সিরাতে মুস্তাকীমের কর্ণধারগণ কখনো এ বিষয়ে শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই"।

"এভাবে সাময়িক সুবিধার জন্য যদি সহীহ আকীদার খেলাফ কথা বলা, জাল হাদীস বলা, মিথ্যা কথা বলা এবং অসত্য প্রচার করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে প্রত্যেকেই নিজের মত করে দ্বীন ও শরীয়তের ছবি এঁকে ফেলবে, যার সঙ্গে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াস ভিত্তিক দ্বীন ও শরীয়তের কোন সম্পর্ক থাকবে না"।

"লুকোচুরির খেলার পথ বন্ধ করতে হবে। ধমক দিয়ে, তিরস্কার করে, ব্যক্তিগত দুর্বলতার উপর হাত দিয়ে, কুফরী শক্তির ভয় দেখিয়ে, বদদোয়ার ভয় দেখিয়ে, কোন কারামাত দেখিয়ে, ভবিষ্যৎবাণী করে, ধৈর্য ধরার কথা বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না"।

"প্রশ্ন হচ্ছে, ........ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সেই পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল যে পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্তির সূচনা হয়েছে এবং ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি সম্পন্ন হয়েছে"।

**"একটি উপসর্গ**

কোন দেশকে দারুল ইসলাম বলার মত দলিল নেই, আর দারুল হারব বলার মত হিম্মত নেই এবং দারুল হারব বলার পর যা করণীয় তা শুনলে রীতিমত ...... শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সর্বকূল রক্ষা করার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে 'দারুল আমান' নামের একটি উপসর্গকে।

অথচ এটা কোন আলাদা দারের নাম নয়। এটা হচ্ছে দারুল হারবেরই একটি সাময়িক অবস্থা। আর সে সাময়িক অবস্থা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লাগবে দু'টি পক্ষ। এক পক্ষ কাফের, এক পক্ষ মুসলমান। দুই পক্ষের মাঝে একটি সাময়িক চুক্তি হবে। কিন্তু এখানে কোথায় সেই পক্ষ, কোথায় 'আমান' বিষয়ক আলোচনা? এসব কিছুই তলিয়ে দেখার দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন সাময়িকভাবে জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করা। কিন্তু জান যে আখের কোনভাবেই বাঁচবে না -এ কথা চিন্তা করারমত সময়ও নেই, মানসিকতাও নেই"।

"বড়দের মাথায় এ বাস্তব অবস্থাটি থাকলে সবার জন্য ভালো হত। নয়ত হঠাৎ যে দিন তুফান এসে দোরগোড়ায় আছড়ে পড়বে সে দিন হয়ত বলা যাবে, আমাদেরকে আগে কেন খুলে বলনি? কিন্তু এ দাবি তখন কোন কাজে আসবে না"।

# এতে যা আছে

## গ্রিক দেবী-অপসারণের দাবি



## শাপলা চত্বর-কওমী সনদের স্বীকৃতি

## নাস্তিক-বড় সংলাপ ১



## নাস্তিক-বড় সংলাপ ২

## ঢাকা-ওলামাবাজার-হাটহাজারী



## রাজার দরবার-রাজার কারাগার



## ইসলামী খেলাফত-ইবাদত

## সহীহ বুখারী ও ফাতওয়া শামীর খতম

## উলূমে হাদীস, ভাষাচর্চা-বেয়াদব



## নিঃশব্দ হাদীসের পাঠদান-উসূলে হাদীস

## মানসুর হাল্লাজ চরিত-খতমে তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয-একলক্ষ ফাতওয়া-ভেদে মারেফত-ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা-সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও জিহাদ-ফাতাওয়ায়ে মাদানীয়া এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সমাচার

## হাল্লাজের তথ্য উপস্থাপন-বহিষ্কার



## পঁয়ষট্টি বছর-ছোট



## ইলম-আমল বা مراتب ترك العمل بالعلم

## সংযুক্ত

# হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে দেয়া বান্দার সেরা উপহার কুরআন মাজীদের একটি আয়াত

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠)

বারবারই মনে আসছে, তিলাওয়াত করতে মন চায়। কিন্তু স্মরণ শক্তির দুর্বলতার কারণে পূর্ণাঙ্গ আয়াত প্রায়ই তিলাওয়াত করতে পারি না।  দুয়েকটি শব্দ বা আয়াতের বিষয়বস্তুর আবছা ছায়া পড়ে। ততটুকুতেই অনেক আশার আলো জাগে, একেবারেই নতুন কোন পরিস্থিতির শিকার হয়েছি বলে যে ধারণা তৈরী হতে চায় তা দূর হয়ে যায়।

নিরাশ হওয়ার মত ভয়ঙ্কর কারগুজারী সামনে এসেছে, নৈরাশ্যকে সবচাইতে সহজ উপায় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নৈরাশ্যের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠেছি। সচেতন-অচেতন উপহাসকারীর তীর্যক আঘাতের বিপরীতে নৈরাশ্যের ফাঁসীর রশি আমার কাছে অনেক বেশি বিশাক্ত ও ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে।

বড়ত্ব ও সচেতনতার মাপকাঠি কেউ দেয়নি, বড় ও সচেতনের কোন তালিকাও কারো কাছে পাইনি। কোথাও  কোন বড় ও সচেতনের দেখা পেয়ে থাকলে তার সঙ্গে আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে অন্য কোন বড়র উদ্ধৃতির মাধ্যমে, যার হয়ত কোন অস্তিত্ব নেই, নয়ত তিনি পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

বড়ত্বের উদ্ধৃতির বাহানায় আমি কখনো পুল পার হতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে দুই ভাবে। অতীতের কোন বড়র উদ্ধৃতি দিলে জবাব পেয়েছি, 'তিনি তো বর্তমানের হালত জানতেন না, তাঁর যামানার হালত হিসেবে তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন যা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়'। বর্তমানের কোন বড়র উদ্ধৃতি দিলে জবাব পেয়েছি 'তিনি আবার বড় হলেন কবে? তিনি তো আমাদেরই মত বা আমাদের চাইতেও ছোট'।

বড়র উদ্ধৃতির পাশাপাশি আরেকটি উদ্ধৃতি পেয়েছি সংখ্যাধিক্যের। অর্থাৎ হক-বাতিল নির্ণয়ে আব্রাহাম লিংকন পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ভোটাভোটির মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার নির্ণয়।

এমন পরিস্থিতিতে নৈরাশ্যের চাইতে নিরাপদ কোন পন্থাই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। কারণ এমনটি চলছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শুরু করে অজ্ঞতার সর্বনিম্ন সমাবেশ পর্যন্ত। তাকওয়ার সর্ববৃহৎ আঙ্গিনা থেকে দাজ্জালের সর্বোচ্চ মিনারা পর্যন্ত।

কিন্তু, কিন্তু নৈরাশ্য যে হারাম! এটা কুফরীর পথ!! তাই একটি প্রচেষ্টা ছিল নিজেদের সংশোধনের। এবারের প্রচেষ্টা শত্রু-মিত্র চেনার। শত্রু-মিত্রের পরিচয়ের। পরিচয় ও সংজ্ঞার আলোকে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার দায়িত্ব এবারের মত পাঠকের হাতেই থাকল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুন। পারিপার্শ্বিক সকল দুর্বলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। দীর্ঘ কালের লালিত ভুলের মূর্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এ ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রহ. এর একটি নসীহত বাণী আমরা স্মরণে রাখতে পারি। এতে যদি বোঝা কিছুটা হালকা হয়-

وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزلل.

আশা ছিল, আমরা কিছুটা সাহসী হয়ে উঠব। অথবা বড়রা আমাদের অসহায়ত্বকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করবেন। কোনটাই হয়নি। বড়রা অস্পষ্ট ধাক্কা দিতে চেয়েছেন। আর আমরা কিছুটা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছি। বিপরীতমুখী জীবনের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি।

-যুবায়ের

## দু'টি কাফেলা

চলমান পৃথিবীর অসংখ্য কাফেলার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র দু'টি কাফেলা আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়।

একটি কাফেলার উপাধী ও পরিচায়ক শব্দাবলী হচ্ছে পর্যায়ক্রমে মুহাককিক, গবেষক, মু'তাদিল, সচেতন, মুত্তাকী, দরদী, সতর্ক, দূরদর্শী, সমাদৃত, অভিজ্ঞ ও আকাবির। এর সঙ্গে আরো রয়েছে সাদেকীনের জামাত, কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন, আমীরে মুহাব্বত, মুনাযিরে যামান, মুহিউস সুন্নাহ, বাতিলের আতংক, আলেমকূল শিরোমণি ও শরীয়তের মেজায শেনাছ, কুতুবে আলম, কুতুবে বাঙ্গাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেকটি কাফেলার উপাধী ও পরিচায়ক শব্দাবলী হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ভাসা ভাসা চিন্তার অধিকারী, ভাসমান, কট্টরপন্থী, অচেতন, বেআমল, হৃদয়হীন, অসতর্ক, অপরিণামদর্শী, ধিকৃত, উপেক্ষিত, অনভিজ্ঞ ও ছোট। এর সঙ্গে আরো রয়েছে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গ্রন্থ ও যন্ত্রে বিশ্বাসী, শরীয়তের মেজায সম্পর্কে অনবগত, বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টিকারী, তরুণদের মনে বিদ্বেষ-অবিশ্বাস সৃষ্টিকারী, খারেজি আকীদা পোষণকারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

## দু'টি কাফেলার ভাবনা

এখানে বলে রাখা ভালো হবে যে, উভয় কাফেলাকে দেয়া এ উপাধীগুলো প্রথম কাফেলা কর্তৃক প্রদত্ত। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে আমি একজন আকেল-বালেগ-মুসলমান। আর একটি প্রজন্মের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হওয়ার জন্য এতটুকু উপযুক্ততা যথেষ্ট। এ উপযুক্ততার ভিত্তিতেই বাবা-মা ও উস্তাযগণ নামায, রোযা, পর্দা, হালাল-হারাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবহেলার সুযোগ দেননি। সে একই উপযুক্ততার ভিত্তিতে কয়েকটি দশকের সাক্ষী হওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করছি এবং সে সাক্ষ্য প্রদান করাও নিজের উপর ওয়াজিব মনে করছি।

তাই বলছি। উভয় কাফেলার এ উপাধীগুলো প্রথম কাফেলা কর্তৃক প্রদত্ত। এরই বিপরীত দু'টি কাফেলার ব্যাপারে দ্বিতীয় কাফেলার মূল্যায়ন একটু ভিন্ন রকম। তারা বলছে, প্রথম কাফেলা তাদের নিজেদের জন্য যে উপাধীগুলো নির্বাচন করেছে তা নিয়ে বিতর্ক করার কোন মানসিকতা আমাদের নেই। তবে এর সঙ্গে যে অযাচিত উপসর্গগুলো প্রথম কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার মধ্যে রয়েছে-

তারা কুফরী শক্তিকে ভয় পায়, আল্লাহর দুশমনকে দুশমন ভাবতে দ্বিধাবোধ করে, জীবনের অর্জনগুলোকে কুরবান করতে মন প্রস্তুত নয়, তারা মনে করে মৃত্যুর ফেরেশতা যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছা যত সহজ সুদৃঢ় প্রাসাদে পৌঁছা তত সহজ নয়, সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো তাঁরা উল্টে দেখেননি এবং দেখতে রাজিও নন, একটি আমলের ফযীলত দিয়ে আরেকটি ফরয আমল তরক করাকে বৈধ মনে করেন, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের মূলনীতির বিপরীতে সৌজন্য রক্ষা ও আবেগকে প্রাধান্য দেয়া জরুরী মনে করেন, ছোটরা দলিল জানতে চাওয়ার অধিকার রাখে না বলে মনে করেন, ঝুঁকিমুক্ত দীনদারীকে প্রাধান্য দেন, প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে পা ফেলতে শঙ্কাবোধ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

## দ্বিতীয় কাফেলার আরো ভাবনা

দ্বিতীয় কাফেলাটি তাদের নিজেদের উপর আরোপিত উপাধীগুলো সম্পর্কে কোন বিতর্কে না জড়িয়েও যে দাবিগুলো করতে চায় তা হচ্ছে, তাদের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির আলোকে নিজেদের উপর যে ফরয দায়িত্বগুলো বর্তায় শুধু ধমকের মাধ্যমে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের এসব ফরয দায়িত্ব আদায়ের পথ খুঁজে চলেছে। ফিকহের কিতাবের যে অধ্যায়গুলোর উপর পিন মেরে দেয়া হয়েছে, যে পৃষ্ঠাগুলোকে সীলগালা করে দেয়া হয়েছে সে অধ্যায়গুলো ও পৃষ্ঠাগুলোতে কী আছে তা তারা দেখতে চায়। স্বীকৃত বিদআতীদের সঙ্গে অমিলগুলো খুঁজে বের করতে চায়। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের শত্রুদের সামনে দ্বীন-আহলে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন-আহলে ইলমে দ্বীনের দুর্বলতার কারণ বুঝতে চায়। দেশের মালিক পক্ষের ধর্মীয় অবস্থান জানতে চায়। দেশের ধর্মীয় অবস্থান জানতে চায়। কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কের ধারাগুলো জানতে চায়। দেশের কুফরী আদালতের সঙ্গে মুসলমানের কী সম্পর্ক হওয়া চাই তা জানতে চায়। সর্বোপরি এসব বিষয়ে তাদের কাছে যেসব তথ্য উপাত্ত রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে চায়। বৈপরীত্বের জাঁতাকল থেকে বের হতে চায়। ভেতর বাহিরকে এক করতে চায়।

এ হচ্ছে দু'টি কাফেলার প্রত্যেকটি তাদের নিজেদেরকে কীভাবে দেখতে পছন্দ করে এবং অপর পক্ষকে কী ভাবতে পছন্দ করে তার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র। মৌলিক কিছু ধারণা। এর শাখা প্রশাখা অনেক।

## দু'টি কাফেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দু'টি কাফেলার আরেকটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা পরিভাষায় দু'টি কাফেলার নাম হচ্ছে বড় ও ছোট। প্রথম কাফেলাটি হচ্ছে বড়। এর সকল সদস্যই বড়, বয়স ও যোগ্যতা কম হোক বা বেশি হোক। আর দ্বিতীয় কাফেলাটি হচ্ছে ছোট। এর সকল সদস্যই হচ্ছে ছোট। বয়স ও যোগ্যতা কম হোক বা বেশি হোক। প্রায় শতাব্দীকাল থেকেই বলা যায় প্রথম কাফেলাটির নাম বড়, আর দ্বিতীয় কাফেলাটির নাম ছোট।

প্রজন্মের একজন অবিবেচক দর্শক হিসেবে বিগত কয়েক দশক এ দ্বন্দ্বের শুধু সাক্ষী ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে দু'টি পক্ষের কোন একটির পক্ষ গ্রহণ করার মত বয়স হয়েছে, অথবা পক্ষ গ্রহণ না করলেও দু'টি মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণাকে আলোচনার টেবিলে আনার মত বয়স আমার হয়েছে।

এছাড়া আমরা যারা দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দারুল উলূম দেওবন্দের মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণায় বেড়ে উঠুক সে কামনা করি তাদের দায়িত্বে এ বিষয়টি আসে যে, তারা দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু ও মিত্রকে চিনবে এবং অন্যদেরকে চিনিয়ে দেবে।

## শত্রু-মিত্র চেনার মাপকাঠি

শত্রু-মিত্র চেনার জন্য দু'টি মূলনীতিকে সামনে রাখলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা কমে আসবে বলে আশা রাখছি। একটি হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দ যদি দলিলভিত্তিক দ্বীন চর্চার একটি দুর্গ হয়ে থাকে তাহলে দলিলমুক্ত ও ইলমমুক্ত দ্বীন চর্চাকারীরাই এর শত্রু হবে। এরকমভাবে দারুল উলূম দেওবন্দ যদি ইলম ও আমলের সমন্বয়ের নাম হয়ে থাকে তাহলে ইলমের বাস্তবায়নে যারা অনাগ্রহী ও বাধাপ্রদানকারী তারাই দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে।

দারুল উলূম দেওবন্দ পথচলার দেড় শতাব্দীকাল পার হওয়ার পর যদি এর শত্রু মিত্রের ব্যবধান অস্পষ্ট হয়ে যায়, দু'টি বিপরীত মেরু যদি তালগোল পাকিয়ে ফেলে, আর সময়ের সাক্ষীরা সঠিক সাক্ষ্য উপস্থাপন না করে, তাহলে প্রজন্ম তাদেরকে ক্ষমা করবে না। তাই নিজের দেখা ও শোনা সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি। বড়, ছোট ও দারুল উলূম দেওবন্দ এ তিনটি শিরনামে আমরা সাক্ষ্য উপস্থাপন করে যাব। এবারও বড় ও ছোটর নাম ঠিকানা উল্লেখ করা থেকে

বিরত থাকার খেয়াল করেছি। নাম ঠিকানা পেতে হলে পাঠকবর্গ সম্ভবত আরো দু'চার সিরিজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

## গাঙ্গুহী রহ. এর ইত্তেবায়ে ইলম ও ইত্তেবায়ে আকাবির

বড়, ছোট ও দারুল উলূম দেওবন্দ এ তিনটি শিরনামের প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দের স্বপ্নদ্রষ্টা শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহুর একটি ঘটনা বা মানহাজে ইলমীর বিশ্লেষণমূলক একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। পাঠকবর্গ ধ্যানের সাথে, ইবরতের দৃষ্টিতে ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে দেখুন এবং মূল কিতাব থেকে তা বিস্তারিত দেখে নিন।

'তাযকেরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ' থেকে প্রসঙ্গ উল্লেখসহ গাঙ্গুহী রহ. এর বক্তব্যটি উল্লেখ করছি। মাওলানা আযীযুর রহমান বিজনূরী সাহেব গাঙ্গুহী রহ. এর ইলমী মানহাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

"ফিকহ ও ফাতওয়ার বিষয় ইলমী প্রজ্ঞার পাশাপাশি তীক্ষ্ণতা ও সুষ্ঠু মানসিকতার উপরও নির্ভরশীল। কারো মন মানসিকতা যদি স্বাধীন হয়। মাযহাবের ইমামের তাকলীদের মাধ্যমে শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধার শিকল যদি তার গলায় না পরে থাকে। এমনিভাবে একান্তভাবে সে বিশ্বাস লালন করে যে, তাকে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে -তাহলে ইনশাআল্লাহ তার প্রদত্ত ফাতওয়ার মাঝে সত্যতা ও বাস্তবতাই থাকবে।

কিন্তু যদি ব্যক্তি কারো প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে তার জন্য ফাতওয়ার যিম্মাদারী গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক। বলা যায়, ফাতওয়া প্রদান হচ্ছে পুলসিরাত। শত্রুতাভাবাপন্ন ও হঠকারী হওয়া তাকে নিয়ে যেখানে ঝাঁপ দেয় সেখানে তাকে অপাত্রের ভক্তির কারণে তা তার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। মুফতীর কলম তখন ভক্তি শ্রদ্ধার গীতিকার হয়ে যায় বা জল্লাদের তলোয়ার হয়ে যায়। তাকে মুফতীর কলম বলাকে বোকামীসুলভ অপরাধই বলা যেতে পারে।

ফাতওয়া প্রদানের এসব গুণাবলীই হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর ফাতওয়ার কলমের অর্জিত ছিল। তাঁর কলম না লানত ও গালাগালিকে ভয় পায়, আর না হুমকী ধমকীতে (উর্দূ: দার দরসন) ঘাবড়ে যায়। এমনিভাবে অপাত্রে এবং অন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধার রোগেও আক্রান্ত নয়। বরং তাঁর কলম আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত এবং ফিকহে হানাফীর বেড়ি নিজের

গলায় পরে আছেন। নিচে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে যা শুধুমাত্র হকপন্থীদেরই কলমের বৈশিষ্ট্য।

**কেয়াম-মিলাদঃ** হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজির মক্কী কেয়াম-মিলাদ করতেন। তিনি এর প্রবক্তাও ছিলেন। তাঁরই অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কিছু বিষয়ের বিবেচনায় হযরত থানভী রহ.ও কানপুরে অবস্থানের শুরুর দিকে এ মতের উপরই ছিলেন। তখন হযরত গাঙ্গুহী রহ. তাঁকে জবাব দিয়ে লিখেছিলেন-

'আর দ্বিতীয় বিষয়টি যদিও আপনার অস্বাভাবিক ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে অপছন্দ হবে এবং আমি বান্দাকে বেয়াদব গোস্তাখ মনে হবে। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আমার জন্য কোন সমস্যা নয়। বিষয়টি হচ্ছে, বান্দা যে হযরত শায়খের (হযরত হাজী সাহেব) কাছে বাইয়াত হয়েছি, এমনিভাবে আরো যেসব ওলামা ও গন্যমান্য ব্যক্তিরা প্রাচীন কাল থেকে বাইয়াত হয়ে আসছেন -এ বিষয়ে কথা হচ্ছে, ইলম থাকা সত্ত্বেও গায়রে আলেমের কাছে যে বাইয়াত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তা এ জন্য যে, যাতে উস্তাযের কাছ থেকে এবং দ্বীনী কিতাবাদি থেকে তারা যা শিখেছে এবং যে ইলম হাসিল করেছে কোন আল্লাহ ওয়ালা শায়খের সান্নিধ্যে গিয়ে সে ইলমকে বিশ্বাসে পরিণত করে নিতে পারে, যেন সে ইলম মোতাবেক আমল করা নফসের জন্য সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে অর্জিত ইলম যেন প্রত্যক্ষ ইলমে পরিণত হয়।

যোগ্যতা অনুপাতে কেউ কখনো এ জন্য বাইয়াত হয় না এবং কেউ এ জন্য বাইয়াত হয়নি যে, আমরা যা পড়েছি তা সঠিক না বেঠিক -তা কোন গায়রে আলেমের কাছ থেকে যাচাই করে নেব। এমনিভাবে এ জন্যও নয় যে, কুরআন হাদীসের আলোকে তাহকীককৃত বিধিবিধানগুলোকে তাঁর মতের মত করে সাজাব। এভাবে যে, তিনি যাকে ভুল বলবেন আপনি তাকে ভুল মেনে নেবেন, আর তিনি যাকে সহীহ বলবেন আপনি তাকে সহীহ মনে করবেন। মনে রাখবেন, এ মানসিকতা স্পষ্ট বাতিল-অসার।' (তাযকিরাতুর রশীদ পৃঃ ১২২)

শুধু এতটুকুই নয়; বরং হযরত হাজী সাহেবের 'হাফত মাসআলা' কিতাবটি যখন তাঁর কাছে পৌঁছেছে তখন তিনি তা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম)। মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বহু হৈ চৈ করেছে এবং এ কথাও প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে যে, হযরত গাঙ্গুহীর নিসবত (ইজাযাত) কেটে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি বিন্দু পরিমাণও কোন কিছুর পরওয়া করেননি এবং যে কথাটি সঠিক ছিল তা বলে দিয়েছেন।

হযরত হাজী সাহেব রহ. রমযান মোবারকে বড় জামাতের সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। গাঙ্গুহী রহ. হানাফী মাযহাবের আলোকে সে জামাতকে মাকরূহ তাহরীমী বলে দিয়েছেন। তিনি এর সামান্য পরওয়াও করেননি যে, এর কারণে কী পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এবং মানুষ কী বলবে। এমনিভাবে 'ইমকানে কাযিব ও কাউয়ে কী হিল্লত' বিষয়ে তিনি যে ফাতওয়া দিয়েছিলেন এবং যে ফাতওয়ার উপর তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) কাফের ও বেদ্বীন পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছু তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর এ সত্যবাদিতা এবং সত্য পথের অনুসরণ ও প্রচারের অবদানগুলো তাযকিরাতুর রশীদ, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া ও মাকতুবাতে রশীদিয়ার পাতায় পাতায় ভরে আছে। নিঃসন্দেহে তিনি কুতুবুল ইরশাদ ও মুজাদ্দিদুল মিল্লাত ছিলেন। সত্য বলা ও স্পষ্ট করে বলার ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় শোরগোল এমনিভাবে মানুষের সমর্থনের স্বল্পতা ও আধিক্য কোন কিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি।"

-তাযকিরাতুর রশীদ, পৃষ্ঠা ১২২, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, বরাতে, তাযকেরায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ, মুফতী আযিযুর রহমান বিজনূরী, পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৪৮ থেকে গৃহীত।

## ইমাম যাহাবী রহ. এর হৃদয়ের অর্তনাদ অনুভব করতে হবে

প্রজন্মের একটি কাফেলার কাছে আল্লাহর খাস বান্দা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন এমন কিছু মানুষের কিছু মৌলিক ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রেক্ষিতে ইমাম যাহাবী হৃদয়ের একটি অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন। পাঠক বেয়াদবি মনে না করলে বলতে মনে চাচ্ছে, আমার মনে হয়েছে তাঁর হৃদেয়ের সে ব্যথার সঙ্গে আমার মনের অবস্থার কিছুটা মিল রয়েছে। তাই তাঁর সে কথাটি পাঠকের দরবারে তুলে ধরছি। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইবনুস সাবঈনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين.

القرشي، المخزومي، الشيخ قطب الدّين، أبو محمد المرسي، الرقوطي، الصوفي.

كان صوفياً على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. وله كلامٌ كثير في العرفان على طريق الإتحاد والزندقة، نسأل الله السلامة في الدّين.

وقد ذكرنا محط هؤلاء الجنس في ترجمة "ابن الفارض " و"ابن العربي"، وغيرهما. فيا حسرةً على العباد كيف لا يغضبون لله تعالى، ولا يقومون في الذب عن معبودهم، تبارك اسمه، وتقدست ذاته، عن أن يمتزج بخلقه أو يحل فيهم. وتعالى الله عن أن يكون هو عين السموات والأرض وما بينهما. فإن هذا الكلام شرٌ من مقالة من قال بقدم العالم،

ومن عرف هؤلاء الباطنية عذرني، أو هو زنديقٌ مبطنٌ للاتحاد ويذب عن الاتحادية والحلولية، ومن لم يعرفهم فالله يثيبه على حسن قصده. وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزلل. فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافراً، مع أنا لا نشهد على أعيان هؤلاء بإيمانٍ ولا كفرٍ لجواز توبتهم قبل الموت. وأمرهم مشكل، وحسابهم على الله.

وأما مقالاتهم فلا ريب في أنها شر من الشرك، فيا أخي ويا حبيبي اعط القوس باريها، ودعني ومعرفتي بذلك، فإنني أخاف الله أن يعذبني على سكوتي، كما أخاف أن يعذبني على الكلام في أوليائه. وأنا لو قلت لرجلٍ مسلم: يا كافر، لقد بؤت بالكفر، فكيف لو قلته لرجلٍ صالح أو وليٍّ لله تعالى؟

ذكر شيخنا قاضي القضاة تقيّ الدّين ابن دقيق العيد قال: جلست مع ابن سبعين من ضحوةٍ إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاماً تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته.

قلت: واشتهر عنه أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله: لا نبي بعدي.

وجاء من وجهٍ آخر عنه أنه قال: لقد زرب ابن آمنة حيث قال: لا نبي بعدي.

-তারীখুল ইসলাম যাহাবী ৪৯/২৮৩, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

## দ্বৈত নীতি পরিহার করতে হবে

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আরেকটি সত্যও আমরা স্বীকার করে নিতে হবে যে, ইলমের মূলনীতিকে তার গতি অনুযায়ী চলতে দেয়া হচ্ছে না, যারফলে প্রতিপক্ষের ব্যবধানে মূলনীতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন করে ফেলতে কোন প্রকার দ্বিধা করা হচ্ছে না।

উদাহরণস্বরূপ ভাণ্ডারী, আটরশি, দেওয়ানবাগীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আমরা তাদের বড়দের উদ্ধৃতির বিপরীতে আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলি, আর গায়রে মুকাল্লিদের মুখে আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি শুনলে আমরা এটাকে তার অজ্ঞতা মনে করি। এরকমভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাকের মাসআলা বলতে গেলে আমরা মুজতাহিদগণ তথা ফিকহের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতওয়া দেই। কিন্তু বিদআত, খিলাফত, জিহাদ, ওয়ালা-বারা, কাযা, ইরতিদাদ, ইলহাদ, যানদাকা, দাওয়াহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিকহের কিতাবাদির উদ্ধৃতি দেয়াকে বেয়াদবি মনে করা হয়।

এ দ্বৈতনীতি ও বৈপরীত্বে ভরা নীতি ইলমের নীতি নয়। এভাবে চলা যায় না। ইলমের মূলনীতির উপর আসতে হবে। কমপক্ষে যারা এখনও ইলমকেই মাপকাঠি বানানোর পক্ষে রয়েছেন তারা অবশ্য ইলমের মূলনীতিতে আসতে হবে। আর যারা ইলমকে শত্রু মনে করছে তারা মূলত اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم এর মকামে পৌঁছে গেছে। তাদের জন্য لا مساس ও ময়দানে তীহ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।

আমাদের এ লেখাটি ইলমের মূলনীতি বিশ্লেষণ করার মত যোগ্যতা রাখে না। শুধু প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য এতটুকু বলা যায় যে, আলোচনার টেবিলে প্রতিপক্ষ যেই থাকুক দলিল হবে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা। কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ধার যথাযথ হয়েছে কি না তার নিশ্চয়তার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে আসবে মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত। মুজতাহিদ তথা ফিকহের সিদ্ধান্তে বিভক্ত রায় থাকলে তার কোন একটি প্রাধান্য পাবে পূর্বোল্লিখিত দলিলেরই আলোকে। মনের আবেগ ও পারিপার্শ্বিক দুর্বলতার ভিত্তিতে নয়।

## হানাফীগণের জন্য ইমাম আবু হানীফার রহ. মূলনীতি

ফিকহে হানাফীর অনুসারীগণ যে কোন মাসআলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ইমাম আবু হানীফার এ মূলনীতিটি সামনে রাখতে পারেন। যে কোন মাসআলায় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সেটির মূলনীতি প্রসঙ্গে আবু হানীফা রহ. বলেছেন-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بن معين، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْد بن أبي قرة، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بن ضريس، يَقُولُ: شهدت سُفْيَان وأتاه رجل، فَقَالَ لَهُ: ما تنقم عَلَى أَبِي حنيفة؟ قَالَ: وما لَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رَسُول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رَسُول الله، أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فَأَمَّا إِذَا انتهى الأمر، أَوْ جاء إلى إِبْرَاهِيم،

وَالشَّعْبِيّ، وابن سيرين، وَالحَسَن، وعطاء، وَسَعِيد بن المسيب، وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا، قَالَ: فسكت سُفْيَان طويلا ثُمَّ قَالَ كلمات برأيه ما بقي في المجلس أحد إلا كتبه: نسمع الشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء، ولا نقضي على الأموات، نسلم ما سمعنا، ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم. تاريخ بغداد (بشار) ١٥/٥٠٢

-তারীখে বাগদাদ ১৫/৫০২

এ নীতির আলোকেই বর্তমানকালের মুজতাহিদগণ চলতে হবে। আর আমরা যারা মুজতাহিদ নই তারা অবশ্যই মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও ফিকহের আলোকেই কুরআন হাদীসের উপর আমল করে যেতে হবে। কুরআন হাদীসকে দৃষ্টির আড়ালে রাখারও কোন বৈধতা নেই। আর ফিকহের সিদ্ধান্তের আলোকে কুরআন হাদীসকে না বুঝে নিজের ব্যক্তিগত আবেগ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে প্রভাবিত হয়ে নিজের মত করে কুরআন হাদীস বোঝারও কোন বৈধতা নেই।

মনে রাখতে হবে, দ্বৈতনীতি বড় ধরণের একটি খেয়ানত। ইলমের ক্ষেত্রে যা কবীরা গুনাহ। ক্ষেত্র বিশেষ তাহরীফ হয়ে গেলে তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

## কাল্পনিক কোন মূলনীতি বুকে ধারণ করা যাবে না

যদি কারো এমন ধারণা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের নিকট অতীতের ওলামায়ে কেরামের বিশেষ কোন কাফেলা বা বিশেষ কোন বড় ব্যক্তি সকল ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার ও হক-বাতিলের মাপকাঠি। তাঁদেরকে বা তাঁকে উপেক্ষা করে হক-বাতিল নির্ণয় করার কোন সুযোগ নেই। তাহলে এ আকীদা পোষণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। দেওবন্দী হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

এবার আমরা মূল আলোচনায় আসতে পারি। দেওবন্দী ও দেওবন্দী আকীদা-বিশ্বাস লালনকারী বা দেওবন্দী হওয়ার দাবিদার সমাজ ও কেন্দ্রগুলো থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। যে উদাহরণে দু'টি পক্ষ রয়েছে। দু'টি পক্ষই দেওবন্দী হওয়ার দাবিদার। দু'টি পক্ষই নিজেকে দেওবন্দের পক্ষশক্তি হিসাবে যাহির করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু দু'টি পক্ষের দাবি

এতটাই বিরোধপূর্ণ যে, একটি সঠিক হলে অপরটি কোনভাবেই সঠিক হওয়া সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে যে, কোন পক্ষ তার শত্রু আর কোন পক্ষ তার মিত্র। কোন মানসিকতাটি তার শত্রু আর কোন মানসিকতাটি তার মিত্র। যেভাবে আগে বলা হয়েছে, দেওবন্দী ঘরানারই বড়, ছোট ও দারুল উলূম দেওবন্দ এ তিনটি শিরনামে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে, সেভাবেই এখন তা তুলে ধরা হচ্ছে। পাঠকবর্গ ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে চলুন, বিবেককে জাগ্রত রাখুন, দৃষ্টিকে অপলক রাখুন, আর বিচার করে চলুন, শত্রু কে আর মিত্র কে?

****************

# গ্রিক দেবী-অপসারণের দাবি

বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের সদর দরজায় শান্তি ও ইনসাফের প্রতীক হিসাবে থেমিস নামক একটি নারী মূর্তিকে স্থাপন করা হয়েছে।

## বড়

দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচয় যাদের বুকে পিঠে আঁটা রয়েছে, যাদেরকে সবাই বড় বলে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং বড় হিসাবে উপস্থাপন করতে নিশ্চয়তাবোধ করেন, তাঁরা এ মূর্তি অপসারণের জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে:

ক. দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে একটি মূর্তি স্থাপন জঘন্য রকমের অন্যায়।

খ. স্বাধীন একটি দেশে, আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে একটি বিদেশী মূর্তির এমন অবস্থান কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

গ. শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে তাদের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে মূর্তি স্থাপন করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে।

## ছোট

দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচয় দিতে যারা রীতিমত ভয় পাচ্ছে, যাদেরকে সবাই ছোট ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে এবং ছোট বলে এড়িয়ে যাওয়াকেই বেশি নিরাপদ মনে করছে, এ বিষয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে। আর এসব বিষয়ে তাদের ক্ষুদ্র মেধার কিছু মূল্যায়ন রয়েছে। -প্রশ্নগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

ক. ইসলামী আইন তথা কুরআন হাদীসের আইনকে উপেক্ষা করে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আইন তৈরী হয়েছিল তখন এর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয়েছিল কি না?

খ. দেশের সর্বোচ্চ আদালত মুসলমানদের ইসলামী আইনে চলবে না, তা চলবে মানব রচিত ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন আইনে -এ খবর জানার পর মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন আঘাত লেগেছিল কি না?

গ. শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিসহ শত শত অমুসলিম বিচারপতিকে মুসলমানদের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেয়ার খবর পেয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল কি না এবং এর জন্য কোন আন্দোলন হয়েছিল কি না?

ঘ. যারা বিশ্বাস করে, এ যামানায় কুরআন হাদীসের আইন অনুযায়ী আদালত পরিচালনা সম্ভব নয়, তাই মানুষই তাদের আইন তৈরী করে নেবে তাদেরকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেয়ার খবর পেয়ে কি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছিল এবং সেজন্য কি কোন আন্দোলন হয়েছিল?

ঙ. আপাতত শেষ প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ঘরকে কুফুরী আইনের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আগে মূর্তি অপসারণ করেছেন নাকি পরে?

## ছোটদের মূল্যায়ন

ছোটদের মূল্যায়ন হচ্ছে, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানদের সর্বোচ্চ আদালত থেকে মূর্তি অপসারণের দাবির মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হল যে, এ আদালত মুসলমানের। মূর্তির মাধ্যমে একে অপবিত্র করা হয়েছে। মূর্তি অপসারিত হবে আর আদালত পবিত্র হয়ে যাবে।

আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশী মূর্তি স্থাপনের উপর আপত্তি করে সম্মিলিতভাবে দেশীয় মূর্তি স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে মূর্তি স্থাপনের পরেই কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আঘাত অনুভব করার অধিকার রয়েছে। এছাড়া সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে, সর্বোচ্চ কোলাহলময় স্পটে, সর্বোচ্চ দর্শনীয় স্থানে, সর্বোচ্চ মাথার উপরে, সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল অবস্থানে এবং সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের স্থানে মূর্তি স্থাপন করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার কোন অধিকার নেই। সর্বদলীয় আন্দোলন আমাদেরকে এ বার্তাটিও দিয়ে গেল।

ছোটরা কোনভাবেই বুঝতে সক্ষম হয়নি যে, এ আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? এবং এ আবেদন কার কাছে? শাসকবর্গ বলেছে তারা জানে না কিভাবে এখানে

এ মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে। বড়রা বিশ্বাস করেছে, কারণ তাঁদের বিশ্বাসে কোন দুর্বলতা নেই। ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ তাদের বিশ্বাসে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বলতা রয়েছে।

শাসকবর্গের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আপনারা আন্দোলন করে যান, জোরদার আন্দোলন করুন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা দেব। বড়রা আশ্বস্ত হয়েছেন, কারণ তাদের আস্থাশক্তি প্রবল। ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ তাদের আস্থাশক্তি দুর্বল।

শাসকবর্গের পক্ষ থেকে মূর্তি সরিয়ে ফেলার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বড়রা বিশ্বাস করেছেন; কারণ তাদের আস্থাশক্তি প্রবল। ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি; কারণ তাদের আস্থাশক্তি দুর্বল। শাসকবর্গ মূর্তিকে সরিয়ে ফেলেছে। বড়রা কৃতজ্ঞতার জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। কৃতিত্বের সর্বোচ্চ প্রচার প্রসার করেছেন। কৃতিত্বের ভাগাভাগিতে নিজ নিজ অংশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু ছোটরা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ আইনমন্ত্রী মূর্তি অপসারণ সম্পর্কে বলেছেন, এর মাধ্যমে সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। ছোটরা সন্দেহ করেছে, এ অপসারণের মাঝে মুসলমান ও মুসলমানদের আন্দোলনের বিশেষ কোন অর্জন নেই।

## দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ তার দু'টি প্রজন্ম বড় ও ছোট অথবা দু'টিভাগ বড় ও ছোটর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেবে? এবং কোন মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত দেবে? তাই এখন দেখার বিষয়।

দারুল উলূম দেওবন্দ, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি এবং ক্ষুদ্র পরিসরে যতটুকু অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে তার আলোকে বলা যায়-

সর্বোচ্চ আদালতের যে অধিপতিরা মূর্তি স্থাপন করেছে তাদের কাছেই এ মূর্তি অপসারণের আবেদন করার বৈধতা দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ দিতে পারে না। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান তাদের ধর্মীয় অধিকার আদায় করার জন্য আবেদন নিয়ে হাজির হবে তার শত্রুর দরবারে যাদের শতকরা হার হচ্ছে দুই ভাগ। দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ তথা কুরআন-হাদীস-ফিকহ কখনো এ অনুমতি দিতে পারে না। এ অনুমতি দেয় না।

কোন ভূখণ্ডের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ ব্যক্তির ধর্মের প্রতীক সে তার আদালত প্রাঙ্গণে স্থাপন করবে আর সেখানে অন্য ধর্মের লোকেরা তার উপর

আপত্তি করবে দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ এ অনুমতি দিতে পারে না। সর্বোচ্চ আদালতের মালিকপক্ষ জানে না, আদালত প্রাঙ্গণে মূর্তি স্থাপিত হয়েছে -এ কথা বিশ্বাস করার অনুমতি দারুল উলূম দেওবন্দ দিতে পারে না।

সর্বোচ্চ আদালতের মালিকপক্ষ সর্বোচ্চ আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে মূর্তি অপসারণের আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং আন্দোলনে সহযোগিতা করবে; এ খেলা খেলার অনুমতি দারুল উলূম দেওবন্দ দিতে পারে না।

## অসম্ভব দাবিগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

যে দেশ কোন ধর্মভিত্তিক দেশ নয় সে দেশে কথায় কথায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে; এ অনুমতি দারুল উলূম দেওবন্দ দিতে পারে না। যে দেশে প্রত্যেক ধর্ম চর্চার সমান অধিকার থাকবে, সে দেশে এক ধর্মের চর্চা আরেক ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত দিবে না -এ অসম্ভব নীতি দারুল উলূম দেওবন্দ দিতে পারে না।

তাওহীদের চর্চা হলে শিরকের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, শিরকের চর্চা হলে তাওহীদের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, গনেশ-দুর্গা-সরস্বতী ও তার পূজারীদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বললে, আর তেত্রিশ কোটি দেবতার কোন একটির সঙ্গে বেয়াদবি করলেই নরকে জ্বলতে হবে বললে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না; এমন অসম্ভব কথা দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ বলতে পারে না।

শূয়রের গোশতকে হালাল বললে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, আর গরু জবাই করে বেহশত লাভের আশা করলে অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, মা কালির পায়ে মুসলমানের রক্ত ঢালতে পারলে দেশের মাটি পবিত্র হবে বললে মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, আর মা কালির পূজারীরা সব অপবিত্র ও নাপাক বললে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র না মানলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বললে বা পুত্র মানলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বললে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না; এমন অসম্ভব কথা দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের কোন কিতাবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

## সত্য উপলব্ধির আরো কাছে যেতে হবে

অমুসলিমরা কুরআনকে পদদলিত না করে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না, আর মুসলিমরা কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থকে সঠিক বলে স্বীকার করে জান্নাতে যাওয়ার আশা করতে পারে না। এমতাবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ, তার মানহাজ, তার কর্ণধারগণ এমন একটি ভূখণ্ডে ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষার কী নীতিমালা নির্ধারণ করবেন, সে নীতিমালার আলোকে বড় ও ছোট দু'টি পক্ষের কোনটিকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করবে, আর কোনটিকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে? শত্রুপক্ষকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করার মাপকাঠি কী হবে? আর মিত্রপক্ষকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করার মাপকাঠি কী হবে?

বাস্তবতা বিবর্জিত ও কুরআন-হাদীস-ফিকহ উপেক্ষিত কোন পথ ও পন্থা দারুল উলূম দেওবন্দ গ্রহণ করবে, সে ধারণা দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানরা করতে পারে না। কুরআন হাদীসের বিশ্বাসীরা তা করতে পারে না। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও তাদের ফিকহের উপর আস্থাশীলরা তা কখনো করতে পারে না।

একটি দেশ যখন সকল ধর্মের মালিকানাধীন হবে, সকল ধর্মের সমান অধিকারভুক্ত হবে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মূর্তি স্থাপন করলে এক পক্ষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে, আবার সে মূর্তি অপসারণ করলেও আরেক পক্ষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে। এ ক্ষেত্রে যারা দেশের মালিক তারা এক পক্ষের দাবী অনুযায়ী মূর্তি স্থাপন করবে, আরেক পক্ষের দাবি অনুযায়ী অপসারণ করবে। স্থাপনের দাবী একবার অপসারণের দাবী একবার পুরা করবে। এভাবে উভয় পক্ষের অধিকার রক্ষা হয়ে যাবে। তৃতীয় চতুর্থ বার স্থাপিত হল না অপসারিত হল তা নিয়ে কোন পক্ষেরই মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। সেটা একমাত্র মালিক পক্ষের নিজস্ব ব্যাপার।

এ তো হচ্ছে ঐ মনিব ও মালিকের কথা যে মুসলিম-অমুসলিম, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সব রকমের গোলাম ও ক্রিতদাস পালে ও পোষে। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ ইলমের যে মানহাজ প্রবর্তন করেছে সে মানহাজের কোন ধারা মনিব-গোলামের এ পদ্ধতির মাঝে প্রয়োগ করা যাবে?

## ফিকহী তাকয়ীফের অনিবার্যতা

ফিকহের যে অধ্যায়ই আমরা পড়েছি বা চলমান পৃথিবীর যে বিষয়টিরই শরয়ী সমাধান খোঁজার জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় মুফতীগণের দরবারে হাজির হয়েছি তখন দেখেছি, তাঁরা চলমান আলোচ্য বিষয়টিকে কুরআন, হাদীস বা কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবিত কোন একটি মূলনীতির আলোকে মাসআলাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন, যাকে পরিভাষায় তাঁরা تكييف فقهي (তাকয়ীফে ফিকহী) বলে থাকেন।

সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগা, সকল ধর্মের আদালত প্রাঙ্গণ থেকে একটি ধর্মের অনুভূতি বিরোধী প্রতীককে সরিয়ে ফেলা, প্রাঙ্গণের প্রতীক এক ধর্ম অনুযায়ী আর অভ্যন্তরের সকল প্রতীক অন্য ধর্ম অনুযায়ী, আদালত প্রাঙ্গণের মূর্তির এক বিধান আর অন্য সব মূর্তির ভিন্ন বিধান, বিচারক এক ধর্মের প্রতীক আরেক ধর্মের, অন্য ধর্মের বিচারক মাননীয় কিন্তু তার বিশ্বাসের মূর্তি অবাঞ্ছিত, অন্য ধর্মের আইন শ্রদ্ধেয় কিন্তু তার সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়, বিধানদাতারা ও বিধান প্রয়োগকারীরা মার্জিত আজ্ঞেয় আর বিধানের অনিবার্য ফল অমার্জিত -এ বিষয়গুলোর ফিকহী তাকয়ীফ আসলে কী? উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইস্তিম্বাতের কোন নীতির আলোকে বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা কি ছোটদের সামনে ও সাধারণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরার বা তাদেরকে বুঝতে দেয়ার কোন সুযোগ নেই?

এত কঠিন ও জটিল দ্বীনী ও ইলমী বিষয়গুলোর সিদ্ধান্তও প্রায় শুনতে পাওয়া যায় পত্রিকানির্ভর রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে, বা স্বপ্ন-কাশফ-মুরাকাবা ও মালফুযাতনির্ভর ইসলাহী বয়ান থেকে, বা 'বড়রা বলেন'নির্ভর দাওয়াতের বয়ান থেকে, বা জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কাহিনীনির্ভর ওয়াজের ময়দান থেকে।

অথচ এগুলোর একটিও দ্বীনের ও ইলমের এ সকল জটিল বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্র নয়। এর ক্ষেত্র হচ্ছে দেশের নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতা, দারুল হাদীস, দারুত তাফসীর, ইসলামী গবেষণাগারগুলো।

### সুযোগ সন্ধানের রাস্তা বন্ধ করতে হবে

কিন্তু রহস্যজনক কোন কারণে মূল যিম্মাদারগণ এসব বিষয়ে অসম্ভব রকমের নীরব রয়েছেন। আর এ নীরবতাকে আমরা সম্মতি হিসাবে ধরে নিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য দিয়ে চলেছি। প্রত্যেকের নিজ নিজ বক্তব্য সঠিক হওয়ার পক্ষে সহজ ও নিরাপদ দলিল হচ্ছে, যদি আমার বক্তব্যে, কাজে বা সিদ্ধান্তে কোন ভুল থাকতো তাহলে তিনি ও তাঁরা অবশ্যই কিছু বলতেন।

অথচ কত শত ভুলের উপর তাঁদের নীরবতা চলছে, যুগের পর যুগের পর যুগ ধরে তা আলাদা রচনায় আমরা দেখাব ইনশাআল্লাহ। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এখনকার আলোচ্য বিষয় থেকে আপাতত বের হতে চাচ্ছি না।

আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রিক দেবী। এ বিষয়ে শেষ কথা হচ্ছে, যাদেরকে পরিভাষায় বড় বলা হয় তাঁরা এ বিষয়ে অনেক অবদান রেখেছেন। আর যাদেরকে পরিভাষায় ছোট বলা হয় তাদের দাবি হচ্ছে, যা

কিছু করা হচ্ছে তা কুরআন-হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়েছে কি না? পরবর্তী কার্যক্রম চালু রাখা বা বন্ধ রাখার ব্যাপারে কিতাবের সিদ্ধান্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হচ্ছে কি না? ছোটদের দাবি হচ্ছে, তারা কিতাবের শরণাপন্ন হয়েছে। কিতাবের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাস্তব কার্যক্রমের সঙ্গে বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। তাই তাদের আবদার, বড়রা যেন কিতাবের আলোকে সামনে বাড়েন। প্রজন্মকে ভুল দিক নির্দেশনা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ছোটদের যে কোন ইলমী অস্পষ্টতা দূর করার দরজা যেন সব সময়ের জন্য খোলা রাখেন।

আর দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র নির্ধারণের দায়িত্ব বহন করবে দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজে ইলমী ও পাঠকবর্গ।

*************************

# শাপলা চত্বর-কওমী সনদের স্বীকৃতি

ভূপৃষ্ঠের ব দ্বীপ থেকে আমরা এবার তুলে এনেছি ‘শাপলা চত্বর ও কওমী সনদের স্বীকৃতি’ দৃশ্যটি। পাঠক নিশ্চিত থাকুন, কওমী সনদের স্বীকৃতির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা এখানে বলার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রসঙ্গক্রমে পাঠক আমার মনের কথা বুঝে ফেললে তা পাঠকের বিশেষ যোগ্যতার ব্যাপার, আমাদের আলোচ্য বিষয় আসলে সেরকম কিছু নয়। আমরা শুধুমাত্র এ দৃশ্য থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

### এ শাপলা ও সে শাপলা

একদিন শাপলাকে কেন্দ্র করে যে বড়রা বলেছিলেন, রাষ্ট্রপক্ষ নাস্তিক ও নাস্তিকতার প্রশ্রয়দাতা, সে বড়রা সে রাষ্ট্রপক্ষের দীর্ঘ নেক হয়াতের জন্য দোয়া করেছেন। যে রাষ্ট্রপক্ষ শাপলাকে কেন্দ্র করে বলেছিল, হেফাযতের তের দফা বাস্তবায়ন করলে দেশ তের শত বছর পিছিয়ে যাবে, সে রাষ্ট্রপক্ষ ও তার পূর্বপুরুষরা এ দেশে ইসলামের জন্য কত কত অবদান রেখেছে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সে শাপলার বড়রাই।

রাষ্ট্রপক্ষ যে বড়দেরকে কুরআন পোড়ানোর অপরাধে ইসলামের শত্রু হিসাবে আখ্যা দিয়েছে, সে রাষ্ট্রপক্ষ সে বড়দেরকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের সঠিক চর্চাকারী হিসাবে সম্বোধন করে ভবিষ্যতে জাতির সামনে ইসলামের তথা কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা (?) তুলে ধরার জন্য আদেশসূচক আবদার করেছে।

যে বড়রা পুরুষের দুর্বলতা বোঝাতে গিয়ে নারীদেরকে তেঁতুলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, আর সে অপরাধে (?) রাষ্ট্রপক্ষ তাঁদেরকে তেঁতুল হুজুর আখ্যা দিয়েছিল, স্মরণকালের সর্বনিকৃষ্ট ব্যঙ্গ চিত্র তাঁদের জন্য তৈরি করেছিল, সে রাষ্ট্র পক্ষ সে বড়দের পা ছুঁয়ে সর্বোচ্চ বরকত অর্জন করার চেষ্টায় বিভোর।

নাস্তিকবিরোধী শাপলা আন্দোলনের সবচাইতে জঘন্যভাবে বিরোধিতাকারী এবং সবচাইতে জঘন্য অপকর্মের হোতার হাত ধরেই বড়রা

নিজেদের ভাগ্যলিপি তৈরি করেছেন, নিজেদের ও প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন, নিজেদেরকে দামি করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসেছেন, বিচ্ছিন্ন ধারা থেকে মূল ধারায় আসার পথ সুগম করেছেন, টিভি ক্যামেরার মূহুর্মূহু ফোকাসে আপ্লুত হয়েছেন, দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির আওতার মধ্যে অবস্থান করতে পেরেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রের কর্ণধারের সম্বোধিত ব্যক্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সম্বোধন করার মত যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

## বড়দের ভাবনা

ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। খ. আমাদের সোহবত ও দাওয়াতের বরকতে তিনি হেদায়েতের পথে এসেছেন। গ. তিনি তখন আমাদেরকে ভুল বুঝে ছিলেন। ঘ. তিনি আসলে ধর্মপ্রেমিকা মানুষ। ঙ. কিছু স্বার্থবাজ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে ভুল পরিচয়ে উপস্থাপন করেছিল। তিনি এখন আসল হাকিকত বুঝতে পেরেছেন।

## ছোটদের মূল্যায়ন

ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের একজন সফল বাস্তবায়ক, মানব রচিত আইনের একজন অনবদ্য প্রবর্তক, এমনিভাবে হেফাযত আন্দোলনের একজন সফল বিরোধিতাকারীর দৃষ্টিতে মৌলবাদী ও কট্টরপন্থী খ্যাত একটি কাফেলা কেন এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এতটা বিপরীতমুখী সমাদরে সমাদৃত? এ বিষয়ে ছোটদের ছোট মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে যথাক্রমে-

ক. শাসকবর্গ খোলা মাঠে পিটুনি দিয়ে বদনাম কুড়িয়ে যে ভুল করেছে, তা তারা বুঝতে পেরেছে এবং এতগুলো ভোট হারানোর ঝুঁকি তারা আর নিতে চায় না।

খ. মৌলবাদীদের সোহবত ও দাওয়াতের বরকতে শাসকবর্গ বুঝতে পেরেছে যে, এভাবে ইসলামের ও ইসলামের পক্ষে দাবির বিরোধিতা করার সময় এখনো আসেনি। এ দেশে রাজত্ব করতে হলে মৌলবাদীদেরকে পায়ের তলায় না পিষে বগলের নিচে চেপে রাখতে হবে। তারা আরো বুঝতে পেরেছে যে, এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিরোধী দলের কৌশলটাই সবচাইতে উপকারী ছিল, যা একটু দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছে।

গ. তখন তারা মৌলবাদীদেরকে ভুল বুঝেছিল। তারা মনে করেছিল মৌলবাদীরা যেভাবে লম্ফঝম্ফ করছে তাতে মনে হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তারা ক্ষমতা দখল করেই ফেলবে এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে দেশে শরয়ী আইন জারি করার একটা পথ খুঁজছে। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে মৌলবাদীদের মনের বারান্দায়ও এমন কোন খেয়াল উঁকি মারেনি। তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নিরাপদে নামায রোযা করে যেতে চান।

রাষ্ট্রপক্ষ মনে করেছিল, শাপলার লোকেরা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠাকে ফরয মনে করেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানব রচিত আইনের অধীনে বসবাস করাকে অবৈধ মনে করেন। জনগণকে বিধানদাতা হিসাবে মেনে নেয়াকে কুফর মনে করেন। আর সে জন্য বর্তমান ক্ষমতসীনদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে চান।

কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের এ ভুল ভেঙ্গেছে। তারা এখন বুঝতে পেরেছে, এমন কিছুই এখানে নেই। শাপলার লোকেরা খুলে খুলে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁরা ক্ষমতা চান না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিপরীত ইসলামী খেলাফত নামক কোন কিছু তাঁরা চান না। মানব রচিত আইনের বিপরীতে ইসলামী আইন নামক কোন কিছু তারা চান না। আদালতের কুফরী আইনের বিপরীত কোন কিছু তাঁরা চান না। ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মকে তাঁরা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। গণতান্ত্রিক ধর্মকে তাঁরা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। মানব রচিত আইনের হাতে নিজেদের ন্যস্ত করাকে তাঁরা গুনাহ মনে করেন না। ইসলাম সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখে না, তাই সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন ধর্মের আওতামুক্ত থাকবে -এ বিষয়টির সঙ্গে তাঁদের কোন দ্বিমত নেই।

## শুধু নিরাপদে বাঁচতে চাই

তাঁরা শুধু চান, একজন উপযুক্ত মনিবের একজন বাধ্য গোলাম হিসাবে قال الله قال الرسول এর চর্চার মাধ্যমে হাদীসের মসনদকে সংরক্ষণ করে রাখতে। ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপত্তার সাথে একান্ত ব্যক্তিগত আমলগুলো করে যেতে। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব এ সকল বিষয়ে কোন প্রকার নাক না গলিয়ে অপর কাউকে স্পর্শ করে না এমন সব আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চান।

রাষ্ট্রপক্ষকে তাঁরা এভাবেও আশ্বস্ত করেছেন যে, 'মন্ত্রীমহোদয়গণ! আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। সংসদ সদস্যগণ! আপনারা

আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। পুলিশ, আর্মি, বিজিবিসহ সকল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা! আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। শুধু আপনারা আমাদের ওলামায়ে কেরামের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাদের ব্যক্তিগত কাজে বাধা দিবেন না'।

শাপলার সদস্যদের মনের অভিব্যক্তি রাষ্ট্রপক্ষ বুঝতে পেরেছে এবং মনে হয় বিশ্বাসও করেছে। তাই তারা তাদের কৃত ভুল আর করতে চায় না। প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব, বুলেট দিয়ে সে সমস্যা সমাধান করতে যাওয়ার মত বোকামো আর হয় না। খুব দেরিতে হলেও ক্ষমতাসীনরা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছে।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী ধর্মপ্রেমিকা না হলে এমন একটি গোষ্ঠীর সাথে তার একান্ত ভবনে একান্ত আয়োজনে একান্তভাবে মিলিত হত না, যে গোষ্ঠী একদিন তার মসনদের গোড়ায় কুড়াল মেরেছিল। শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরেই জাতশত্রুকে মিত্রতে পরিণত করতে হল।

## একটি অব্যর্থ পরামর্শ

হুসাইনুল বান্না এক আলোচনায় সরকারকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছে, 'এ দেশের আলেম সমাজ অসুস্থ, তারা তিতা ওষুধ খেতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সরকার তাদেরকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করবে না তা হতে পারে না। তারা এ দেশের নাগরিক। সরকারের করে দেয়া আইন তারা মানবে না বললেই কি হবে? তারা মানতেই হবে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের মানুষের স্বার্থে যে কোন আইন করে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা'।

সরকার দেরিতে হলেও হুসাইনুল বান্নার পরামর্শ গ্রহণ করেছে। দেশের জনগণ সে যত বেয়াড়াই হোক আখের রাজার প্রজাইতো। তাই তারা যত গুনাহই করুক না কেন তওবার দরজা খোলা রাখা চাই। দ্বীনের খাতিরে সকল শত্রুতাকে ভুলে গিয়ে শাপলার সদস্যদেরকে আবার কোলে টেনে নিয়েছে। ঠাণ্ডা সুরে নসীহত করে দিয়েছে, কুরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা যেন জাতির সামনে তাঁরা তুলে ধরেন। কুরআন-হাদীসের যে ভুল ব্যাখ্যার কারণে হেফাযত ও শাপলার সৃষ্টি হয়েছে তা যেন আর কখনো না দেখি!

নসীহত করে দিয়েছে, মসজিদের মাইকে যেন শুধু দ্বীনী কথাবার্তা বলা হয়। মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন-আদালত, সুদ, যিনা, ব্যাংক, ব্যবসা, আল্লাহর আইন, খেলাফত, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, মুসলিম-অমুসলিমের ব্যবধান, বিবাহ,

তালাক ইত্যাদি দুনিয়াবি (?) বিষয় নিয়ে যেন মসজিদে কোন আলোচনা না হয়। মসজিদের মাইক শুধুমাত্র দ্বীনী কথাবার্তা বলার জন্য!

## আমরা আপ্লুত

এ দেশে দু'জন নেত্রিই আছে। এক নেত্রিকে শত নসিহত করেও, যুগের পর যুগ সঙ্গ দিয়েও মাথার সামনের চুলগুলোকে ওড়নার নিচে লুকানোর জন্য রাজি করা যায়নি, এমন কি নির্বাচনের আগেও নয়।

অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সামান্য থেকে সামান্য ধর্মের গন্ধ পেলেই ধর্মের সাজে সাজতে মুহূর্ত দেরি হয় না। হোক তা হাত মোজা পা মোজা ও নেকাব দিয়ে, অথবা হোক তা তিলক পৈতা দিয়ে। সকল ধর্মের প্রতি এই অনুরাগ সত্যিই বিরল। তার প্রভাবে তার মন্ত্রীরা পর্যন্ত চরম ও ভয়ঙ্কর রকমের ধার্মিক হয়ে উঠেছে। তারা ভারতে গেলে মূর্তির পূজা করতে আগ্রহ বোধ করেন, আবার বাংলাদেশে আসলে নামাযের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য কোটি কোটি টাকা তার লোকেরা খরচ করে, অনুরূপ মন্দির নির্মানের সর্বোচ্চ খরচটাও তারাই বহন করে।

কাকরাইল মারকায ও টঙ্গি ইজতিমার জন্য কত বিশাল জায়গা তারা বরাদ্দ দিয়ে দিয়েছে, যা পতিতালয়গুলোর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার তুলনায় একেবারে অল্প নয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য তার বরাদ্দ অতীতের যে কোন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে। নাস্তিকদের প্রহরার খরচ ও নাস্তিকতার চর্চার খরচ এর চাইতে বেশি হলেও তা কত হাজার ভাগই আর বেশি হবে! ধর্মের প্রতি এ অনুরাগকে মূল্যায়ন না করে শাপলার সদস্যরা অতীতে যে ভুল করেছে সে ভুল আর করবে না -এমনটা আশা করার মত পরিস্থিতি এখন সৃষ্টি হয়েছে।

**শেষ পর্যন্ত বাঁচা গেল**

ঙ. শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণ চেয়েছেন শুধুমাত্র মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু লোক প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছে, এরা দেশে ইসলাম চায়। প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে এরা শরয়ী আইন চায়।

কিন্তু এরা ইসলাম চাইবে কেন? এরা শরয়ী আইন চাইবে কেন? যুগ যুগ ধরে আমরা জানি ইসলাম ও শরয়ী আইন চায় একদল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যাদেরকে জঙ্গি বলা হয়। আর তারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে থাকে। নিজেদের কার্যক্রমকে জিহাদ বলে থাকে।

তারা গণতন্ত্রকে কুফর বলে। গণতন্ত্রের অনুসারীদেরকে কাফের বলে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফর বলে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীকে কাফের বলে। জাতিয়তাবাদকে কুফর বলে। জাতিয়তাবাদের বিশ্বাসীকে কাফের বলে। গায়রুল্লাহর আইনের শাসনকে কুফর বলে। শাসকদেরকে কাফের বলে। গায়রুল্লাহর আদালতকে তাগুতের আদালত বলে। সে আদালতের বিচারক ও বিচারপ্রার্থীকে কাফের বলে। তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকে বৈধ ও সম্ভব মনে করে না। এ সকল শক্তির বিরুদ্ধে তারা শুধুমাত্র অস্ত্রের ভাষায় কথা বলাকেই বৈধ মনে করে।

ঠিক এমন একটি গোষ্ঠীর পরিচয়ে শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণকে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে ব্যবধান আকাশ-পাতাল পরিমাণ। শাপলা ও হেফাযতের কর্ণধারগণ কখনো আইন-আদালত, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মানব রচিত আইন, কুরআন বিরোধী দণ্ডবিধি, কুফর ও হারাম প্রচারের নীতিমালা ইত্যাদির কখনো কোন বিরোধিতা করেননি। শুধু শুধু তাদেরকে সরকারের বিরাগভাজন বানানোর জন্য তাদের নামে বদনাম ছড়ানো হয়েছে যে, তারা চলমান পৃথিবীর স্বাভাবিক ধারার বিপরীত কিছু চায়।

যাই হোক, কর্ণধারগণ বিভিন্ন টকশো, বয়ান-বক্তৃতা, লিখনীতে এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধিতা বা সমালোচনা করার কোন খেয়াল তাদের নেই। অতীতেও তাঁরা চাননি, এখনো চান না। যা কিছু হয়েছে, যা কিছু ঘটেছে তার সবই মধ্যসত্ত্বভোগীরা করেছে।

**দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজ**

এখন কথা হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ এ বিষয়ে কী বলে? বড় ও ছোটর যে বিশাল তফাত চলছে এর মধ্য থেকে কাকে শত্রু বলে ঠেলে দেবে, আর কাকে মিত্র বলে টেনে নেবে? এ ক্ষেত্রে মাপকাঠি কী হবে?

এ বইয়ের সূচনা পর্বে শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর একটি ঘটনা ও বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছিল। সে ঘটনাটিকে সামনে রাখলে বুঝতে সহজ হবে যে, ইলম সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই হাকেম ও বিচারকের ভূমিক পালন করবে। এ ক্ষেত্রে বড়ত্বের ভয়, আধিক্যের চাপ ও শোরগোলের প্রচণ্ডতা কোন কিছু কাজে আসবে না। ভয় পেয়ে পেয়েও সত্য কথাটা বলে ফেলতে হবে। ইতস্ত করে করেও মনের জিজ্ঞাসাটুকু আলোচনার টেবিলে উত্থাপন করে ফেলতে হবে। দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী মানহাজের দাবি হচ্ছে, সুস্পষ্ট দু'টি বিপরীত অবস্থানের দু'টিই সঠিক হতে পারে না। হয়ত শাপলা ভুল, নয়ত গণভবন ভুল, নয়ত দু'টিই ভুল। দু'টিই সঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে তৃতীয় কোনটি সঠিক হলে হতে পারে।

দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের পক্ষ থেকে, আকাবিরে দেওবন্দের পক্ষ থেকে, দারুল উলূম দেওবন্দের শত দেড়শত বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন হবে, যার উত্তরের উপর ফয়সালা হবে দারুল উলূম দেওবন্দ কাকে শত্রু বলে ঠেলে দেবে, আর কাকে মিত্র বলে টেনে নেবে।

## প্রশ্ন

প্রশ্নটি হচ্ছে, ষোল কোটি মুসলমানের তিনশত প্রতিনিধি বা ষোল কোটি মুসলমানের ঈমানের তিন শত রাহবার যার ইসলামপ্রীতি, ওলামাপ্রীতি, সঠিক ইলমপ্রীতিতে আপ্লুত ও সিক্ত, সে মহান নায়ক মুসলমান না কাফের? তাঁর দেশটি ইসলাম ধর্মের দেশ না কি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের দেশ? সে মহান নায়ক তার রাজ্যের মাঝে ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠাতা না কি কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতা? সে মহান নায়ক ইসলামী আইনের পরিচালক না কি কুফরী আইনের পরিচালক? সে মহান নায়ক ইসলামী আইনের প্রহরী না কি কুফরী আইনের প্রহরী? সে মহান নায়কের সংসদ ভবন ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্য না কি কুফরী আইন প্রণয়নের জন্য? সে মহান নায়কের বিচার বিভাগ ইসলামী আইন প্রয়োগ করার জন্য না কি কুফরী আইন প্রয়োগ করার জন্য? সে মহান নায়কের নিরাপত্তা বাহিনী ইসলামী আইনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত না কি কুফরী আইনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত?

## প্রশ্নটি কঠিন হলেও উত্তর জানতে হবে

যদি এ সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ঃ মুসলমান, ইসলাম, ইসলামী ও ইসলামের জন্য, তাহলে কোটি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ছিল আমীরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনকে এ পরামর্শ দেয়া যে, শুধু শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের বিবেচনায়ই নয়; বরং এ দেশটি দারুল ইসলাম ও আপনি আমীরুল মুমিনীন হিসাবে দেশের শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চস্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দিন। এবং এটা আপনাকে করতেই হবে। আর এরও আগে নির্বাহী, আইন ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম শিখে পরে কাজে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করুন। কারণ এ ইলম ফরয। এ ইলম থেকে বিমুখ হওয়া কুফর। এ ইলমকে ঐচ্ছিক মনে করা কুফর। আর কাফেরদের জন্য কুফরী শিক্ষার অভিভাবকত্ব গ্রহণ না করে সীমিত আঙ্গিকে অনুমতি প্রদান করুন।

একজন আমীরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীনের কাছে এটা কোন দাবি হতে পারে না যে, আপনি আপনার শিক্ষিত জনগণকে বলে দিন, তারা যেন আমাদের আলেমদেরকে কুরআন-হাদীস পড়ুয়াদেরকে শিক্ষিত মনে করে এবং শিক্ষিতদের কাতারে গণনা করে।

**আর যদি** এ সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ঃ কাফের, কুফর, কুফরী ও কুফরের জন্য, তাহলে কোটি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হচ্ছে, নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো তিলাওয়াত করা, এগুলোর অর্থ বোঝা, এগুলোর তাফসীর দেখে নেয়া এবং সবশেষে এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে উদ্ঘাটিত বিধানগুলো আহকামুল কুরআন, শুরূহুল হাদীস, ফিকহের কিতাবাদি থেকে দেখে নেয়া। আর সে আলোকে আপ্লুত হওয়া, সিক্ত হওয়া এবং স্তুতিবাক্য ব্যবহার করার শরয়ী বিধানগুলোও জেনে নেয়া। নিজেদের ঈমানের হালত যাচাই করে নেয়া। দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র চেনার জন্য একটি স্থায়ী ও টেকসই মূলনীতি তৈরি করে নেয়া। আয়াত ও হাদীসগুলো নিম্নরূপ-

### আয়াতগুলো এই-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥). سورة النساء.

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠). سورة المائدة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١). سورة المائدة.

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥). سورة المائدة.

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣). سورة التوبة.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩). سورة التوبة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤). سورة التوبة.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩). سورة التوبة.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١). سورة التوبة.

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٧).سورة التوبة.

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦). سورة التوبة.

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٧٤). سورة التوبة.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩). سورة التوبة.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤). سورة التوبة.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦). سورة الأنفال.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤). سورة الأنفال.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦). سورة البقرة.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩). سورة آل عمران.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١). سورة آل عمران.

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢). سورة المجادلة.

**হাদীসগুলো এই-**

عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت، وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه.

فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان».( صحيح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»، كتاب الفتن. الرقم: ٧٠٥٥، ٧٠٥٦ )

عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله، بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله»، قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». (صحيح مسلم، ٨ – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، كتاب الإمارة. الرقم: ٤٢ - (١٧٠٩))

حَدَّثَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَا أَحَلُّوا لَهُمْ مِنْ حَرَامٍ اسْتَحَلُّوهُ، وَمَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرَامِ حَرَّمُوهُ فَتِلْكَ رُبُوبِيَّتُهُمْ». (سنن سعيد بن منصور، باب قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، كتاب التفسير. الرقم: ١٠١٢)

ابن فضيل، عن عطاء، عن أبي البختري، في قوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} قال: أطاعوهم فيما أمروهم به من تحريم حلال وتحليل حرام، فعبدوهم بذلك. (مصنف ابن أبي شيبة. الرقم: ٣٤٩٣٦)

عن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم

ورهبانهم أربابا من دون الله}، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (سنن الترمذي، باب ومن سورة التوبة، كتاب التفسير، الرقم: ٣٠٩٥ )

إن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله "

فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " قال عمر رضي الله عنه: «فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق». (صحيح البخاري، باب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة. الرقم: ١٣٩٩، ١٤٠٠ )

– عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ». (مصنف عبد الرزاق. الرقم: ٩٩٩٥)

**মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুজতাহিদগণের বক্তব্য এই-**

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে তাফসীর, আহকামুল কুরআন, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবাদিতে যে সিদ্ধান্ত লেখা হয়েছে তা উল্লেখ করার মত সুযোগ এ ক্ষুদ্র বইয়ে নেই। বাকি পাঠক যদি মনে করেন, উদাহরণস্বরূপ দু'চারটি উদাহরণ দিয়ে দিলে ভালো হবে তাহলে দু'চারটি উদাহরণ দিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে দু'চারটিই দেয়া যাবে, এর বেশি নয়। হাঁ! বিভিন্ন কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বরগুলো এখানে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। যাতে প্রয়োজন মনে করলে পাঠক তা সময়মত দেখে নিতে পারেন।

**ইমাম মালেক রহ. বলেন-**

٢٧٢٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلاَمَ. فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤُلاَءِ. وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ.

وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْماً كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الْإِسْلاَمَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. مؤطأ مالك، باب القضاء من ارتد عن الإسلام، كتاب الأقضية.

**ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন-**

{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}

আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন-

{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [صلى الله عليه وسلم] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

ইবনে কাসীর রহ. এর এ সিদ্ধান্তই পরবর্তীরা মেনে নিয়েছেন, কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেননি।

### ইমাম কুরতুবী রহ.

قوله : (( على المرء المسلم السَّمع والطاعة )) ؛ ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة ، والأمراء ، والقضاة . ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا : وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ. فأمَّا لو ابتدع بدعة، ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور: على أنه يُخْلَع. (المفهم للقرطبي، كتاب الإمارة ٣٩/٤)

### আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. (عمدة القاري لبدر الدين العيني، كتاب الفتن، باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها ٢٦٧/٢٤)

### ইমাম নববী রহ. বলেন

### কাযী ইয়ায রহ. বলেন-

নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় কাযী ইয়ায রহ. ও ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য দেখুন-

دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله»، قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان».

**হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ. কাযী ইয়ায রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন-**

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ قَالَ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ إِلَيْهَا قَالَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمُ الْبِدْعَةُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ تَنْعَقِدُ لَهُ وَتُسْتَدَامُ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوِلَايَةِ وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعُهُ وَنَصْبُ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ إِلَّا لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَلْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ. (شرح النووى على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة لامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية)

এ বিষয়েও কেউ দ্বিমত করেননি।

**আল্লামা তীবী রহ. বলেন-**

وأجمع أهل السنة علي أن السلطان لا ينعزل بالفسق؛ لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، ولا تنعقد إمامة الفاسق ابتداء. وأجمعوا علي أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذا البدعة.

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة سقطت طاعته، ووجب علي المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلي غيرها ويفر بدينه. (الكاشف عن حقائق

السنن للطيبي، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، ص: ٢٥٦٠ مكتبة نزار محمج الباز، مكة المكرمة)

### ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে ইবনে বাত্তাল রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন-

قال بن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده الحديث الخامس. (فتح الباري كتاب الفتن ٩/١٣.)

### আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ.

আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফয়যুল বারী' কিতাবে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের করণীয় অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

٧٠٥٣ – قوله: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ) قد مرَّ: أن الشريعةَ في مثل تلك الأمور التي تَنْتَظِمُ من الطرفين تَرِدُ بمثله، أعني أنها توجِّهُ كلاًّ منهما إلى أداء وظيفته، حتى يَتَرَاءى منه أنه ليس للآخر حقٌّ. وهكذا فعل في باب الزكاة، في تعدِّي المصَدِّقِ، حتَّى جَعَلَ رضاهم من تمامية الزكاة. وهو دَأْبُهُ في النكاح، حتَّى يُتَوَهَّم أنه لم يَتْرُكْ للمَوْلِيَّةِ حقّاً، وجَعَل نِكَاحَهَا بدون إذن وليِّها باطلاً. وهو وتيرتُه في نهي الرجال عن نهي خروج النِّساء إلى المساجد، حتى يُظَنَّ أنه أمرٌ مطلوبٌ عنده. ومن هذا الباب أمر الرَّعِيَّةِ والسلطان، أمرهم بالصبر حتى يُتَخَيَّلَ أن الحقَّ كلَّه عليهم.

والوجهُ فيه قد ذَكَرْنَاه بأنه قد سَلَكَ فيه مسلكاً يقوم به النظام، فَأَقَامَ لكل باباً، فجعل من وظيفة الرعية الصبر، وجعل من وظيفة الإمام العدل مهما أمكن، ثم وعد كلَّ بترك وظيفته، ولو ترك الأمرَ إلى العوام لَفَسَدَتِ الأرض. **نعم إذا رَأَوْا منه كفراً بَوَاحاً لا يبقى فيه تأويلٌ، فحينئذٍ يَجِبُ عليهم أن يَخْلَعُوا رِبْقَتَهُ عن أعناقهم، فإنَّ حقَّ اللَّهِ أَوْكَدُ.** ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلاَّ حقّاً في جميع الأبواب، فإذا تعذَّر أخذ الحقِّ في جميع الأبواب – وإن أَمْكَنَ ذهناً – لا بُدَّ أن يُحَدَّ له حَدٌّ، وهو الإغماضُ في الفروع، **فإذا وَصَلَ الأمرُ إلى الأصول حَرُمَ السكوتُ، ووجب الخَلْعُ.** وهو معنى قوله: «وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ»، (فافهم. فيض الباري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها)

### আল্লামা শামী রহ.

'আদদুররুল মুখতারে'র ইবারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা শামী রহ. বলেন-

(قوله ونصبه) أي الإمام المفهوم من المقام (قوله أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه، ولذا قال في العقائد النسفية: والمسلمون لا بد لهم من

إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق؛ وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم اهـ (قوله فلذا قدموه إلخ) فإنه – صلى الله عليه وسلم – توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب، وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره ط (قوله ويشترط كونه مسلما إلخ) أي لأن الكافر لا يلي على المسلم؛ ولأن العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره؟ والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة ومثله الصبي والمجنون ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى حالهن على الستر.

وإليه أشار النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث قال «كيف يفلح قوم تملكهم امرأة» وقوله قادرا: أي على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد الثغور؛ وحماية البيضة وحفظ حدود الإسلام؛ وجر العساكر. (رد المحتار، باب الإمامة، مطلب شروط الإمامة الكبرى)

এর উপরই শত হাজার বছর যাবত ফাতওয়া চলে আসছে। পাঠক আশা করি আমাদের উদ্ধৃতির আশায় বসে না থেকে মূল কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করলেই বেশি তৃপ্তি পাবেন। তাই দারুল উলূম দেওবন্দ তার বন্ধু ও শত্রু চিনতে ভুল করার কোন কারণ নেই। আমরা বিষয়টিকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। উদ্ধৃতিগুলোর অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং এর আলোকে ফাতওয়া দেয়া থেকে আমরা বিরত থাকছি। কারণ আমাদের তাফাক্কুহের অভাবের কথা সবার মুখে মুখেই আছে। তাই তাফাক্কুহের দায়িত্ব এবারের মত ফকীহ পাঠকবর্গের যিম্মাতেই থাকুক।

*************

# নাস্তিক-বড় সংলাপ ১

'হ্যালো ওয়াশিংটন' থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা সরাসরি শুনতে পাচ্ছে একটি সংলাপ। এক নাস্তিক ফাতওয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলে চলেছে। মুসলমানদের শরীয়তের স্বীকৃত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে চলেছে। দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম সেসব বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। মুসলমানরা তাদের বিষয়াদির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কাছে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে ওলামায়ে কেরাম কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। নাস্তিকের দৃষ্টিতে শরীয়াভিত্তিক এ সিদ্ধান্তগুলো অন্যায়, মানবতা বিরোধী, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী।

## বড়

'বড়'র কাছ থেকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। নাস্তিকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে 'বড়'কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে। 'বড়' বলেছেন, আসলে এগুলো হচ্ছে আমাদের সচেতনতার অভাব। সচেতনতা বাড়ানো দরকার। এর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রস্তাবের উপর নাস্তিক খুব সন্তুষ্ট হয়েছে।

## ছোট

সচেতনতার অভাবের কারণে ওলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিতে পারছেন। শরয়ী মাসআলা মাসায়েল বলতে পারছেন। এ সচেতনতা যদি থাকত তাহলে কী হত? ওলামায়ে কেরাম আর ফাতওয়া দিতে পারতেন না। মুসলমান তাদের বিষয়াদির সমাধানের জন্য ওলামায়ে কেরামের কাছে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করত না। সাধারণ জনগণকে শরীয়তের ফাতওয়ার বিরুদ্ধে সচেতন করা গেলে এবং ফাতওয়ার বিরুদ্ধে সচেতন করার যথাযথ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা গেলে ওলমায়ে কেরাম কোন বিষয়ে ফাতওয়া দিতে গেলেই তার পিঠের চামড়া তুলে ফেলা হত। একবার পিঠের চামড়া তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা গেলে আলেমও ফাতওয়া দেয়ার আর সাহস করবেন না; সাধারণ মুসলমানরাও ফাতওয়ার জন্য আলেম ও মুফতীর কাছে যাওয়ার হিম্মত করবে না। ফাতওয়া

ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত এভাবেই খুব সহজে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিতে থাকবে। একদিন পৃথিবীটা শয়তানের ও দাজ্জালের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

### দারুল উলূম দেওবন্দ

এ বড়র ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের সিদ্ধান্ত কী? নাস্তিক কোন ফাতওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে? নাস্তিক কোন শরীয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছে? নাস্তিক যে ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে বলছে, সে ফাতওয়া ও সে শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করার পরামর্শদাতা মুসলমান না কাফের? ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীর ব্যাপারে বিগত শত দেড় শত বছর যাবত দারুল উলূম দেওবন্দের সিদ্ধান্ত কী ছিল? ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী, ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকারী, ফাতওয়া ও শরীয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরামর্শ দানকারী ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু না মিত্র?

### সম্ভাব্য সংশয় নিরসন

'বেনামাযীর বাহাত্তর ওযর' মূলনীতির আলোকে কেউ মনে করতে পারে, এ কথা সকল ফাতওয়া ও শরীয়তের সকল বিধানের ক্ষেত্রে বলা হয়নি।

শুধুমাত্র 'বড়'র বড়ত্বকে বজায় রাখার জন্য যদি কেউ এমন কথা মনে করে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমার কয়েকটি নিবেদন রয়েছে, যা একটু মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এর আগে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে 'বড়'র একটি বড় অংশ রয়েছে যারা কুরআনের ভাষায় 'আকাবিরা মুজরিমীহা'র মিসদাক। তাই 'বড়'র বড়ত্ব বজায় রাখা মুসলমানদের উপর ফরয দায়িত্ব না ওয়াজিব, না সুন্নত, না মুস্তাহাব, না মুবাহ, না মাকরূহ, না হারাম, না কুফর সে দিকটাও একটু ভাবতে হবে।

আমার নিবেদনগুলো এই-

**ক.** নাস্তিকের ফাতওয়া প্রসঙ্গটি খুবই স্পষ্ট ছিল যার জবাবে 'বড়' এসব কথা বলেছেন। তাই এ দূরবর্তী সম্ভাবনা বের করার কোন প্রয়োজন নেই।

**খ.** শরীয়তের কোন কোন বিষয় এমন আছে যার উপর ফাতওয়া দেয়া নিষিদ্ধ এবং সে ফাতওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং সে ফাতওয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা হারাম ও কুফরী নয়?

**গ.** 'বড়'র সঙ্গে যে নাস্তিকের কথা হচ্ছে সে নাস্তিকতো কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে। তাহলে তার সঙ্গে আলাপচারিতার সময় ফাতওয়া ও শরীয়তের বিশেষ কোন অংশকে নিষিদ্ধ করে কোন অংশকে বৈধতা

দিয়েছেন বলে পাঠকের ধারণা। ফাতওয়া ও শরীয়তের বিশেষ কোন অংশকে অবৈধ বলে অপর অংশকে স্বীকার করার কী পদ্ধতি এ 'বড়'র কাছে আছে? আর ফাতওয়া ও শরীয়ার বিশেষ কোন অংশকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলার পর, বা এমন বিশ্বাস মনে ধারণ করার পর সে মনে, সে কলবে ঈমানকে স্থান দেয়ার পদ্ধতি কী?

**ঘ.** 'বড়' ও 'বড়'র ইজ্জত রক্ষাকারী পরিষদ হয়তো সংশয়ে ভুগছেন যে, কোন ফাতওয়া ও শরীয়া যদি রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীত হয় তাহলে সে ফাতওয়া ও শরীয়া অবৈধ ও নিষিদ্ধ। এ এতিমরা হয়তো খেয়াল করতে ভুলে গেছে যে, ফাতওয়া যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং তা শরীয়ার স্বীকৃত বিষয় হয়ে থাকে তাহলে তার বিপরীত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কোন রাষ্ট্রের নেই।

আর রাষ্ট্র যদি মনে করে শরীয়ার স্বীকৃত বিষয়ের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তার আছে তাহলে যারা যারা এ কথা মনে করবে তারা মুসলমান নয়। আর ফাতওয়া ও শরীয়ত কখনো কাফের রাষ্ট্র, কাফের রাষ্ট্রপতি ও কাফের রাষ্ট্রের আইনের মর্জি মোতাবেক চলে না। ফাতওয়া ও শরীয়ার বিধানতো এটাই। এখন আপনি ফাতওয়া ও শরীয়া মানবেন কি মানবেন না তা আপনার সিদ্ধান্ত। আপনি নিজেকে শরীয়া ও ফাতওয়ার অনুসারী মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেবেন? না কি শরীয়া ও ফাতওয়া বিরোধী কাফের হিসাবে পরিচয় দেবেন? তা আপনার সিদ্ধান্ত। আপনি ফাতওয়া ও শরীয়া প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়ে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করবেন? না কি ফাতওয়া ও শরীয়া প্রয়োগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার পরামর্শ দিয়ে কাফের হিসাবে জীবন যাপন করবেন? তা আপনার সিদ্ধান্ত।

আর দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজ কাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করবে আর কাকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে তা দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজ সিদ্ধান্ত নেবে।

**ঙ.** নেফাকের আরেকটি দরজাও এখানে খোলার চেষ্টা হতে পারে। আর তা হচ্ছে, ফাতওয়া ও শরীয়তের কিছু বিষয়তো এমনও আছে যা প্রয়োগ করা সরকারের কাজ, সাধারণ মানুষ তা করার অধিকার রাখে না। 'বড়' মূলত সে কথাটা বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু দুই কারণে নেফাকের এ দরজাটি খোলা থাকছে না।

**এক.** ফাতওয়া দেয়া ও ফাতওয়ার প্রয়োগ দু'টি ভিন্ন বিষয়। শরীয়ার সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ দু'টি ভিন্ন বিষয়। প্রয়োগের কিছু ক্ষেত্র এমন আছে যা সরকার করবে, সাধারণ মানুষ করবে না। তবে এ কথাটিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু ফাতওয়া দেয়া বা শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে ব্যাপারে ফাতওয়া দেয়া যাবে না বা শরীয়তের

সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। অতএব কোন অবস্থাতেই কোন ক্ষেত্রেই ফাতওয়া ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত দেয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কোন বৈধতা নেই। ফাতওয়া ও শরীয়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করা বা এর পরামর্শ দেয়া কুফরী। এর মাঝে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই।

**দুই.** যে ফাতওয়া ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের সে ফাতওয়া ও শরীয়তের সিদ্ধান্ত দেয়া ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণ ও মুসলমানদের কর্ণধারদের দায়িত্ব কী? বলাবাহুল্য, এসব ফাতওয়া দেয়া বা প্রয়োগ করার পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হচ্ছে যখন রাষ্ট্রের মালিকপক্ষ শরীয়ত অনুযায়ী ফাতওয়া দেয় না এবং শয়ীয়া অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করে না; বরং ফাতওয়া ও শরীয়া আইনের বিপরীতে অবস্থান নেয়।

## করণীয় বুঝে নিতে হবে

এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমান ও তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এ মালিকপক্ষের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যে, এ অভিভাবক মুসলমানের অভিভাবক না কি অমুসলিমদের অভিভাবক। এমনিভাবে ফাতওয়া ও শরীয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা মুসলমান ও তাদের কর্ণধারদের দায়িত্ব? না কি ফাতওয়া ও শরীয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা মুসলমান ও তাদের কর্ণধারদের দায়িত্ব? রাষ্ট্রের মালিক পক্ষ যদি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে তারা ফাতওয়া ও শরীয়ার পক্ষে যাবে না; বরং তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখে, তাহলে মুসলমানদের কী দায়িত্ব তা কিতাব থেকে খুঁজে বের করাও মুসলমানদের উপর ফরয।

মনে রাখতে হবে, ইলমের ঐ অধ্যায়গুলো জানা ফরযে আইন যে অধ্যায়গুলোর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন আমলের সম্পর্ক। এ ইলম থেকে বিমুখ থাকার চেষ্টা করা কবীরা গুনাহ। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলে ফরয তরকের গুনাহের পাশাপাশি ‘কিতমানে ইলম’ তথা সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। আর যদি সত্যের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে পূর্বের দু'টি অপরাধের সাথে খেয়ানতের অপরাধ যুক্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোন আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা করা হলে অপচেষ্টাকারীর কুফরের পথ সুগম হতে থাকবে। তাই সাবধান! খুব সাবধান!!

## আরেকটি দৃশ্য

নাস্তিক বলিষ্ঠ ভাষণে সুস্পষ্ট শব্দে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে কুরআনের সত্যতা অস্বীকার করে বলে চলেছে, আচ্ছা মাওলানা ...... (বড়) সাহেব!

আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, কুরআন বলছে আল্লাহ তাআলা কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনারাও বলছেন কুরআন শতভাগ সংরক্ষিত। অথচ আমরা হাদীসে পাই, সুনানে ইবনে মাজাহ এত নম্বর হাদীসে নবীর পত্নী আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, তাঁরা মুহাম্মদের ইন্তেকালের পর তাঁর দাফন কাফনে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে একটি ছাগল এসে কুরআনের রজম বা প্রস্তরাঘাত সম্বলিত আয়াতটি খেয়ে ফেলেছে। আচ্ছা মাওলানা ...... (বড়) সাহেব! আমাদেরকে কি একটু বোঝাতে পারেন? এতবড় সংরক্ষণের দাবি, আর সামান্য একটা ছাগল তা খেয়ে ফেলছে, আবার সে আয়াত দিয়ে শরীয়ার মধ্যে রজম প্রমাণিত হচ্ছে! বিষয়গুলো কি একটু এলোমেলো নয়? বিষয়টি একটু পরিষ্কার করুন।

**বড়**

আসলে, আসলে আপনি যেভাবে বললেন, আসলে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়গুলোর সমাধান সম্ভব। আমরা যদি একান্তে বসতে পারি তাহলে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব। আমি আপনাকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

**ছোট**

নাস্তিক কর্তৃক বলিষ্ঠ ভাষায় কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকারের উপর 'বড়'র সম্মতিসূচক জবাবকে ঘিরে ছোটদের মনে হাহাকারের আর্তনাদ নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সন্দেহের বহুমুখী শর দিকবিদিক ছুটে চলেছে। অগনিত কুরআন প্রেমিকের কলিজার মধ্যে বিঁধে চলেছে। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ শত নালীতে বয়ে চলেছে। বুকের উপর প্রকাণ্ড পাথরের এ চাপ সামান্য লাঘব হবে এ আশায় পাঠকবর্গকেও সে প্রশ্নগুলোর সঙ্গে অংশিদার করে নিচ্ছি।

**ক.** কুরআনের শত্রু নাস্তিক মুরতাদের মুখে কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করা হল লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বলিষ্ঠ ভাষায়। কিন্তু কুরআনের বাহক হওয়ার দাবিদার কুরআনের সত্যতার পক্ষে কোন দাবিই করেননি। উপরন্তু পরাজিত সুরে কিছু একটা বলার জন্য একান্তে আলোচনার দাওয়াত দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা দু'জনের এ আলোচনা থেকে কী বার্তা পেল? কুরআনের সত্যতার পক্ষে কতটুকু ধারণা তৈরি করে গেল, আর কুরআনের অসত্যতার পক্ষে কতটুকু ধারণা তৈরি করে গেল?

**রহস্যে ঘেরা প্রস্তাব**

**খ.** কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকারকারী একজন নাস্তিককে একান্তে ডেকে নিয়ে কী কথাগুলো বলা হবে বলে পাঠকের ধারণা? কোন সন্ধি বা সমঝতা? কম্প্রমাইজ? না কি একান্তে বসে স্বীকার করে নেয়া হবে যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের যে কিছু দুর্বলতা আছে সেটা আমরাও জানি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়? না কি একান্তে বসে হেকমতের সাথে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে? এমন ধারণা কি আমরা মনে জায়গা দেব?

এ নাস্তিককে আমি ও আমার পাঠক যতটুকু চিনি এর চাইতে অনেক বেশি চিনেন সে 'বড়'। এ সংলাপের বহু আগে থেকেই চিনেন। নাস্তিক হিসাবে চিনেন। এ বিষয়ে এত দিন দাওয়াত না দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে কুরআনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করার পর দাওয়াতের এ হেকমতপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরা কী ধারণা করতে পারি?! যে কুরআনের অসত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করল প্রকাশ্যে, তাকে কুরআনের সত্যতা একান্তে বোঝানোর রহস্যটা কী? প্রশ্নটাতো সে লক্ষ শ্রোতার পক্ষ থেকে করেছে, সে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর কোথায় কীভাবে দেয়ার চিন্তা করা হয়েছে?

**গ.** কুরআনের সত্যতার বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। মুসলমানের আকীদা বিশ্বাস কী? কুরআনের সত্যতা কি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হওয়ার বিষয়? তাও সে আলোচনা একজন নাস্তিকের সঙ্গে! লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এ জবাব থেকে কী বার্তা পেল?

**ঘ.** আলোচনার মাধ্যমে যে কোন বিষয়ের সমাধান হতে পারে। কিন্তু কুরআনের সত্যতা কি এমন সব বিষয়ের একটি যেসব বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়? লক্ষ লক্ষ শ্রোতা কী ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে? তাদের কী ধারণা তৈরি হয়েছে? সমাধান কুরআনের সত্যতার পক্ষে যাবে না কি অসত্যতার পক্ষে যাবে। সংলাপের প্রাথমিক ফলাফলকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

## কুরআনের সত্যতাকে সন্দেহযুক্ত রেখে দেয়া হল কেন?

**ঙ.** সংক্ষেপে কেন এতটুকু কথা বলা গেল না যে, যে মুহূর্তে হাজার হাজার হৃদয়ে পুরা কুরআন অংকিত রয়েছে, শত শত সহীফায় কুরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে সে মুহূর্তে ব্যক্তিবিশেষের কাছে সংরক্ষিত একটি আয়াতকে ছাগলে নষ্ট করে ফেললে এর কারণে কুরআনের সত্যতা কেন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে? আজ যদি আরবের রাজ প্রাসাদে আগুন লেগে কুরআনের সব গুদামে

আগুন লেগে কুরআনের মুদ্রিত সবগুলো কপি জ্বলে যায় তাহলে কি বলা যাবে যে, কুরআনের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ? কারণ কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি জ্বলে গেছে। এ বিষয়ে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ারও কি সুযোগ আছে?

এটাতো স্বতসিদ্ধ কথা যে, কুরআনের কোন একটি আয়াতও একক সূত্রে বর্ণিত হয়নি। শুধুমাত্র একটি মাত্র বর্ণনা সূত্র দিয়ে কুরআন প্রমাণিত হয়নি। কুরআনের প্রতিটি আয়াত অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই মুতাওয়াতির। কোন একজনের বিশেষ সূত্রের উপর কখনো কুরআন নির্ভরশীল নয়। একজনের লিপি ছাগলে খেয়ে ফেললে তাতে কুরআনের সত্যতার কী সমস্যা? যার ব্যক্তিগত লিপি নষ্ট হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## সন্দেহ করতে ইচ্ছা করছে না

যত 'বড়'র সামনে একজন নাস্তিক তুচ্ছ অজুহাতে কুরআনের সত্যতার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছে সে মাপের একজন 'বড়' এর উত্তর জানে না -এ সন্দেহ করতে একদম ইচ্ছা করছে না।

চ. সত্যের পথের রাহবার হওয়ার দাবি সত্য হয়ে থাকলে সত্যের পক্ষে কেন বলিষ্ঠভাবে বলা গেল না যে, কুরআনের রহিত আয়াতগুলোর মধ্যে কিছু আয়াত এমন আছে যার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার বিধান বহাল রয়ে গেছে। আর একজন নাস্তিক যে ধর্মের অভ্যন্তরের এ কথাগুলো বোঝার কথা নয় বা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়, এমন নাস্তিকের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সংলাপে বসার উদ্দেশ্যই বা কী হতে পারে? একজন নাস্তিকের সঙ্গে আলোচনার বৈধতা বের হয়ে আসলেও তা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে, এর একটা সুরাহার পর বাকি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে।

কেন তাকে সংক্ষেপে বলা গেল না যে, তিলাওয়াত রহিত হয়ে যাওয়া একটি আয়াতের একটি বিশেষ কপি ছাগলে খেয়ে ফেলার দ্বারা কুরআনের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না। নাস্তিক লোকেরা মানুক বা না মানুক লক্ষ লক্ষ শ্রোতাতো কুরআনের বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারত। 'বড়'র মাথায় এ উত্তরগুলো ছিল না এমন সন্দেহ করতে আমারও ইচ্ছা করছে না, আমার ধারণা মতে আমার পাঠকরাও সে সন্দেহ করতে রাজি হবে না। কারণ এ উত্তরগুলোর সঙ্গে কিতাবের উদ্ধৃতি জানা থাকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমার বার বার কেবলই কেন জানি মনে হয়, এখানে ভয়ঙ্কর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।

ছ. একজন 'বড়' হিসাবে নাস্তিকের উদ্ভট আপত্তির জবাবে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কেন বলা গেল না যে, এ বর্ণনার ব্যাখ্যা বর্ণনার সাথে সাথেই উল্লেখ করা আছে। ফকীহ মুহাদ্দিসগণ এর যথাযথ ব্যাখ্যা সে প্রাচীন কালেই

দিয়ে রেখেছেন। এ ঘটনার কারণে কুরআনে কারীমের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে এমন কোন কারণই সেখানে বিদ্যমান ছিল না। পাঠকবর্গ সুনানে ইবনে মাজাহ এর সে বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমুহুল্লাহর বক্তব্যটি দেখে নিন।

**সুনানে ইবনে মাজাহ'র সে বর্ণনাটি**

عن عائشة، قالت: «لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها». باب رضاع الكبير، كتاب النكاح، الرقم: ١٩٤٤

**আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বক্তব্য-**

قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا بَلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثُ، وَهَذَا أَمْرٌ وَقَعَ، فَأَخْبَرَتْ عَنِ الْوَاقِعَةِ دُونَ تَعَلُّقِ حُكْمٍ بِهَا، وَقَدْ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ مَعْلُومَة عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَعَلِمُوا نَسْخَ تِلَاوَتِهَا وَإِثْبَاتِهَا فِي الْمُصْحَفِ دُونَ حُكْمِهَا، وَذلِكَ حِينَ رَاجَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ فِي كَتْبِهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهَا. معرفة السنن والآثار، بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، ٢٦ - كِتَابُ الرَّضَاعِ، الرقم: ١٥٤٦٩

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, হাদীসটি এভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এটি একটি ঘটনা যা ঘটেছে, সে ঘটনা আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে মূল বিধানের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। রজমের আয়াত সাহাবায়ে কেরামের জানা শোনার মধ্যেই ছিল। তাঁরা এটাও জেনেছিলেন যে, এর তিলাওয়াত এবং কুরআনের কপিতে এর স্থাপন করা রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু এর বিধান রহিত হয়নি। আর এটা তখনই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যখন ওমর রা. আয়াতটি মুসহাফে স্থাপন করার বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁকে এ বিষয়ে অনুমতি দেননি। -মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী, ১৫৪৬৯

তিলাওয়াত রহিত একটি আয়াতের একটি কপি আয়াশা রা. এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। তাঁর নিজস্ব সে কপিটি ছাগলে খেয়ে ফেলেছে। এ অজুহাতে কুরআনের শত্রুরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহের বীজ বপন করে চলেছে। আর কর্ণধারদেরও কর্ণধার হওয়ার দাবিদাররা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদেরকে সে সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ দিয়ে চলেছে।

এসব হচ্ছে ছোটদের কথা। ছোটদের মূল্যায়ন। কাঁচা ও ভাসা ভাসা মেধার অধিকারীদের দৃষ্টি।

### দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দ তার মানহাজের বিচারে এ ক্ষেত্রে কী করবে? যে একজন নাস্তিককে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে কুরআনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করার সুযোগ করে দিয়েছে, তাকে দারুল উলূম দেওবন্দ মিত্র হিসাবে কাছে টেনে নেবে না কি তাকে শত্রু হিসাবে দূরে ঠেলে দেবে? দারুল উলূম দেওবন্দকে আমরা যতটুকু জেনেছি, তার শত্রু-মিত্র চেনার মত যোগ্যতা আছে। যে একটি জাতির ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাকে দারুল উলূম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে এতটা দেউলিয়া হয়ে যায়নি। হোক তার শিরনাম ছোট বা বড়। কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় শত্রু-মিত্র নির্ণয় করার মত যোগ্যতা দারুল উলূম দেওবন্দের রয়েছে।

*************

# নাস্তিক-বড় সংলাপ ২

দেশের সেরা নাস্তিকদের একজন এক 'বড়'কে এক টিভি সংলাপের টেবিলে জিজ্ঞেস করে বসেছে, আপনারা কওমী সনদের স্বীকৃতি চান, অথচ আপনারা আপনাদের মাদরাসাগুলোতে জাতীয় পতাকা ওড়ান না এবং জাতীয় সঙ্গীত গান না।

**বড়**

না। আপনার এ কথা ঠিক নয়। মাদরাসাগুলোতে পতাকা ওড়ানো হয় এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

**ছোট**

'বড়'র এ ছোট্ট উত্তরটির উপর ছোটদের পেরেশানীর কোন অন্ত নেই। পেরেশানীর কারণেরও কোন অভাব নেই। অবশ্য ছোটরা যেমন ছোট তেমনি তাদের পেরেশানীও ছোট। আর পেরেশানীর কারণতো অবশ্যই একেবারে তুচ্ছ হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষত এ বিষয়ে বড়রা কোন প্রকার সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে না। তবু ছোটদেরও তো ছোট আছে। অথবা ছোটদের ছোটরাও তো একদিন এ অসঙ্গত ও অসম পৃথিবীতে আসবে। তখন ছোট হওয়ার কারণে তারাও হয়ত পেরাশান হবে। ছোট হিসাবে ছোটদের কাছে তাদের আবদারও খুব বেমানান হবে না। তাই আমাদের পেরেশানী ও পেরেশানীর কারণগুলো এখানে তুলে ধরছি-

**শরীয়তের হাতে ন্যস্ত করাই নিরাপদ ছিল**

ক. পেরেশানী ও পেরেশানীর প্রথম কারণ হচ্ছে, 'বড়' পতাকা ওড়ানো ও জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করার পর নাস্তিক বলেছে, আমি এ মুহূর্তে অন্তত এক হাজার মাদরাসার তালিকা দিতে পারব যেখানে জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় না এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। কিন্তু 'বড়' তার এ দাবি মানতে রাজি হলেন না।

কিন্তু আমি ও আমরা জানি, নাস্তিকের দাবিটি সঠিক এবং সঠিক হলেই ভালো হত। 'বড়' খোদ নিজের মাদরাসায় কবে থেকে পতাকা ওড়ানো শুরু

করেছেন? আর জাতীয় সঙ্গীত ফজরের পরে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতের আগে পড়েন না পরে পড়েন? মাদরাসাগুলোতে হাদীস ও তাফসীরের ঘন্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের তালীম শায়খুল হাদীসগণই দিচ্ছেন? না কি ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, যে প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গটি এসেছে সে প্রশ্ন হিসাবে এ মহান (?) দায়িত্বটি দাওরার উস্তায ও শাগরেদদের উপরই বর্তায়।

**খ.** পেরেশানীর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এ 'বড়'র বড়রা একদিন ফাতওয়া ও দলিলের আলোকে জনসমাবেশে বলেছিলেন, জাতীয় সঙ্গীতের মাঝে শিরক আছে। শিরক সম্বলিত একটি গান মুসলমানরা গাইতে পারে না। আর শিরক থাকার সহজ কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল সঙ্গীতটি হিন্দু লেখকের হওয়াকে। পতাকা না উড়িয়েও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমরা রীতিমত পতাকা উড়াই। আজ সে সঙ্গীত না গেয়েও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আমরা সে সঙ্গীতটি গাই।

অসহায়ত্বের মাত্রা কি আসলেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে? কেন জানি মনে হচ্ছে, আমরা যতই অগ্রসর হচ্ছি বলে মনে করছি ততই যেন অসহায় হয়ে পড়ছি। যতই দামি হচ্ছি বলে মনে করছি ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছি। যতই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছি বলে দাবি করছি ততই যেন গলে যাচ্ছি। অনেকটা জেলের জালে পড়া মাছের মত। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এক কদম এগিয়েছি অথচ পেছন ফিরে তাকালেই দেখি আমাদের পায়ের শিকল আরো শক্ত হয়ে গেছে। মুক্তির জন্য যে লাফ দিচ্ছি অমনি জালের আরেকটি পেঁচ আমাদের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

এমন কেন হচ্ছে? হয়তো বা ছোট হওয়ার কারণে বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারছি না। অযথা পেরেশান হয়ে চলেছি। আল্লাহ করুন এমনই হোক।

## স্পষ্ট হওয়ার দরজা খুলতে পারলেই ভালো হত

**গ.** ছোট মনের প্রশ্ন, নাস্তিকের এমন প্রশ্নের জবাবে যদি অবাস্তবতার আশ্রয় না নিয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া হত এবং এভাবে স্বীকার করা হত যে, হাঁ! আমরা এতদিন জাতীয় পতাকা উড়াইনি এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইনি। এখন স্বীকৃতির বিষয়টি যদি জাতীয় পতাকা ওড়ানো ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওলামায়ে কেরাম বিষয়টি দেখবেন। এতে যদি ইসলামী শরীয়তের আইনে কোন বাধা না থাকে তাহলে এটা গ্রহণ করতে সমস্যার কিছু নেই। আর যদি শরীয়তের আইনে এতে বাধা থাকে তাহলে নিশ্চয় সরকার শরীয়তবিরোধী কোন কিছু করতে ওলামায়ে কেরামকে বাধ্য করবে না। আর যদি শরীয়ত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও

সরকার তা করতে বাধ্য করে তাহলে বিষয়টিকে আরো গোড়া থেকে ভাবতে হবে।

কথা যদি এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছাতো তাহলেইতো আমরা একটা ফয়সালায় পৌঁছাতে পারতাম। সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো বলা হতো যে, এ দু'টি কাজ শরীয়ত বিরোধী হলে মুসলমানরা তা করার দরকার নেই। এমনটি বললে মামলা এখানেই শেষ হয়ে যেত। কোন প্রকার লুকোচুরির প্রয়োজন ছিল না। আর যদি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হতো যে, শরীয়ত বিরোধী হলেও তা করতেই হবে। তাহলে আমরা সরকারকে চিনতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, শরীয়ত বিরোধী কাজ করেও আমাদের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে কি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অস্পষ্টতাকে জিইয়ে রাখতেই আমরা পছন্দ করি। যাতে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হলে বলতে পারি, 'বিষয়টাকেতো আসলে এভাবে খতিয়ে দেখিনি'।

## এ পানি কোথায় গড়াবে? বলতে পারেন?

আজ জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসেছে আর আমরা এ অবস্থান গ্রহণ করেছি। আগামী কাল জাতির জনক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির প্রশ্ন আসবে, অথবা ইতিমধ্যে এসেও গেছে। প্রশ্ন হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। আপনারা স্বীকৃতি চান অথচ আপনারা আপনাদের মাদরাসার দফতরে ও দারুল হাদীসের মসনদের উপর জাতির জনক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় উত্তর এটাই হবে যে, না, আমরা প্রতিকৃতি স্থাপন করেছি। এ উত্তরের পর আগে স্থাপন না করে থাকলেও এখন তড়িঘড়ি তা করে ফেলা হবে। অবস্থার যখন আরো উন্নতি হবে তখন একই আইনের আওতায় মাদরাসার আঙ্গিনায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যগুলো স্থাপন সম্পর্কে প্রশ্ন আসবে এবং আশা করা যায় উত্তর ও কর্মপন্থা তাই হবে যা পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হয়েছে। ধাপে ধাপে মূর্তির সামনে অর্ঘ্য ও পুষ্প নিবেদনের বিধানও আসবে, ধীরে ধীরে আরো কত কিছু হবে। যদি আমরা গোড়া থেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা না করি। অস্পষ্টতাগুলো দূর করার কোন সিদ্ধান্ত না নেই। আল্লাহ হেফাযত করুন।

এ সবই হচ্ছে ছোট মনের অমূলক কিছু আশঙ্কা। বড় মনে এ সবের কোন স্থান নাও থাকতে পারে। এ সবের সঙ্গত কোন হেতু নাও থাকতে পারে।

## এত বড় হওয়ার প্রয়োজন কী?

ঘ. প্রায়ই দেখা যায় নাস্তিকদের জোট আমাদের কোন 'বড়'কে একসঙ্গে ঘিরে ধরে। তখন সঠিকভাবে কোন কথা বলারও অবস্থা থাকে না। প্রশ্নগুলো এমন বাঁকে এনে দাঁড় করানো হয় যে, জবাব হয়তো দেশের বিরুদ্ধে যাবে, নয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে। এমতাবস্থায় যা করার ছিল তা করার মত মানসিক শক্তি ও প্রস্তুতি আমরা নেইনি। যেহেতু প্রস্তুতি নেইনি সেহেতু আমাদের ছোট মনের আবদার হচ্ছে, আমরা এত বড় হওয়ার প্রয়োজন কী যে, টিভি টকশোতে আমাদের উপস্থিত হতে হচ্ছে? এমন কী প্রয়োজন রয়েছে যে, একজন নাস্তিকের সঙ্গে আমাকে মুখোমুখী বিতর্ক করে জেতার যোগ্যতা দেখাতে হবে? আমরাতো সব সত্য বলার মানসিকতা এখনো তৈরি করিনি।

একটি দেশের সংবিধান ও আইন শতভাগ ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। আমি আলোচক ইসলামের শতভাগ অনুসরণের দাবিদার। দেশের আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া যাবে না সে ঘোষণাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়ে ফেলেছি। এমতাবস্থায় দু'কূল রক্ষা করে বিতর্কে জিতে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে?! হাজারো যোগ্যতা দিয়ে কী হবে? ইসলামের শতভাগ নিয়ন্ত্রণমুক্ত মানব রচিত আইনও শ্রদ্ধেয়, ইসলামের আইনও শ্রদ্ধেয়, আবার তর্কে জেতার স্বপ্ন! এ সকল বৈপরীত্য থেকে বের হয়ে আসার সময় কবে হবে?! আমরা আর কতকাল অপেক্ষা করব?! আমরা নিজেদেরকে আর কত কাল ধোঁকা দিতেই থাকব?!

### দারুল উলূম দেওবন্দ

আমার জানামতে দারুর উলূম দেওবন্দে 'বান্দে মা তরম' গাওয়া এখনো শুরু হয়নি। সন্তানরা একটু বাড়তি অগ্রসর হয়ে গেল। দারুল উলূম দেওবন্দ তার সন্তানদেরকে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের অনুমতি দিতে হলে তার সকল আইন কানুনসহই দিতে হবে। না হয় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের বেহুরমতীর (?) কারণে কাফফারা দিতে দিতে পিঠের চামড়া থাকবে না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্পর্কীয় মাসআলাগুলো এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া সম্পর্কীয় মাসআলাগুলো পড়ে রপ্ত করে নিতে হবে।

জাতীয় পতাকা ছিড়ে গেলে বা পুরাতন হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে কিভাবে তাকে সম্মানের সহিত দাফন করতে হবে সে বিষয়গুলো জানতে হবে। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় বসা থেকে উঠে যেতে হবে এবং বুকে হাত দিয়ে সঙ্গীতের সামনে সসম্মানে দাঁড়িয়ে থাকার বিধানাবলি জানতে হবে। বিস্তারিত দেখুন।

“জাতীয় পতাকা ব্যবহার আইন

জাতীয়  পতাকা ব্যবহারের নিয়ম এবং আইন

নিজস্ব প্রতিবেদক । মার্চ ২৭, ২০১৭ - ১২:০৭ অপরাহ্ণ

জাতীয় পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতীক হচ্ছে আমাদের প্রিয় লাল সবুজ পতাকা। জেনে হোক বা অজ্ঞতার কারণে হোক, জাতীয় পতাকার অবমাননা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জাতীয় পতাকা কীভাবে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে তার লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন আনিসুর বুলবুল।

জাতীয় পতাকা বিধিমালা-১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)-এ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের নিদর্শন। তাই সব সরকারি ভবন, অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভবনে সব কর্মদিবসে পতাকা উত্তোলনের বিধান রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেমন- ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্য যেকোনো দিবসে বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি ভবন ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রাঙ্গণে এবং কনসুলার কেন্দ্রগুলোয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা বাধ্যতামূলক। তা ছাড়া শহীদ দিবস ও জাতীয় শোক দিবসে বা সরকার প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকার বিধান করা হয়েছে।

অর্ধনমিত রাখতে হলে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম হলো, অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে এবং পতাকা নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে নামাতে হবে।

ইচ্ছা করলেই যে কেউ গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারে না। কোন কোন ভবনে ও কারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন, এ সম্পর্কে ওই আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও অফিসে সব কর্মদিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ৬ (৩) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে, নৌযানে ও বিমানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবে। এ ছাড়া স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী সমমর্যাদার ব্যক্তি, বিদেশে বাংলাদেশি মিশনের প্রধানের

গাড়িতে ও তাদের নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। প্রতিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি, উপমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজধানীর বাইরে ভ্রমণকালে গাড়িতে ও নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

৭ ধারায় জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যদি পাশাপাশি ২টি পতাকা উত্তোলন করা হয়, সে ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা ভবনের ডান দিকে উত্তোলন করতে হবে। জাতীয় পতাকার ওপর অন্য কোনো পতাকা উত্তোলন করা যাবে না।

আজকাল খেলার সময়, বিশেষ করে বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রেমীরা বাসভবনে নিজ সমর্থনীয় দেশের পতাকা এমনভাবে ওড়ান, যাতে দেশের জাতীয় পতাকা নিচে পড়ে থাকে। কিন্তু কাজটি বেআইনি। কেননা আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পতাকার ওপরে অন্য কোনো পতাকা বা রঙিন পতাকা ওড়ানো যাবে না।

মিছিলে পতাকা বহনের বিধান হচ্ছে, পতাকা মিছিলের কেন্দ্রে অথবা মিছিলের অগ্রগমন পথের ডান দিকে বহন করতে হবে। অনেকেই জাতীয় পতাকায় নকশা করে ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু জাতীয় পতাকার ওপর কোনো কিছু লেখা বা মুদ্রিত করা যাবে না অথবা কোনো অনুষ্ঠান বা উপলক্ষে কোনো চিহ্ন অঙ্কন করা যাবে না; এমনকি জাতীয় পতাকাকে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং গায়ে জড়িয়ে রাখা যাবে না। তবে পূর্ণ সামরিক মর্যাদা বা পূর্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হলে তাঁর শবযাত্রায় জাতীয় পতাকা আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুমতি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকাকে ট্রেডমার্ক, ডিজাইন বা পেটেন্ট হিসেবে ব্যবহার করাও অপরাধ। কোনো অবস্থায়ই পতাকা নিচে অবস্থিত কোনো বস্তু যেমন- মেঝে, পানি ও পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করবে না এবং কবরের ওপরে স্থাপন করার সময় পতাকাটি কবরে নামানো যাবে না কিংবা মাটি স্পর্শ করবে না। পতাকা এমনভাবে উত্তোলন, প্রদর্শন বা মজুদ করা যাবে না, যাতে এটি সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে, মাটি লাগতে পারে বা নষ্ট হতে পারে। কোনো দেয়ালে দ-বিহীন (সম্ভবত দণ্ডবিহীন) পতাকা প্রদর্শিত হলে তা দেয়ালের সমতলে এবং রাস্তায় প্রদর্শিত হলে উলম্বভাবে দেখাতে হবে। গণমিলনায়তন কিংবা সভায় পতাকা প্রদর্শন করা হলে বক্তার পেছনে ও ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে।

পতাকার মাপ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় দেশে বিভিন্ন মাপের পতাকা দেখা যায়। জাতীয় পতাকার মাপ হবে ১০: ৬ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে ১০ ফুটী ৬ ফুট, ৫ ফুটী ৩ ফুট, ২.৫ ফুট /১.৫ ফুট। তবে অনুমতি সাপেক্ষে ভবনের আয়তন অনুযায়ী এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে বড় আয়তনের পতাকা প্রদর্শন করা যাবে। গাড়িতে ব্যবহারের জন্য মাপ হচ্ছে ১৫ ইঞ্চি ৯ ইঞ্চি, ১০ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি।

জাতীয় পতাকা কোনো অবস্থায়ই সমতল বা সমান্তরালভাবে বহন করা যাবে না এবং উত্তোলনের সময় সুষ্ঠু ও দ্রুতলয়ে উত্তোলন করতে হবে এবং সসম্মানে অবনমিত করতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত গাইতে হবে এবং যখন জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং প্রদর্শিত হয়, তখন উপস্থিত সবাইকে পতাকার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। মোটরগাড়ি, নৌযান, উড়োজাহাজ ও বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সময় পতাকা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উত্তোলিত থাকবে এবং সূর্যাস্তের পর কোনো মতেই পতাকা উড্ডীয়ন অবস্থায় থাকবে না।

জাতীয় পতাকা শুধু একটি কাপড় নয়, এটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। তাই পতাকার অবস্থা ব্যবহারযোগ্য না হলে তা মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাধিস্থ করতে হবে। আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা বা জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে ওই ব্যক্তিকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

২০১০ সালের জুলাই মাসে এই আইন সংশোধিত হয়। এই সংশোধনীতে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত শাস্তি এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়। না জেনে, না বুঝে আর অতি উচ্ছ্বাসে যারা পতাকা ব্যবহারবিধি লঙ্ঘন করেন, তাদের অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে এই শাস্তির বিধান যথাযথ হতে পারে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাণিজ্যিক কোনো প্রচারণায়, বিজ্ঞাপনে জাতীয় পতাকার ব্যবহার বিধিবহির্ভূতভাবে করে থাকে, তার জন্য ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

## “জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সংগীত এর বিধানমালা

‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ এমন কোন বাংলাদেশি নেই যে এই গানটা জানে না। এর প্রতিটা শব্দ যেন সত্যই বাঙ্গালি হৃদয়ের গভীর থেকে ভেসে উঠেছে। আমরা প্রায়শই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কিংবা

দৈনন্দিন কাজে জাতীয় সংগীত ব্যবহার করি। আসুন জেনে নেই কোথায় কোথায় জাতীয় সংগীতের কতটুকু অংশ ব্যবহৃত হয়।

জেনে রাখা ভাল যে, ২৫ লাইন গানের ১০ লাইনকে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সব অনুষ্ঠানে পুরো সংগীত বাজানোর নিয়ম নেই।

জাতীয় সংগীত বিধিমালা, ১৯৭৮ অনুযায়ীঃ কখন কখন পুরো জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে ?

বিভিন্ন জাতীয় দিবস, যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সংগীত বাজাতে হবে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংসদ ভবনে প্রবেশ করার শুরুতে এবং ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে।

সব স্কুলের দিনের কার্যক্রম জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হবে। অনেক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়, জাতীয় সংগীতের চার লাইন গাওয়া হয়, কিন্তু বিষয়টি ভুল। বিধিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, যদি কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়, তবে তা সবটুকুই গাইতে হবে।

কখন কখন শুধু দুই লাইন জাতীয় সংগীত বাজাতে হবে ?

উল্লেখ্য, এই দুই লাইন হলঃ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস, যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানে দুই লাইন শুরুতে বাজানোর নিয়ম রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ যখন জাতির উদ্দেশে সম্প্রচার করা হয়, তখন সম্প্রচারের শুরু ও শেষে দুই লাইন বাজাতে হবে।

রাষ্ট্রপতি যখন কোনো প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন, তখনো দুই লাইন বাজাতে হয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হন বা কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অথবা প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, তাহলে এসব ক্ষেত্রে তাঁদের আগমন ও প্রস্থানের সময় দুই লাইন সংগীত বাজানোর নিয়ম রয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মানে যদি কোনো ভোজের আয়োজন করা হয় এবং তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, তবে ভোজ গ্রহণের আগে দুই লাইন বাজাতে হবে।

বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান তাঁর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সফরে বাংলাদেশে এলে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করার সময় আগে

জাতীয়  সংগীতের প্রথম দুই লাইন বাজাতে হবে। এ ছাড়া কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, রাজপরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার বা সমমর্যাদার কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যখন রাষ্ট্রপতির সালাম গ্রহণ করেন, তখন দুই লাইন বাজাবে।

বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তবে ওই অতিথির আগমন ও প্রস্থানের সময়  প্রথমে কিংবা বাংলাদেশে নিযুক্ত ওই রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে সেই দেশের জাতীয়  সংগীত বাজানোর পর বাংলাদেশের জাতীয়  সংগীতের দুই লাইন ড্রামের তালে বাজাতে হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কোনো রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর পরিচয়পত্র হস্তান্তরের সময়  গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন, তখনো দুই লাইন বাজাতে হয়।

রাষ্ট্রীয় কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শব দাহ বা দাফন করার পরও দুই লাইন ড্রামের তালে বাজানোর কথা বলা হয়েছে।

সিনেমা প্রদর্শনের আগে ও রেডিও, টেলিভিশনের দিনের অনুষ্ঠানের শেষেও দুই লাইন বাজানোর কথা বলা হয়েছে।

নৌবাহিনীর কোনো জাহাজে রাষ্ট্রপতি ছাড়া অন্য কারও জন্য জাতীয় সংগীত বাজানো যাবে না"।

### "জাতীয় সংগীত চলাকালীন কী করা উচিত?

জাতীয়  সংগীত শুদ্ধ করে গাইতে হবে এবং গাওয়ার সময়  এর প্রতি যথাযথ সম্মানও দেখাতে হবে। যখন জাতীয়  সংগীত বাজানো হয়  ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শন হয়, তখন উপস্থিত সবাইকে জাতীয়  পতাকার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে এবং যখন পতাকা প্রদর্শন শেষ না করা হয়, তখন সবাইকে বাদকদলের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে এবং কারও মাথায়  টুপি থাকলে খুলে ফেলতে হবে।

যখন কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আগমনে বা কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়  জাতীয়  সংগীত বাজানো হয়, তখন প্যারেড কমান্ডিং অফিসারের অর্ডারের অধীনে ব্যতীত অন্য সব অফিসার ও নন-কমিশন অফিসারকে জাতীয়  সংগীতের প্রথম নোট থেকে শেষ নোট বাজানো পর্যন্ত স্যালুট করে দাঁড়িয়ে  থাকতে হবে"।

## রিংটোন-ওয়েলকাম টিউনে জাতীয় সংগীত আপিলেও নিষিদ্ধ

কালের কণ্ঠ অনলাইন

৫ নভেম্বর, ২০১৫ ১৩:৩১

"মোবাইল ফোনের রিংটোন ও ওয়েলকাম টিউন হিসেবে জাতীয় সংগীতের ব্যবহারকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার মোবাইল অপারেটর রবির করা আপিলের আবেদন খারিজ করে দিয়ে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে তিন বিচারকের আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন। এর আগে গত ১১ মে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকের করা আপিলের আবেদনও খারিজ করে দিয়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছিলেন। পরে রবিও আপিল আবেদন করে। এ রায়ের ফলে মোবাইল ফোনের রিংটোন ও ওয়েলকাম টিউন হিসেবে জাতীয় সংগীতের ব্যবহার নিষিদ্ধই থাকল।

এ ছাড়া জাতীয় সংগীতকে মোবাইলের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করায় রবি অজিয়াটা লিমিটেডকে ৩০ লাখ টাকা মহাখালীর ক্যান্সার হাসপাতালকে দেওয়ারও নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। কালিপদ মৃধা নামের এক ব্যক্তি ২০০৬ সালে হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিট করেন। রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১০ সালের ৫ আগস্ট বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের হাইকোর্ট বেঞ্চ মোবাইলে রিংটোন ও ওয়েলকাম টিউন হিসেবে জাতীয় সংগীতের ব্যবহার অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করে রায় দেন।

একই সঙ্গে একটেল (রবি), গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকের আইনজীবী উপস্থিত থাকার কথা বলেও আদালতে না যাওয়ায় প্রত্যেক কোম্পানিকে ৫০ লাখ টাকা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিতে বলা হয়েছিল। হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে গ্রামীণফোন ও বাংলালিংক কর্তৃপক্ষ। ১১ মে তাদের আপিল খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। পাশাপাশি জরিমানা ৫০ লাখ টাকা থেকে ২০ লাখ টাকা কমিয়ে ৩০ লাখ টাকা করা হয়"।

## মনে রাখবেন

এ আইনের সতর্ক অনুসারী, বাস্তবায়নকারী ও বুকে ধারণকারী সচেতন প্রজন্মের প্রবাহ থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ খুঁজে বের করতে হবে তার শত্রু ও মিত্রকে। দারুল উলূম দেওবন্দ কাকে বুকে টেনে নেবে, আর কাকে দূরে ঠেলে দেবে সে সিদ্ধান্তও নিতে হবে।

# ঢাকা-ওলামাবাজার-হাটহাজারী

সালমান ফারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সে বিখ্যাত উক্তিটি আমরা আজ ভুলে গেছি। إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحداً. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সারা জীবন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ডভিত্তিক হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন, মানব মন থেকে এ বিষাক্ত জীবাণুকে পিষে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছেন সে কথা সবাইতো ভুলে গেছেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের ওয়ারিসরাও ভয়ঙ্করভাবে তা ভুলে গেছে। আর সে ভুলে যাওয়ার কুফল ঢোকে ঢোকে গিলতে হচ্ছ প্রজন্মকে। সে রকম একটি দৃশ্য নিয়ে এবারের আয়োজন।

**বড়**

প্রজন্মের এক হতভাগা সদস্য মফস্বলে পড়াশোনা শেষ করার পর ভুলক্রমে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে পাড়ি দিয়েছে। সে এ ভুল না করলে লেখার এ বিষয়বস্তুটি আমাদের হাতে ধরা দিত না। তার এ ভুলের উপর 'বড়'র পক্ষ থেকে তাকে নিম্নোক পদ্ধতিতে শায়েস্তা করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে শায়েস্তাকরণ ফিজিক্যাল ছিল না। সায়ক্লোজিক্যাল পদ্ধতির উপরই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

'আমরা যারা ... ... মাদরাসায় পড়েছি তারা সেখানে পড়া শেষ করার পর আমরা গিয়েছি ওলামাবাজার মাদরাসায়, আর আমাদের কিছু সাথী চলে গেছে ঢাকায়। যারা ঢাকায় গেছে তারা সবাই বদলা/মজুর হয়েছে। আর আমরা যারা ওলামাবাজার মাদরাসায় গিয়েছি তারা আলহামদু লিল্লাহ দেখতেই পাচ্ছ, আল্লাহ আমাদের সবার দ্বারা বড় বড় খেদমত নিচ্ছেন। আমাকে দেখ, আর দেখ অমুক অমুক অমুক। একবার আমি একটা কাজের জন্য বদলা/মেনতি নিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি আমার সে ঢাকায় পড়ুয়া সাথী বদলা দেয়ার জন্য এসেছে। আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। তাদের সামনে যেতে লজ্জাবোধ হওয়ায় আমি লুকিয়ে চলে এসেছি। তাদের মুখোমুখী হইনি'।

**ছোট**

প্রজন্ম বড় দ্বিধায় পড়ে গেল। ভবিষ্যতের বিষয়ে বড় সংশয়ে পড়ে গেছে। অতীতের ব্যাপারে সন্দেহ জেগে উঠেছে। হাফেজ্জী হুজুর রহ., সদর সাহেব হুজুর রহ., পীরজী হুজুর রহ., শায়খুল হাদীস রহ., মুহাদ্দিস হেদায়াতুল্লাহ সাহেব রহ., শায়খ সালাহুদ্দীন রহ. সহ অসংখ্য শিক্ষাবিদ আল্লাহর ওলিদের শাগরেদগণের কিসমতে কি আখের এ পৃথিবীতে বদলা দেয়াই জুটেছে? না কি বদলা হওয়ার প্রশিক্ষণ আরো পরে শুরু হয়েছে। প্রজন্মের জানতে ইচ্ছা করে, কার বদদোয়ায় এবং কোন হতভাগাদের মাধ্যমে ঢাকার এ অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে? আরো জানতে ইচ্ছা করে, এ বদদোয়ার মেয়াদ কবে শেষ হবে? আর কত বছর এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

[

## ছোটদের মূল্যায়ন

**ক.** মুসলমানের ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যখন থেকে তারা সাম্প্রদায়িক ও ভূখণ্ডভিত্তিক পরিচয়ে গর্ববোধ করতে শুরু করেছে তখন থেকে এ মানসিকতাগুলো নিরক্ষর মানুষদের সমাজ থেকে রাসূলের ওয়ারিসদের অঙ্গনে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

**খ.** যখন থেকে মুসলমান তাদের সত্যের মাপকাঠি কুরআন-হাদীস-জামাতে সাহাবা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইস্তিম্বাতকৃত মাসআলাকে ত্যাগ করে যামানার আহবার ও রুহবানের পথ ধরে সফলতার ঠিকানা খোঁজা শুরু করেছে তখন থেকে বদদ্বীন ও বেদ্বীনের আঙ্গিনা অতিক্রম করে হঠকারিতা দ্বীন ও শরীয়তের রাহবার হওয়ার দাবিদারদেরকেও গ্রাস করা শুরু করেছে।

**গ.** মুসলমানের জীবনের সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ইলমকে হাকেম ও সিদ্ধান্তদানকারী না বানিয়ে যে দিন থেকে প্রথাগত রীতি-নীতিকে হাকেম ও সিদ্ধান্তদাতা বানানো হয়েছে, সে দিন থেকে গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সূচনা হয়েছে এবং গণ্ডিবদ্ধ জীবন যাপনের সকল উপায় উপকরণ জোগাড় করার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ এবং بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ -এ জাতীয় জবাবগুলো মুখস্থ ও ঠোটস্থ করা হয়েছে এবং মুখস্থ করানোর সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

**ঘ.** ইলমী সমস্যার সমাধান যখন থেকে ধমক ও বড়ত্বের প্রভাব দিয়ে দেয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে এসব অসংলগ্ন কথার ব্যাপকতা শুরু হয়েছে। একটি দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে হাজার দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়ছে অপরিনামদর্শী হাবাগোবা মানুষগুলো। 'হাবাগোবা' শব্দ ব্যবহার করেছি এ কাফেলাটিকে প্রজন্মের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। কারণ হাবাগোবা না

হওয়ার বিপরীতে যা রয়েছে তা অনেক ভয়ঙ্কর। প্রজন্ম কখনো সে অপরাধ ক্ষমা করবে না।

**ঙ.** আর যখন থেকে ধমক ও বড়ত্বের প্রভাব দিয়ে ইলমী সমস্যার সমাধান দেয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকে রাসূলের ওয়ারিস হওয়ার দাবিদাররা ইলমের পেছনে সময় ব্যয় না করে বড় হওয়ার পেছনে সময় ব্যয় করতে শুরু করেছে। টাইট সদরিয়া ও শেরওয়ানী দিয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তারের নিস্ফল পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ইলমের পথে না হেঁটে এসব উদ্ভট পথে পা বাড়িয়েছে।

**চ.** সম্প্রদায়বিশেষ ও ভূখণ্ডবিশেষের প্রীতি এতদূর গড়িয়েছে যে, এক অঞ্চলের ইলমের মাঝে ইলমের নূর অনুভব হচ্ছে, আরেক অঞ্চলের ইলমের মাঝে নূর পাওয়া যাচ্ছে না। ইলম থাকুক বা না থাকুক ইলমের নূর অনুভব করার মত যোগ্যতা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অর্জিত হয়ে গেছে। এ যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকোচ ও দ্বিধা হওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

পাঠক সমীপে আমার আকুল আবেদন, আকীদা, বিশ্বাস, ইলম, আমল সর্বক্ষেত্রে আমাদের কারো দুর্বলতার কি কোন অভাব আছে? আমাদের প্রধান দায়িত্ব কি এই যে, আমরা দক্ষিণ ওয়ালারা উত্তরের দুর্বলতার তালিকা তৈরি করব, আর উত্তর ওয়ালারা দক্ষিণের দুর্বলতার তালিকা তৈরি করব? এরপর প্রজন্মকে উত্তরের উপর দক্ষিণের ফযীলত এবং দক্ষিণের উপর উত্তরের ফযীলত বোঝাব। আর প্রজন্ম চোখ বুলালে দেখবে, উত্তর দক্ষিণ সবার সমস্যা হচ্ছে ইলমের মাপকাঠিকে অস্বীকার করা।

### দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দতো তার মানহাজকে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী। সারা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সবইতো দারুল উলূমের আওতাভুক্ত। দারুল উলূম দেওবন্দ কিভাবে সিদ্ধান্ত দেবে যে, বাংলাদেশের মত একটি হাঁসের ডিমের হলুদ কুসুমের দক্ষিণের ফযীলত কুসুমের উত্তরের চাইতে বেশি? কোন দলিলের আলোকে দারুল উলূম দেওবন্দ সিদ্ধান্ত দেবে যে, কুসুমের উত্তরটা খেলে আজীবন হাসপাতালে দৌড়াতে হবে, আর দক্ষিণটা খেলে আজীবন ডাক্তারী করে কাটানো যাবে? বিষয়গুলো যখন এতটাই ঘোলাটে তখন দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র নির্ণয় করা সত্যি বড় দূরহ ব্যাপার।

এসব উদ্ভট কথা যদি আজ ছোটর মুখ থেকে বের হত তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দ বাম হাতে থাপ্পড় দিয়ে শায়েস্তা করে দিত। কিন্তু উদ্ভট হোক আর যাই হোক কথা বের হয়েছে 'বড়'র মুখ থেকে, তাই এর জন্য কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিঃশব্দে পরবর্তী তুফান সহ্য করে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। যেভাবে সহ্য করেছিল প্রজন্মের ঢাকামুখী সে হতভাগা।

ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে শত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে শত্রুতার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে ভূখণ্ড ও সম্প্রদায়কে। সে ভূখণ্ড ও সম্প্রদায়কে আরো ভাগ করতে করতে ঘর ঘর ও ব্যক্তি ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

মফস্বলের পড়াশোনা শেষ করে উত্তরমুখী হলে এক পক্ষ দোয়া করবে আরেক পক্ষ বদদোয়া করবে। দক্ষিণমুখী হলে এক পক্ষ দোয়া করবে আরেক পক্ষ বদদোয়া করবে। মাঝামাঝি কোথাও থেমে গেলে এক পক্ষ দোয়া করবে আরেক পক্ষ বদদোয়া করবে। আপন জায়গা থেকে একদম নড়াচড়া না করলে সবাই দোয়া করবে। পঞ্চম কোথাও গেলে সবাই মিলে বদদোয়া করবে। কিন্তু সবার দাবি সবাই দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তরসূরি। এমতাবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ এসব লোকদের নিয়ে কী করবে!

মিশকাত পর্যন্ত মাদরাসার তালিবুল ইলম সে মাদরাসায় জালালাইন জামাত শেষ করে মিশকাত না পড়ে দারুল উলূম দেওবন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদদোয়ার ভয়ে উত্তর-দক্ষিণে যায়নি। সরাসরি দারুল উলূম দেওবন্দ চলে গেছে। কিন্তু দেওবন্দ যাওয়ার পরও সকল উস্তায তাকে বদদোয়া করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশোনা শেষ করে তিন বছর পর ফিরে আসলে সাবেক মাদরাসার সাবেক উস্তাযবৃন্দ সে তালিবুল ইলমের সঙ্গে মুসাফাহা করেননি।

এখন দারুল উলূম দেওবন্দ কি করবে? দারুল উলূমতো নিজেই এখানে কাঠগড়ার আসামী।

এসব আসলে কী হচ্ছে?! এসব কী চলছে?! আমাদের গন্তব্য আসলে কোন দিকে?!

*******************

# রাজার দরবার-রাজার কারাগার

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার ছিল আকাশ ছোঁয়া এক প্রাসাদ, আর ছিল পাতাল ছোঁয়া এক মরণপুরী কারাগার। যারা রাজার ধর্ম গ্রহণ করত তারা স্থান পেত রাজার আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের বিশেষ কোন হল রুমে। আর যারা রাজার ধর্ম গ্রহণ করত না তাদের ঠিকানা ছিল পাতাল ছোঁয়া মরণপুরীর অন্ধকার কোন এক গহ্বরে। সে দেশের রাজার ধর্ম কী ছিল তা আমাদের জানা নেই। সে বিষয়ে কোন খবর পাওয়া যায়নি। ভূপৃষ্ঠের যে ভূখণ্ডটি আমাদের ভাগে পড়েছে তার কিছু দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটাই আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়।

### বড়

দেশের মালিক পক্ষের নিজস্ব ভবন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সর্বাধিক মূল্যবান হলরুম। সে ভবনের সে হলরুমে সসম্মানে আমন্ত্রিত। রাজ্য সভার সর্বোচ্চ দামি ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সমাদরে সমাদৃত। দেশের প্রধান নিজের চেয়ার ছেড়ে এসে সমাদরের সর্বশেষটুকু বিলিয়ে দিয়ে চলেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তৃতার মাইক থেকে প্রশংসার সুরলহরী বয়ে চলেছে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের সঠিক বাহক হওয়ার স্বীকৃতি বার বার ঘোষিত হচ্ছে। পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টির ছাপ প্রতিটি চেহারায় উদ্ভাসিত।

আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রিত উভয়ে উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার দৃশ্যগুলো বার বার ক্যামরার ফোকাসে ধরা পড়ছে। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য উদগ্রীব। কায়োমনোবাক্যে সবাই সবার জন্য দোয়া করে চলেছে। বড়রা আরো বড়দের নেতৃত্বে আজ মেজবানে মেহমানে একাকার। অন্তরঙ্গ অবস্থানে বিভোর।

আজ কাল পরশু প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে দরবারে আনাগোনা চলছে। দরবারের বার্তা দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে যাচ্ছে, আনাচ কানাচের নিবেদনগুলো দরবারে পৌঁছে যাচ্ছে। আস্থা, বিশ্বাস, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, সৌজন্য, সহযোগিতা, ওফাদারী, ধর্মপ্রীতি, ধর্মচর্চা, ইলমে দ্বীনপ্রীতি, ইলমে দ্বীনচর্চা, অশ্বাস, আশা ও প্রত্যাশার জোয়ার চলছে। বড়দের বাসায় বাসায় সিনিয়র সংবাদ মাধ্যমগুলোর সিনিয়র সাংবাদিকদের বাড়তি আনাগোনা চলছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শান্তির কপোত

কপোতীদের সঙ্গে ঘনঘন শান্তির আদান প্রদান চলছে। ভিডিও, অডিও, প্রিন্ট মিডিয়ার সর্বত্র যৌথ মহড়ার হইহুল্লুড় পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

### ছোট

একই মালিক পক্ষের কারাগার ভর্তি হয়ে চলেছে একই পোষাকের কিছু ছোট মানুষ দ্বারা। হাতকড়া পরে আছে কিছু অগুরুত্বপূর্ণ মানুষ। পুলিশের বুটের আঘাতের সাথে সাথে বাড়তি গালাগালি শুনে চলেছে কিছু পেছনের সারির ওয়ারিসে নবী। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর বিভীষিকার ঢোক গিলে চলেছে ছোটদের একটি ছোট্ট কাফেলা। ১. যাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা জুমার বয়ানে এমন কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছে যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা রাষ্ট্রীয় নীতির খেলাফ। ২. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা পাঠ্যসূচির এমন কিছু অধ্যায় পড়াচ্ছে যে অধ্যায়গুলো যুগ যুগ ধরে পড়া বন্ধ রাখা হয়েছে। ৩. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ইমাম মুহাম্মদ রাহিমুহুল্লাহর 'আসসিয়ারুল কাবীর' পড়ছে এবং পড়াচ্ছে। ৪. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদের কাহিনীগুলো নিজে পড়ছে এবং অন্যকে পড়াচ্ছে। ৫. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিশ্বের অত্যাচারিত মুসলমানদের ভিডিও চিত্র দেখছে বা দেখাচ্ছে। ৬. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিশ্বের অত্যাচারিত মুসলমানদের উপর পরিচালিত জুলুম অত্যাচারের প্রতিবেদন পড়ছে বা পড়াচ্ছে। ৭. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কুরআনে কারীমের সূরা আনফাল বা সূরা তাওবার দরস দিচ্ছে বা নিজে পড়ছে। ৮. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ কী হওয়া চাই সে বিষয়ে তারা কিতাবাদি থেকে মাসআলা তালাশ করছে এবং সেগুলোকে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করছে। ৯. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তাদের আলোচনায় কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃস্টান-পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ১০. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা সুদের ব্যবস্থা ও সুদের ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ১১. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ঈমানের সাতাত্তর শাখার প্রত্যেকটির বিষয়ে মুসলমানদেরকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছে। ১২. তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তালাশ করে বের করার চেষ্টা করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এবং ওহির রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ঈমানের সাতাত্তর শাখার কোনটি কোনটি কোন কোন শতাব্দীতে রহিত হয়ে গেছে, কোনটি কোনটি এখনো বহাল আছে, আর কোনটি কোনটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রহিত হয়ে যাবে? না কি সকল শাখা এখনো বহাল আছে? ১৩. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তালাশ করে চলেছে বিশ্বের কোন কোন ভূখণ্ডকে

শরীয়তের পরিভাষায় দারুল ইসলাম বলা যায়, আর কোন কোন ভূখণ্ডকে দারুল হারব বলা যায়? কারণ তাদের প্রতিদিনের শত শত মাসআলা এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। ১৪. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে ফরয মনে করে। ১৫. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বুশ, ব্লেয়ার, ট্রাম্প ও তাদের বন্ধু ও সহযোগীদেরকে ইসলামের শত্রু মনে করে। ১৬. তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কিতাবাদি মন্থন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের দুশমন কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার শরয়ী বিধান কী। ১৭. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা প্রজন্মকে কিতাবাদি থেকে এসব মাসআলা তাহকীক করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, অনুরোধ করছে, আবদার করছে। ১৮. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করছে তারা যেন তাদের শায়খ, তাদের উস্তায, তাদের নেতার কাছ থেকে দলিলের আলোকে বিষয়গুলো বিস্তারিত বুঝে নেয়। ১৯. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা জিহাদের অর্থ করে, কাফেরদের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা। ২০. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কাফেরদের নেতৃত্বাধীন জোটগুলোকে মুসলমানদের শত্রু মনে করে। ২১. কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন, তার প্রয়োগ ও তার প্রহরা দেয়াকে কুফর বলে। ২২. তাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাউলাকে কুফর মনে করে। রাষ্ট্রকে শরয়ী আইনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত মনে করাকে কুফর মনে করে।

এ ধরনের বহু অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে।

## দারুল উলূম দেওবন্দ

এ হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজের এক মহাপরীক্ষার কাল। দারুল উলূম দেওবন্দকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিষয়টির বিশ্লেষণ করতে হবে। বড় ও ছোটর মাঝে কোথায় কোথায় অমিল থাকার কারণে মালিক পক্ষের আচরণ দুই পক্ষের সঙ্গে এতটা ব্যবধানপূর্ণ। এত আকাশ পাতাল তফাত। অমিলগুলোকে যদি যথাযথভাবে উদ্ধার করা না যায় তাহলে শত্রু-মিত্র চিনতে এমন এক ভুল হবে যে ভুলের কোন কাফফারা নেই। যে ভুলের কোন কাযা সম্ভব নয়।

খুঁজে বের করতে হবে, ছোটদের কোন কোন বিষয়ের ব্যাপারে বড়রা ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং সেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে দলিলভিত্তিক ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করার পরই উপলব্ধি করা যাবে, একই দরবারে 'বড়' কেন সমাদৃত, আর 'ছোট' কেন ধিকৃত। 'বড়' কেন মালিক পক্ষের বন্ধু, আর 'ছোট' কেন

মালিক পক্ষের শত্রু। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য কয়েকটি বিষয় এখানে বিশ্লেষণ করা জরুরী। বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. বড় ও ছোটদের পরস্পরে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো কী কী?

২. ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো রয়েছে তার কোনটি কোনটির সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং কেন?

৩. যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বড়দের কোন দ্বিমত নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ছোটদের বাড়তি অপরাধগুলো কী কী?

৪. ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্লেষণ।

## প্রথম বিষয়ঃ বড় ও ছোটদের পরস্পরে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো কী কী?

আল্লাহুম্মা ওয়াফ্‌ফিকনা লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা মিনাল কাওলি ওয়ালআমালি ওয়াননিয়্যাহ। প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে সংক্ষেপে বলা যায়, বড় ও ছোট তথা সমাদৃত ও ধিকৃতের মাঝে ঐক্যের যে সূত্রগুলো আমরা পাই তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। মৌলিক সূত্রগুলো থেকে বিশেষভাবে যেগুলোকে উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে রয়েছে:

১. দু'টি কাফেলাই দেওবন্দী এবং নিজেদেরকে দেওবন্দী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ২. দু'টি কাফেলাই ফিকহে হানাফীর অনুসারী এবং গায়রে মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করাকে জরুরী মনে করে। ৩. দু'টি কাফেলাই হানাফী মাযহাবের ফিকহের উসূল অনুযায়ী কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসে শরয়ীকে শরীয়তের দলিল হিসাবে গ্রহণ করে। ৪. দুটি কাফেলাই স্বপ্ন, কাশফ, মোরাকাবা, ইলহাম ইত্যাদির অস্তিত্বকে স্বীকার করে, কিন্তু শরীয়তের ছোট থেকে ছোট মাসআলার ক্ষেত্রেও এগুলোকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে না। ৫. দু'টি কাফেলাই বান্দার এমন কোন অবস্থানকে স্বীকার করে না যে অবস্থায় পৌঁছালে সে শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে বাধ্য থাকে না। ৬. দু'টি কাফেলাই আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কাউকে মাসূম বা ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করে না। ৬. দু'টি কাফেলাই অগ্রজের উপর অনুজের দলিলভিত্তিক প্রশ্ন ও ইস্তিফতা করাকে বৈধ মনে করে। ৭. দু'টি কাফেলাই ইলম অর্জন করাকে ফরয ইবাদত মনে করে। ৮. দু'টি কাফেলাই মনে করে যে, ওহীর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের কোন হুকুম রহিত হওয়া সম্ভব নয় এবং নতুন কোন হুকুম নাযিল হওয়া সম্ভব নয়। ৯. দু'টি কাফেলাই উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকহ তথা উসূলে ইস্তিম্বাতের নীতিগুলোর সঙ্গে একমত রয়েছে। ১০. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, চার দলিলের এক দলিল যে ইজমা -এর দ্বারা বিশেষ কোন ভূখণ্ড বা

বিশেষ কোন গোষ্ঠীর ইজমা উদ্দেশ্য নয়, এমনিভাবে ফিতনার যামানায় ফিতনায় পতিত উম্মতের ইজমাও উদ্দেশ্য নয়। ১১. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, স্রষ্টার অবাধ্যতা করে মাখলুকের অনুসরণ করার কোন বৈধতা নেই। ১২. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, আল্লাহর বিধানাবলি মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোন অজুহাতে সত্যকে গোপন করার কোন বৈধতা নেই। বিধান পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কখনো বৈধ কৌশলের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা কিতমানে ইলম ও খিয়ানতে ইলমের অন্তর্ভুক্ত। ১৩. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, মুফতীর ফাতওয়ার দ্বারা কোন ব্যক্তি কাফের হয় না; বরং ব্যক্তি কাফের হয় তার কথা কাজ ও বিশ্বাস দ্বারা। মুফতীর ফাতওয়া দ্বারা অন্যরা তা জানতে পারে মাত্র। যেমনিভাবে মুফতির ফাতওয়া দ্বারা স্ত্রীর উপর স্বামীর তালাক পতিত হয় না, তালাক পতিত হয় স্বামীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং মুফতীর ফাতওয়া দ্বারা তাদের সংসার ভাঙ্গে না, সংসার ভাঙ্গে তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। ১৪. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, যে ব্যক্তি কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে, আর তাকে পাক্কা মুসলমান হিসাবে এক কোটি মানুষ তার জানাযার নামায পড়ে বিদায় দিলেও সে জাহান্নামে যাবে। এমনিভাবে কেউ কাফের বা মুরতাদ না হলে এক লক্ষ মুফতী মিলে তাকে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে ফাতওয়া দিলেও সে জান্নাতে যাবে, আর কেউ তার জানাযার নামায না পড়লেও সে জান্নাতে যাবে। ১৫. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, কোন মুসলমানকে কাফের বলা যেমন ভয়াবহ বিষয়, তেমনি কোন কাফেরকেও মুসলমান বলা অনেক ভয়াবহ বিষয়। কারণ একজন মুসলমানের সঙ্গে দৈনন্দিন লেন-দেন ও আচার-আচরণের বিধান এবং একজন কাফেরের সঙ্গে দৈনন্দিন লেন-দেন ও আচার-আচরণের বিধান এক নয়। ১৬. দু'টি কাফেলাই এ কথা জানে যে, মুসলমানের সন্তান মাত্রই এ কথা জানা জরুরী যে সে একটি দারুল ইসলামে বাস করছে না কি দারুল হারবে বাস করছে। কারণ দু'টির বিধানে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

এ ধরনের আরো অসংখ্য ঐক্যের সূত্র দু'টি কাফেলার পরস্পরে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো ঐক্যের সূত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন একটি কাফেলা রাজার দরবারে এত সমাদৃত, আরেকটি কাফেলা সে একই রাজার কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে, ফিকহ ও ইজতিহাদের আলোকে সে ব্যবধানগুলো কী? একই রাজা একই বিশ্বাসে গাঁথা দু'টি কাফেলার একটিকে শত্রু বানিয়ে আরেকটিকে বন্ধু বানানোর হেতু কী? রহস্য কী?

**দ্বিতীয় বিষয়: ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো রয়েছে তার কোনটি কোনটির সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং কেন?**

ছোটদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো রয়েছে সেগুলোর কোন কোনটির সঙ্গে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং তা কেন? বিষয়টি পরিষ্কার হলে যেমনিভাবে ছোটরা উপকৃত হত, তেমনিভাবে পুরা মুসলিম জাতিও উপকৃত হতে পারত। ছোটদের বিরুদ্ধে বাইশটির মত অভিযোগ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো বহু অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। এখন দ্বিতীয় বিষয়ের প্রসঙ্গে এ কথা সামনে আসা দরকার যে, এ বিষয়গুলোর কোন কোনটিতে বড়দের দ্বিমত রয়েছে এবং তা কেন? তেমনিভাবে উল্লিখিত অভিযোগগুলো ব্যতীত আর কী কী অভিযোগ আছে সেগুলোও সামনে আসা দরকার। যাতে বিষয়টির বিশ্লেষণে কোন প্রকার অস্পষ্টতা না থাকে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ প্রশ্নগুলোই আমরা কার কাছে করব? দেশের বরং বিশ্বের প্রতিটি পুছতাছ-তথ্যকেন্দ্র এবং জানতে চাওয়ার উইনডোগুলোকে এমন শক্ত লোহার গরাদ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যেখানে এসব প্রশ্নের অনুপ্রবেশের সামান্য ছিদ্র পর্যন্ত বাকি রাখা হয়নি।

**অপাঙ্ক্তেয় মুস্তাফতী**

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন কৌতূহলি সাধারণ মুসলমান এ মর্মে একটি প্রশ্ন তৈরি করে যে, মায়ানমারে মুসলমানদের উপর কাফেররা হামলা করে তাদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে চলেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুসলমানদের করণীয় কী? আমার ধারণা এ ব্যক্তি সারা বাংলাদেশ ঘুরলেও কোন দারুল ইফতা থেকে এ ইস্তিফতার উদ্ধৃতিভিত্তিক আমলযোগ্য বাস্তবমুখী কোন উত্তর পাবে না।

বরং আত্মবিশ্বাসী ও নামি দামি দারুল ইফতাগুলো থেকে অতিরিক্ত এ উত্তর পাবে বা পেয়েছেও যে, আদা বেপারী জাহাজের খবর নেয়ার দরকার নেই। অথবা নিজের পুরা শরীরে ইসলাম কায়েম হয়েছি কি না সেটা খবর নেন, মায়ানমারের মুসলমানদের খবর নেয়া লাগবে না। অথবা নিজের পরিবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা কি শেষ হয়েছে? মায়ানমারের খবর নিতে এসেছেন! মায়ানমার সমস্যা ছাড়া আর সব সমস্যার কি সমাধান হয়ে গেছে? সব সমস্যার সমাধান কি করে ফেলেছেন? যান আগে নিজের চিন্তা করেন পরে আরেক দেশের খবর নিবেন?

অথবা, আমরা সিদ্দীকীনের জামাত, সিদ্দীকীনের জীবনই আমাদেরকে যাপন করতে হবে। তবে শাহাদাতেরও তামান্না রাখা চাই, যাতে বিছানায়

শুয়ে শুয়ে মারা গেলেও শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সিদ্দীকীনের জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত খানকাহী জীবন।

অথবা, দারুল ইফতার দায়িত্বশীল যদি খুব বেশি সতর্ক হন তাহলে বলবেন, ইস্তিফতাটা রেখে যান পরে যোগাযোগ করবেন। আর পরের তারিখটি এত পরের দিয়ে দেবেন যে, তত দিনে মুস্তাফতী ইস্তিফতার কথা ভুলে যাবেন, অথবা মুস্তাফতী বুঝে নেবেন যে, এর উত্তরের কোন আশা নেই। অথবা ফোন করে জানতে চাইলে বলবেন, এখনো দেখা হয়নি। আপনি আরো কিছু দিন পর ফোন করেন। এর পরবর্তীতে এ ধারাবাহিকতাই চলতে থাকবে।

এ ধরনের হাজার রকমের উত্তর পাওয়া যাবে, কিন্তু মাসআলার সামধান পাওয়া যাবে না।

## দারুল হারব কেন অজ্ঞতার যোগ্য ওযর?

এ পর্যায়ে এসে একটা মাসআলা আমার বুঝে আসে। মাসআলাটি হচ্ছে, জাহালাত ওযর হওয়ার মাসআলাটি। বিভিন্ন মাসআলা প্রসঙ্গেই ফিকহের কিতাবাদিতে জাহালাত অর্থাৎ শরীয়তের কোন একটি মাসআলা কারো জানা না থাকলে তা ওযর হিসাবে ধর্তব্য হবে কি হবে না। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে আপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে জাহালাত বা না জানাকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু দারুল হারবে অবস্থান করার কারণে জাহালাত বা না জানার ওযরকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মাসআলাটির কারণ স্পষ্ট ছিল না। এখন যখন দেখতে পাচ্ছি, একটি মাসআলার জন্য সারা দেশ ঘুরেও তার সমাধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন বোঝা যায়, একটি দারুল হারবে অবস্থান করে শরীয়তের একটি মাসআলা জানা ও জানানো কত কঠিন!

যাইহোক এটি একটি প্রসঙ্গ কথা। আমরা একটি সত্যকে স্বীকার করতে রাজি হইনি। আর সে একটি সত্যকে গোপন করার কারণে আমরা আরো কত সত্যকে যে গোপন করতে হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

## তাহলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু কী?

আমরা যে বিষয়ে বলছিলাম সে প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল দু'টি কাফেলার ধিকৃত অংশটির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার কোন কোনটির সঙ্গে সমাদৃত কাফেলার দ্বিমত রয়েছে? আমরা আশা করছি এগুলোর কোনটির সঙ্গেই সমাদৃত কাফেলার কোন দ্বিমত নেই। আমরা এ আশা করার করণ হচ্ছে, দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই। এ অভিযোগগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ খোলা নেই।

এটা আমাদের বক্তব্য। নচেৎ এমন হওয়া অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয় যে, এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কারো দ্বিমত থাকবে। তবে সমাদৃত কাফেলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য আসার আগ পর্যন্ত আমরা এটাই মনে করব যে, ধিকৃত কাফেলার উপর যতগুলো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি সমাদৃত কাফেলার বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

অথবা কমপক্ষে এতটুকু দাবি করা যেতেই পারে যে, ধিকৃত কাফেলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে এগুলো কখনো কোন অভিযোগ হতে পারে না। কেউ যদি এ বিষয়গুলোকে অভিযোগ হিসাবে উত্থাপন করে তাহলে নিশ্চয় তার ঈমানের সমস্যা আছে।

প্রথম বিষয়ে আমরা দেখতে পেলাম দু'টি কাফেলার পরস্পরে ঐক্যের সূত্র অসংখ্য। আমরা দেখতে পেলাম, ধিকৃত অংশের বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ রয়েছে তার কোনটি থেকেই সমাদৃত কাফেলা মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। মুক্ত হতে পারবে যদি ঈমান ও ইলমের স্বীকৃত কোন অংশকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে। অবস্থা যখন এই, তখন সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসে যে, তাহলে দু'টি কাফেলার তফাত এত ভয়ঙ্কর কেন?

না কি কোন একটি কাফেলা ভয়ঙ্কর রকমের কোন ভুল করে চলেছে। এমন ভুল করে চলেছে যা শুধরে নেয়ার শেষ সুযোগ আজকের দিনের এ মুহূর্তটিই।

## তৃতীয় বিষয়: যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বড়দের কোন দ্বিমত নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ছোটদের বাড়তি অপরাধগুলো কী কী?

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথম বিষয়ে ঐক্যের সূত্র, দ্বিতীয় বিষয়ে অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে উভয় কাফেলা সমান অংশিদার হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে একটি কথা। সে কথাটিই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বিষয়। অর্থাৎ, যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বড়দের কোন দ্বিমত নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ছোটদের বাড়তি অপরাধগুলো কী কী? ধিকৃতদের বাড়তি অপরাধগুলোর বিশ্লেষণ করা হলে হয়ত একটা সুরাহা বের হয়ে আসবে। সেজন্য সে দিকটি নিয়ে আলোকপাত করা যায়।

শুরুতে সম্ভাব্য বাড়তি অপরাধগুলোর একটি সম্ভাব্য তালিকা আসতে পারে। যথা:

**এক.** সকল ধর্মের মান সমান এ কথাটি কুফর, ধর্মনিরপেক্ষতা কুফর -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কুফরে বিশ্বাসীরাও কাফের।

**দুই.** গণতন্ত্র ভিন্ন একটি ধর্ম এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়োগকারীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়।

**তিন.** শরয়ী আইনকে উপেক্ষা করে মনের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা ও বাস্তবায়ন করা কুফর -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কুফরের সঙ্গে জড়িতরা কাফের।

**চার.** কুফরী শক্তির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফর -এ বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, যারা এ কুফরীর শিকার তারা কাফের।

**পাঁচ.** কোন মুসলমান যে কোন একটি কুফরের শিকার হলে সে কাফের হয়ে যাবে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, বর্তমান যামানায় যারা এরকম একটি একটি কুফরে লিপ্ত আছে তারা কাফের।

**ছয়.** দেশের শতকরা নব্বই পঁচানব্বই ভাগ মানুষ কুফরী বিশ্বাস লালন করে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কুফরী বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশ্বাসীরা কাফের ফাতওয়া হওয়া দরকার। সমাদৃত অংশের দাবি হচ্ছে, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে একজনকেও কাফের বলা যাবে না।

**সাত.** আল্লাহর পথে জিহাদ একটি দায়েমী ফরয -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, সে ফরয তরকের কারণে আমরা দায়েমী গুনাহগার।

**আট.** ইলমকে আমলে রূপান্তরিত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, এ কথাটি ইলমের প্রত্যেক অধ্যায় সম্পর্কে এবং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য, সর্বাবস্থায়।

**নয়.** দ্বীনী যেকোন কাজের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা বৈধ -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কাজ ছেড়ে দেয়া কখনো কৌশল হতে পারে না। কাজ ছেড়ে দেয়াকে কৌশল বলা মানে সত্যকে গোপন করা।

**দশ.** জিহাদ একটি ফরয আমল -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, সে জিহাদ হচ্ছে অস্ত্রের জিহাদ।

**এগার.** কুরআনের একটি বিধানকেও অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, উম্মত অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করে চলেছে কিন্তু তাদেরকে কাফের ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে না। তাদের সঙ্গে কাফেরসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না।

**বার.** কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কুফরীর বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কাফেরসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না।

**তের.** আহবার ও রুহবানকে রব বানানোর কারণে ইসলামপূর্ব কালে আহবার রুহবানও কাফের হয়েছিল, যারা তাদেরকে রব বানিয়েছিল তারাও কাফের হয়েছিল -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, একই কারণে এখনো আহবার রুহবান এবং তাদেরকে যারা রব বানিয়ে চলেছে তারাও কাফের হবে।

**চৌদ্দ.** পরিস্থিতির আলোকে মাসআলাকে সাজাতে হবে এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, পরিস্থিতির আলোকে মাসআলাকে সাজাতে গিয়ে কখনো উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদীস ও উসূলুদ দাওয়া ও আহকামুদ দাওয়াকে উপেক্ষা করা যাবে না।

**পনের.** পরিস্থিতির আলোকে ফরয দায়িত্ব আদায়ের পথ খুঁজে বের করতে হবে, কোনভাবেই ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না -এ বিষয়ে উভয় কাফেলা একমত। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অযু না থাকলে নামায মাফ হয় না, পানি না থাকলেও নামায মাফ হয় না। বিমানের মালিক না হলেও হজ্জ মাফ হয় না। সাহরীর ব্যবস্থা না থাকলেও রোযা মাফ হয় না। হাত পা ভাঙ্গা হলেও যাকাত মাফ হয় না। মোটকথা ফরয হওয়ার পর তা মাফ হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই মাফের রাস্তা না খুঁজে আদায়ের পদ্ধতি খুঁজতে হয়। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের ব্যাপারে এ কথাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং পথ খুঁজে বের করে তার উপর আমল করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ঈমানের সাতাত্তর শাখার অসংখ্য শাখার ক্ষেত্রে এ নীতিটি প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

**ষোল.** রাজা-প্রজা নির্বিশেষে উম্মত অসংখ্য কুফরে লিপ্ত আছে এ বিষয়ে উভয় কফেলা একমত। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কুফরের কারণে কাফেরদেরকে কাফের বলতে হবে। এতে করে কুফরের বিষয়ে মুসলমান সতর্ক হয়ে যাবে। কাফেরদের সঙ্গে কাফের হিসাবে আচরণ করতে পারবে।

যদি কুফরের কারণে কাফের না বলা হয় তাহলে কুফর ও ঈমানের ভেদাভেদ থাকবে না। উম্মত কুফর ও ঈমানকে আলাদা করে চিনতে পারবে না। মুমিন ও কাফেরকে আলাদা করতে পারবে না। কুফরকে ঈমানের পরিপন্থী মনে করবে না। কুফর ও ঈমানের সীমারেখা মিটে যাবে এবং মিটে গেছে।

**সতের.** কাফেরকে কাফের বলতে উভয় পক্ষের কোন দ্বিমত নেই। ধিকৃত অংশের বাড়তি দাবি হচ্ছে, কাফেরের সঙ্গে সহাবস্থানের শরয়ী বিধান অনুসরণ করা জরুরী। গনতান্ত্রিক আইন ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন মেনে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানের সহাবস্থান বৈধ নয়।

ধিকৃত অংশের এ ধরনের কিছু বাড়তি দাবি আছে। এটা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই এবং স্বীকার না করে কোন উপায়ও নেই।

এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, এ বাড়তি দাবিগুলোর অপরাধের মাত্রা কতটুকু? একটি গণতান্ত্রিক দেশের আইন ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের আইনের দৃষ্টিতে কতটুকু, আর মুসলমানদের ইসলামী আইন অনুযায়ী কতটুকু?

দারুল উলূম দেওবন্দ তার মানহাজের আলোকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ অপরাধের বিচার কোন আইনের আলোকে করবে? গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আলোকে, না কি শরীয়তের আইনের আলোকে? গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আলোকে যদি করতে হয় তাহলে আমি বলব, এ বিচার দারুল দেওবন্দ ও তার মানহাজ করার দরকার নেই। কারণ দেশে সে আইনের লোক আছে, সে আইনের আদালত আছে, সে আইনের প্রহরী আছে, সে আইনের প্রয়োগকারী বলিষ্ঠ বাহিনী আছে এবং সে আইন অনুযায়ী বিচার ও দণ্ড চলছে।

আর যদি বিচার হয় শরীয়তের আইনের আলোকে তাহলে আমরা এ উভয় কাফেলার কর্মপন্থা, মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনাকে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজের হাতে তুলে দিলাম। বিচারের রায়ের অপেক্ষায় রইলাম। আর সেই বিচারের আগে ও পরে আমরা 'ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্লেষণ' শিরনামে চতুর্থ বিষয়টি তুলে ধরব।

## চতুর্থ বিষয়: ফলাফল ও ফলাফলের তফাত বিশ্লেষণ

দারুল উলূম দেওবন্দের যেমনিভাবে একটি মানহাজ আছে তেমনিভাবে একটি ইতিহাসও আছে। দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা কখনো তা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতাবী রহ. ও কুতুবুল ইরশাদ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে শুরু করেননি। তাঁরা দারুল উলূম দেওবন্দের

ইতিহাস লেখা শুরু করেছেন আরো অনেক অনেক অতীত থেকে। দূর অতীত থেকে। সেই দূর অতীতের দৃশ্যগুলো মনের পর্দায় ভাসিয়ে তুললে বুঝতে সহজ হবে শত্রু কে এবং মিত্র কে? আর শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের মূলনীতিও এর মাধ্যমে পড়া হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন হাতকড়া পরে রাজার কারাগারের অন্ধকার কুঠরীতে প্রতিদিন জল্লাদের বেত্রাঘাত সয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাজার দরবারে কারা সুরাহি হাতে বসা ছিল?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. যখন রাজার কারাগারে প্রতিদিন জল্লাদের হাতে নিজের পিঠের চামড়া জমা দিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাজার শাহী দরবারে কাবাব ও ফালুদার আসরে কারা বসা ছিল?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যখন রাজার মৃত্যুপুরী কারাগারে বন্দি হয়ে ছিলেন, তখন রাজার শাহী দরবারের সব চাইতে ভালো মানুষ ও পরামর্শক কারা ছিল?

আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. যখন রাজার জল্লাদের তাড়নায় বিতাড়িত ছিলেন, তখন রাজার দরবারের মহামান্য ব্যক্তিবর্গ কারা ছিল?

সাইয়েদ আহমদ বেরলভী রহ. ও ইসমাঈল শহীদ রহ. যখন ইসলামকে রক্ষা করার জন্য মাঠে প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, প্রতিদিন শত্রুর মোকাবেলা করে রক্ত ঝরিয়ে চলছিলেন, তখন রাজার দরবারে কারা শোভা পাচ্ছিল?

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ., শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., কাসেম নানুতাবী রহ., হাফেয যামেন শহীদ রহ. সহ অসংখ্য বীর মুজাহিদ আকাবিরে উম্মত যখন অতি সামান্য আসবাব নিয়ে, ছোট্ট একটি কাফেলা নিয়ে মাঠে প্রান্তরে রক্ত ঝরিয়ে চলেছেন, রাজার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন রাজ দরবারের দাড়ি টুপিধারী মহামান্য ব্যক্তিবর্গ কারা ছিল?

শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. ও শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. যখন রাজার আদেশে কালাপানিতে বন্দি জীবন যাপন করছিলেন, তখন সে রাজার দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কারা ছিল? কারা মুসলমান হওয়ার দাবি করেও কুফরী শক্তির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করছিল?

এ হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাসকে এ কথা বলে পার পাওয়ার সুযোগ নেই যে, রাজার কারাগারেতো কাফের ও কুফরী শক্তির দালালরাও সময় কাটিয়েছে। কারণ, কার কারাগারে? কে? কেন? সময় কাটিয়েছে তা আমাদের

সামনে রয়েছে। ইতিহাস সে অংশটিকে ভুলে যায়নি। এড়িয়েও যায়নি। তাই সম্মানিত পাঠকবর্গকে সে ইতিহাসগুলোই পড়ার দাওয়াত দেব এবং অনুরোধ করব, বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে মিলিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য।

আরো মনে রাখতে হবে, দ্বীনের জন্য আল্লাহর দুশমনের হাতে বন্দিকে গণতান্ত্রিক রাজবন্দির সঙ্গে তুলনা করে ভুলের মাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন না। সে বন্দি জীবনের সঙ্গে তুলনা করবেন না যে বন্দি জীবনে সোফার ব্যবস্থা না করে শুধু খাটের ব্যবস্থা করে কষ্ট দেয়া হয়, এক নম্বর এসি'র ব্যবস্থা না করে দুই নম্বর এসি'র ব্যবস্থা করে কষ্ট দেয়া হয়, ব্রেড ও জেলি দিয়ে ছুরি ও কাটা চামচ না দিয়ে অপমান করা হয় -সে বন্দি জীবনের সঙ্গে তুলনা করবেন না।

## দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ

এখন রইল মানহাজ। মানহাজের ব্যাপারে এমন কোন দাবি করতে চাই না যা নিয়ে কোন প্রকার দ্বিমত থাকতে পারে। বা কারো আপত্তি আসার সুযোগ থাকতে পারে। দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের যে অংশটিকে কেউ অস্বীকার করার সাহস দেখাবে না তা হচ্ছে, ১. দারুল উলূম দেওবন্দ কখনো কুফরী শক্তির অধীনস্ততা স্বীকার করে তাদের সঙ্গে আপোষ করার নীতিকে গ্রহণ করেনি। ২. দারুল উলূম দেওবন্দ যে মানহাজে তালীম গ্রহণ করেছে তা কখনো এ অনুমতি দিবে না যে, কুফরের প্রতিষ্ঠাতা ও কুফরের প্রয়োগকারীদেরকে ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে সম্বোধন করা হবে। ৩. ইসলামী শরীয়তকে যারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে দেবে তাদেরকে ইসলামের খাদেম বলার বৈধতা দেবে -এমন হতে পারে না। ৪. কুরআন, হাদীস তথা শরীয়তের বিধানকে যারা মানবরচিত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বের করে দেবে দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের আলোকে তাদেরকে ইসলামের বন্ধু বলার বৈধতা সাব্যস্ত হতে পারে না। ৫. কুরআন-হাদীসের আইন বাস্তবায়িত হলে দেশ উন্নতি অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে যাবে বলে যাদের ধারণা, তাদের নেক হায়াতের জন্য দোয়া করার অনুমতি দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ দিতে পারে না।

দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ যদি মনে করে, তার মানহাজে তালীমী শতভাগ সঠিক, মানহাজে তালীমীর সিদ্ধান্ত শতভাগ সঠিক, মানহাজে তালীমীর দাবি শতভাগ সঠিক তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দ তার শত্রু মিত্র চিনতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ উপাদান মানহাজে তালীমীর মধ্যে এখনো মজুদ রয়েছে। কোন

তালিবুল ইলম যদি অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে এড়িয়ে, সত্যগোপনকারীদের সত্যগোপনের খপ্পরে না পড়ে সহীহ মাধ্যমে এবং সহীহ রাহবারের রাহবারীতে মানহাজে তালীম পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে সে তালিবুল ইলম সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না। দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজে তালীমের উপর এতটুকু অস্থা ও ভরসা আমাদের আছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক উপলব্ধির তাওফীক দান করুন।

**সারসংক্ষেপ**

কথায় কথায় আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে। আলোচনার সারমর্মের উপর আমরা আরেকবার একটু নযর বুলিয়ে নিতে পারি। রাজদরবারের সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজার কারাগারের পঁচাগলা ধিকৃত ছোট ছোট কিছু মানুষের ছোট্ট একটি কাফেলা উভয়ের আকীদা, মানহাজ, ইলমের মাসলাক, মাশরাব এক হওয়া সত্ত্বেও এক দল কেন সমাদৃত এবং আরেক দল কেন ধিকৃত -এটাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়।

‘বড়’র ধারণা, এটা ‘ছোট’র ইলম ও প্রজ্ঞার অভাব। আর ‘ছোট’র দাবি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তব চিত্র। যে বাণীতে তিনি বলেছিলেন-

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «**حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ**». (سنن ابي داود، بَابٌ فِي تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ، ٣٦ - كِتَاب الْمَلَاحِمِ، الرقم: ٤٢٩٧)

عن ابن عمر قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة من العرب وخمسة من الموالي فقال: "هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم، وغشي أبوابهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يغش أبوابهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض". (شرح مشكل الآثار للطحاوي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الأشياء التي من كانت منه أن يكون منه صلى الله عليه وسلم، الرقم: ١٣٤٦)

'ছোট'র দাবি, এটা ঐ চিত্র যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤). سورة البقرة.

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢). سورة الأحزاب.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١). سورة البقرة.

'ছোট'র দাবি, অজুহাত আখের থেকেই যাবে-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨). سورة البقرة.

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤). سورة المائدة.

কিন্তু সঠিক-বেঠিকের সঠিক সিদ্ধান্তের জন্যতো আসল বিচারকের বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। বাকি শরীয়তের মূলনীতির আলোকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিজের পথ চলার ব্যবস্থা করতে হবে।

***************

# ইসলামী খেলাফত-ইবাদত

পরিচিত পরিভাষাগুলো আবার মুখস্থ করতে হচ্ছে, অর্থ নতুন করে শিখতে হচ্ছে। যামানার একেকটি পর্ব পার হয় আর নতুন রাহবারদের নতুন পরিভাষা, নতুন সবক ইয়াদ করতে হয়। প্রায়ই আগের সবকের সঙ্গে পরের সবকের মিল থাকে না। নতুন প্রজন্মের জন্য আগের সবাই বড়। শুধু বড় হিসাবে যদি নতুন প্রজন্মকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে প্রজন্ম গলায় ফাঁসি দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়ের মিল দেয়ার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই মানুষ ফাঁসির রাস্তা বেছে নেয়। এতে সমস্যার সমাধান হয় না। তবে এ দায়িত্ব নিয়ে ফাঁসির রশিতে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে আর ভাবতে হয় না।

আমরা গলায় ফাঁসি দেয়ার পথ গ্রহণ করতে রাজি নই। কারণ আমাদের সামনে রাস্তা খোলা আছে। গলায় ফাঁসি দেয়ার কোন বৈধতা আমরা পাব না। এসব পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কুরআনে এর দিক নির্দেশনা রয়েছে।

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠). سورة النساء

٣٣٣٨/ ٦٧٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (١)». (مؤطأ مالك)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الرقم: ١٣٨٩)

আমরা ইজতিহাদ করব না, ইস্তিম্বাত করব না। কিন্তু বিপরীতমুখী দু'টি সিদ্ধান্তের একটিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যদি এ আয়াত ও হাদীসকে কাজে না লাগাতে পারি, গলায় ফাঁসি দেয়ার মত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের

জন্যও যদি এ আয়াত ও হাদীসের আশ্রয় নিতে না পারি তাহলে আমরা এ আয়াত ও হাদীস কেন পড়েছি? কেন পড়াচ্ছি?!

একটি শিরনামের শুরুতেই এমন একটি ভূমিকা দেখে পাঠক মনে হয় একটু ভড়কে গেছেন। আসলে ফিকর তার রাস্তায় চলতে গিয়ে আপন মনে চলছে। এরই মধ্যে হঠাৎ হাতে কলম। তখন কলম দিয়ে তাই বের হওয়া শুরু হয়েছে রাস্তার যে মোড়ে ফিকরের সঙ্গে কলমের দেখা হয়েছে। যার ফলে পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না, ফিকরের পথ চলা শুরু কোথা থেকে। জীবনের সঙ্গে এসব কথার কী মিল? আর লেখকের সমস্যা হল, পাঠকের উপযুক্ত করে কথা গোছাতে গেলে বিষয়বস্তু হারিয়ে যায়। তখন শুধু গোছানো হয়, কথা আর হয় না। আখের এটাও একটা দুর্বলতাই।

আজকের আলোচনার জন্য আমাদের কাছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। উপদানদু'টির গুরুত্ব তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে উপাদানের মাসদারের কারণে। তাই বিষয়টি নিয়ে যেনতেনভাবে কথা বলা চলে না।

### বড়

১. কওমের রাহবার পর্যায়ের ভক্ত-শ্রোতাদের বিশাল কাফেলা। রাহবারদেরও রাহবার রাহবারদেরকে হেদায়েত দিয়ে চলেছেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনারা কি ইসলামী খেলাফত চান? অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আভাস দেখতে পেয়ে রাহবারের কাফেলা মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠেছে চা--ই! চা--ই! রাহবারদেরও রাহবার ভারি গলায় রাজ্যের সর্বোচ্চ অকারগুলোকে (এটি একটি উর্দূ শব্দের বাংলা উচ্চারণ) জড়ো করে শীতল সুরে জানিয়ে দিলেন 'আমি চাই না'।

মাহাত্মপূর্ণ ব্যাখ্যা করলেন, 'ইসলামী খেলাফত চাইতে গিয়ে কেউ কেউ আজ ইবাদতটাও করতে পারছে না। যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছে আজ তাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না? আর আমরা দেখুন, কত সুন্দর সব ইবাদত করতে পারছি। ইসলামী খেলাফতের জন্য নিজেদের ইবাদতগুলো আমি নষ্ট করতে চাই না'।

২. প্রচলিত ধারার এক প্রাচীন ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রাচীন রাজনীতিবিদ। পদবি হিসাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেও অভিজ্ঞতা ও পাওয়ারের দিক থেকে প্রথম ব্যক্তি। বয়সে ষাটের গ্রন্থি পার করেছেন বহু আগে। একান্ত আলাপচারিতার মাঝে জানতে চেয়েছিলাম, আপনাদের ও আমাদের গণতান্ত্রিক

পদ্ধতির এ রাজনীতির গন্তব্য ও টার্গেট কী? বললেন, সর্বস্তরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আহ্বানকে পৌঁছে দেয়া।

বললাম, এ কাজতো দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে চলছে এবং এত মাত্রায় চলছে যে, দেশের প্রধান দুই নেত্রীকেও দাওয়াতের ভাইয়েরা টঙ্গির ময়দান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়েছেন। রাজনীতির মাধ্যমে এর মাঝে আর কী মাত্রা যোগ করতে চান? বললেন, না! দাওয়াত ও তাবলীগের লোকেরাতো আমর বিল মা'রূফ তথা সৎ কাজের আদেশ করেন না, তারা করেন অনুরোধ বিল মারূফ।

বললাম, আপনাদেরটা আমর বিল মা'রূফ, আর তাদেরটা অনুরোধ বিল মা'রূফ। এ পার্থক্যটা কেন হল? আপনারাও আমর বিল মারূফ করার পর মাদউ বা শ্রোতা যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে আপনারা মাদউকে কিছু বলেন না, তারাও আমর বিল মা'রূফ করার পর মাদউ তা গ্রহণ না করলে তারা কিছু বলেন না। তাহলে আপনাদেরটা আমর বা আদেশ, আর তাদেরটা অনুরোধ - এ ব্যবধান কীভাবে হল? বললেন, ব্যবধান আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি ক্ষমতায় যেতে চান? রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান? বললেন, না, আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই না। এটাতো মওদূদীর উদ্দেশ্য। আমরা সর্বস্তরে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে চাই। বললাম, ক্ষমতা দখল করতে চাওয়া মওদূদীর উদ্দেশ্য হতে যাবে কেন? ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরয দায়িত্ব। আর যদি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে ইসলামী রাজনীতির শিরনামে যে কাজ করছেন তার গন্তব্য কী? বললেন, বুঝেছি। তুমি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ'র ছেলেতো। তোমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ারই কথা। তুমি ঢাকায় আস। আমাদের সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা হয়। সেখানে তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে।

বললাম, যে প্রশ্নের উত্তর নোয়াখালীতে হয়নি সে প্রশ্নের উত্তর ঢাকায় গিয়ে কীভাবে হবে? প্রশ্নকারীও আমি, আর উত্তরদাতাও আপনি। অবশ্য এ শেষ কথাটি আমি মনে মনে বলেছি।

**ছোট**

প্রথম প্রসঙ্গটি হচ্ছে, 'আমি ইসলামী খেলাফত চাই না'।

## 'আমি ইসলামী খেলাফত চাই না'

এ কুফরী বাক্যটির উপর ছোটদের যেসব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সে প্রশ্নগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরলে সবাই মিলে এর উত্তরগুলো খুঁজতে

সহজ হবে এবং সীমিত কিছু মানুষ শুধু শুধু পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন হবে না। প্রশ্নগুলো এই-

ক. ইসলামী আকীদার কিতাবে যে نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضٌ এ বাক্যটি রয়েছে এর অর্থ কী? এ ফরযের অর্থ যদি হয় শরীয়ত কর্তৃক অর্পিত ফরয, তাহলে সে ফরয প্রতিষ্ঠা যে চায় না শরীয়তের আদালতে তার বিধান কী?

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কাফন দাফন দেয়ার হুকুম করে গেছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর কাফন দাফনে অস্বাভাবিক দেরি হয়েছিল কেন? ইতিহাস এ বিষয়ে কী বলে?

গ. খলিফা নির্ধারণের জন্য যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন দাফনে দেরি করলেন তাঁদের এ দেরি করা কি অন্যায় ছিল?

ঘ. সম্ভাব্য একটি বদনামের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করেও তাঁরা কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের আগে আগে খলিফা নির্ধারণের এ দায়িত্ব পূর্ণ করাকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে নিয়েছেন?

ঙ. খলিফা কে হবেন এ নিয়ে দ্বিমত হলেও খলিফা নির্ধারণ পরে করা যাবে আগে রাসূলের কাফন দাফন সম্পন্ন হোক - কোন একজন সাহাবীও কি এমন প্রস্তাব দিয়েছেন বলে ইসলামের ইতিহাসের কোন কিতাবে আছে? যদি না থেকে থাকে তাহলে কেন?

### ফরয তরকের ইবাদত কৌশল

'আমি ইসলামী খেলাফত চাই না' এর পক্ষে মাহাত্ম্যপূর্ণ যে যুক্তিগুলো 'মুতাহাররেক বেলা এরাদা' রাহবারদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে এবার কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে।

ক. ইবাদতের সংজ্ঞা কী? কোন কোন আমলকে ইবাদত বলা হয়? ঈমানের সাতাত্তর শাখার কোন কোন শাখাকে ইবাদত বলা হবে, আর কোন কোন শাখাকে ইবাদত বলা হবে না?

খ. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন কোন আদেশ মানাকে ইবাদত বলা হয়, আর কোন কোন আদেশ মানাকে ইবাদত বলা হয় না? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন কোন নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়, আর কোন কোন নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয় না?

গ. কোন কোন ইবাদতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত ফরয দায়িত্বগুলো ছেড়ে দিতে হয় এবং ভক্ত মুরিদদেরকে সেসব ফরয ছেড়ে দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হয়?

ঘ. যে ব্যক্তি 'ইসলামী খেলাফত' চায় না সে কী খেলাফত চায়?

ঙ. ইসলামী খেলাফতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যদি হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বাস্তবায়ন, তাহলে এ খেলাফত না চাওয়ার খুব স্বাভাবিক অর্থই হচ্ছে গায়রুল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকে চাওয়া। অথবা কমপক্ষে গায়রুল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা না থাকা, বা গায়রুল্লাহর বিধান বিলুপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা না করা। তাহলে এ খেলাফত না চাওয়ার শরয়ী বিধান কী?

চ. যারা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা কোন কোন ইবাদত করতে পারেনি যে ইবাদতগুলো ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিরোধীরা করতে পেরেছে ও পারছে?

ছ. ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যেসব ইবাদতে ব্যঘাত ঘটেছিল বর্তমানে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার চাইতে অতিরিক্ত কোন কোন ইবাদতে ব্যঘাত ঘটছে? যারফলে ইবাদতের জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্ব থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে এবং অন্যদেরকে বিরত রাখতে হচ্ছে।

## এ ইবাদতটুকু কেন করা যায়নি?

পাঠক খুব বেশি বিরক্ত না হলে এবার তৃতীয় আঙ্গিকের কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে। অর্থাৎ, ইসলামী খেলাফত না থাকার কারণে এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঝামেলায় (নাউযুবিল্লাহ) না জড়ানোর কারণে আবেদীনের জামাত কী কী সুবিধা পাচ্ছেন সে বিষয়ে প্রশ্নগুলো করা যায়-

ক. দেশের মালিকপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যে সর্বদলীয় প্রার্থনা সভায় গিয়ে প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তাকে খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দেয়ার আগে কি এ এবাদতটুকু করা গেছে যে, আপনিতো মুরতাদ হয়ে গেছেন। তাই নতুন করে ঈমান এনে পরে আমাদের দাওয়াতে আসলে ভালো হবে?

খ. মালিক পক্ষের নীতিনির্ধারকদের সামনে যুগের পর যুগ বয়ান করতে গিয়ে এ এবাদতটুকু কি করা গেছে যে, আপনারাতো কুরআন-হাদীসের বিধানের বিপরীতে সুদ, পতিতালয়, মদ, মূর্তি ইত্যাদিকে বৈধতা দিয়ে

মুরতাদ হয়ে গেছেন। নামাযের সামনের কাতারে দাড়িয়ে কেন সাধারণ মুসলমানদের নামায ও তাদের মসজিদকে নষ্ট করেন?

গ. মালিকপক্ষকে এ বার্তাটুকু পৌঁছানোর ইবাদতটা কি করা গেছে যে, আপনারা ইসলাম ধর্মকে ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে ইসলামের শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ বিধানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে গেছেন।

ঘ. মালিকপক্ষের কাছে কি এ বার্তা পৌঁছানোর ইবাদতটুকু করা গেছে যে, সব ধর্মের মান সমান নয়? ইসলাম ধর্ম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্য ধর্মের মানুষ জীবিত ও মৃত কোন অবস্থাতেই মুসলমানের শ্রদ্ধা পেতে পারে না। মুসলমান ব্যতীত কারো জন্য পরকালের শান্তির দোয়া করা যায় না। এ ইবাদতটুকু কি করা গেছে?

ঙ. মালিকপক্ষের সর্বোচ্চ ব্যক্তি যে বলেছে, সকল ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে এসে রবিন্দ্রনাথের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে -এ কুফরী থেকে নিজের মুসল্লীদেরকে ফেরানোর ইবাদতটুকু কি করা গেছে বা যাচ্ছে?

চ. ইলমের প্রত্যেকটি অধ্যায় যে অকপটে প্রচার করার ফরয দায়িত্ব রয়েছে সে ইবাদতটা কি আদায় হচ্ছে?

ছ. নিজের তের-চৌদ্দ-পনের-ষোল-সতের বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে হাদীসের উপর আমল করার ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে।

জ. নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে শরীয়তের উপর চলার জন্য শরীয়ত নির্দেশিত শাসনের ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে?

ঝ. নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে (আল্লাহ না করুক) যিনা, বেপর্দা, পরকিয়া, অবৈধ সংস্রবে লিপ্ত হলে শরীয়ত নির্দেশিত শাসনের ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে?

ঞ. বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষের সম্মতিক্রমে দৈহিক মিলন কোন শাস্তিযোগ অপরাধ নয় -এর জন্য কি আইন প্রণেতাদেরকে কোন কিছু বলার ইবাদত করা যাচ্ছে?

ট. মুসলমান জামাতে হাজির না হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকেসহ ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকী দিয়েছিলেন। এখন যে কোটি কোটি মুসলমান নামায পড়ছে না তাদেরকে নামাযের জন্য বাধ্য করার বা শাস্তির বিধান করার ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে? বা শুধু মৌখিক ধমক দেয়ার অধিকারটুকুও কি আছে?

ঠ. অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ব্যক্তির উপর যে ফরয দায়িত্ব বর্তায় বলে আয়াত-হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে রয়েছে সে ইবাদতটা কি করা যাচ্ছে?

ড. রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে উচ্চস্বরে শরীয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ গান চলছে তা থেকে বাঁচার মত কোন কিছু কি আপনি করতে পারছেন?

ঢ. রাস্তা-ঘাটে পিলারে পিলারে, দেয়ালে দেয়ালে উলঙ্গ ছবি ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির ছবি যে সরকারী স্বীকৃতিসহ ঝুলানো রয়েছে তার জন্য কী করা যাচ্ছে?

ণ. সরকারী স্বীকৃতিসহ ইন্টারনেট, সিনেমা, নাটক ও বই-পত্রে যে প্রকাশ্যে শরীয়তের বিধানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রসার চলছে এবং তা সংরক্ষিত হেরেমের অন্দর মহল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, তার জন্য কী করা যাচ্ছে? এগুলোর কোন দায়িত্বই কি আমাদের উপর বর্তায় না? এগুলোর প্রতিরোধ করা না করার সঙ্গে কি ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই?

এগুলো যদি ইবাদতের তালিকায় স্থান না পেয়ে থাকে, ফরয দায়িত্বের তালিকায় স্থান না পেয়ে থাকে তাহলে যে ইবাদতগুলো করতে পারছেন সে ইবাদতগুলোর একটা সংখ্যা এবং একটা তালিকা দরকার, যাতে আমরা হিসাবে মিলিয়ে নিতে পারি যে ইসলামী খেলাফত না থাকা বা ইসলামী খেলাফতের জন্য চেষ্টা না করার সুফল (?) হিসাবে আমরা কী কী ইবাদতের বাড়তি সুযোগ পাচ্ছি। যে সুযোগ ইসলামী খেলাফত থাকলে বা ইসলামী খেলাফতের জন্য চেষ্টা করলে আমরা পেতাম না।

## দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পছন্দ করে এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে পরিচয় প্রচারে প্রসারে বাড়তি মেধা ব্যয় করে, এমন এক ব্যক্তি যদি ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এ মন্তব্য করে তাহলে দারুল উলূম দেওবন্দ তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করবে না কি মিত্র হিসাবে গ্রহণ করবে?

শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. যে ইসলামী খেলাফতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এত দামি একটা জীবনকে শেষ করে দিলেন, নিজে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন, নিজের এত দামি দামি শাগরেদদেরকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে শিখালেন, নিজে বছরের পর বছর বন্দি জীবন কাটালেন, নিজের শাগরদেরকে বন্দি জীবন কাটাতে উদ্বুদ্ধ করলেন -এসব করতে গিয়ে তাদের যে ইবাদতে ব্যঘাত ঘটেছিল তা তাঁরা কীভাবে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের চাইতে কোন কোন ইবাদতটি বেশি করার জন্য আজকের আবেদরা ইসলামী খেলাফত চাচ্ছেন না।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাফেলা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কোন কোন

ইবাদতগুলো করতে পারেননি? যারফলে আবেদের খাতা থেকে তাঁদের নাম কাটা গিয়েছিল (?)। আর তাঁদের অনুসারী প্রজন্মের 'বড়' উপাধিপ্রাপ্তরা তাঁদের চাইতে কোন ইবাদতগুলো বাড়তি করার জন্য ইসলামী খেলাফত থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে?

দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী মানহাজের দাবি কী? সে মানহাজের দাবি কি এ রকম? যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলে বা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তার অনুসারী হওয়ার দাবিদারদের মধ্য থেকে যাদের ইবাদতে ব্যঘাত ঘটে তারা সমাদৃত, প্রসংশিত ও অনুসরণীয়? আর ইসলামী খেলাফত থাকলে বা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে যাদের ইবাদতের সুযোগ বাড়ে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের সব দরজা খুলে যায়, সব বাধা দূর হয়ে যায় তারা ধিকৃত, উপেক্ষিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়?

এ ধরনের বিশ্বাসকে কতক্ষণ লালন করে রাখা যাবে? সর্বোচ্চ কিতাব-পত্রের পৃষ্টা উল্টানোর আগ পর্যন্ত। আয়াত-হাদীস ও ফিকহের উদ্ধৃতি সামনে আসার পরও যদি অস্বীকারের দরজা খোলাই থেকে যায় তাহলে তাদের সঙ্গে আমরা কেন সময় ব্যয় করব? তাদের জন্য কেন কাগজ ও কালি ব্যয় করব।

## কিছু উদ্ধৃতি

শুধুমাত্র অধ্যয়নের সুবিধার্তে এখানে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি দেখে নেয়া যেতে পারে। মাসআলার সমাধান এ ছোট বই থেকে করার অযাচিত আশা করা, আবার লেখককে গালমন্দ করার কোন প্রয়োজন নেই। কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

তাফসীরুল বাহরিল মুহীত-

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ هنَا أَحْكَامَ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى، وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعُهَا أُصُول الدِّينِ، فَهُنَاكَ ذِكْرُهَا، لَكِنِّي لَا أُخَلِّي كِتَابِي عَنْ شَيْءٍ مُلَخَّصٍ فِيهَا دُونَ الِاسْتِدْلَالِ. فَنَقُولُ:

الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ فَرْضٌ، خِلَافًا لِفِرْقَةٍ مِنَ الْخَوَارِجِ، وَهُمْ أَصْحَابُ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ. زَعَمُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ إِقَامَةُ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى إِمَامٍ، وَلِفِرْقَةٍ مِنَ الْإِبَاضِيَّةِ زَعَمَتْ أَنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ. (تفسير البحر المحيط، سورة البقرة ٢٤-٣١)

আলইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ-

[بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ]

فَائِدَتَانِ إِحْدَاهُمَا: نَصْبُ الْإِمَامِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. فَمَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعٍ، أَوْ بِنَصٍّ، أَوْ بِاجْتِهَادٍ، أَوْ بِنَصٍّ مَنْ قَبْلَهُ عَلَيْهِ. وَبِخَبَرٍ مُتَعَيِّنٍ لَهَا: حَرُمَ قِتَالُهُ. وَكَذَا لَوْ قَهَرَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ. حَتَّى أَذْعَنُوا لَهُ وَدَعَوْهُ إمَامًا. (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.١٠/٣١٠)

فَائِدَةٌ: نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَوَّلِ " بَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ". وَذُكِرَ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَةٌ: أَنَّهُ لَيْسَ فَرْضَ كِفَايَةٍ. وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ. (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.١١/١٥٤)

আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুয়েতিয়্যাহ-

وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيَجِبُ عَلَى الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهَا مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ تَنْصِيبُ إِمَامٍ لِلْمُسْلِمِينَ يَقُومُ بِحِرَاسَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا (١)، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢)، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (٣). (الموسوعة الفقهية الكويتية، كلمة "الكفاية".)

(١) من البدائع ٢/٧، والشرح الصغير ٢٧٣/٢، والأحكام السلطانية للماوردي ٥، والأشباه للسيوطي ٤١٤، والأحكام السلطانية للفراء ١٩، والآداب الشرعية ٥٥٤/٣.

(٢) سورة النساء / ٥٩. (٣) حديث: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". أخرجه أبو داود (٨١/٣) من حديث أبي هريرة.

আদদুরারুস সানিয়্যাহ-

**[فرضية نصب الإمام]** وسئل: أبناء الشيخ محمد وحمد بن ناصر رحمهم الله؛ هل نصب الإمام فرض على الناس أم لا؟

فأجابوا: الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإمام يجب نصبه على الناس، وذلك أن أمور الإسلام لا تتم إلا بذلك، كالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، وإقامة الحدود، وإنصاف الضعيف من القوي، وغير ذلك من أمور الدين، ولهذا أوجب الله طاعة أولي الأمر، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة النساء آية: ٥٩.] وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [سورة آل عمران آية: ١٠٣]. الدرر السنية في الأجوبة النجدية.

মাজাল্লাতুল বায়ান-

أقوال أهل العلم في دور الأمة:

أجمع أهل العلم على أن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة، وهذا يعني أنه مفروض على الأمة من حيث مجموعها لا من حيث أفرادها، ولا يمكن أن يقال إن الأمة مفروض عليها القيام بذلك العمل بينما لا يكون لها دور في العمل نفسه؛ هذا كلام متناقض يدفع بعضه بعضاً. قال القرطبي -رحمه الله-: «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم؛ حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله، واتبعه على رأيه ومذهبه»، وقال النووي: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة». (مجلة البيان. العدد ٢٠٤ رجب ١٤٢٥هـ مقالة : دور الأمة ومكانتها فى بناء النظام السيام)

এ উদ্ধৃতি এবং এর মত আরো হাজার উদ্ধৃতি রয়েছে যেগুলোকে হয়ত অস্বীকার করে মুরতাদ হতে হবে, নয়ত স্বীকার করে নতুন করে ঈমান আনতে হবে। নয়ত প্রজন্মকে এ বৈপরীত্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে হবে।

কারণ, আমরা আগেই বলে এসেছি যে, আমরা স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি ছোট। তাই বাঘ ছাগলের পার্থক্য বোঝার মত বয়স ও যোগ্যতা আমাদের হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে যে স্বল্প ইলম রয়েছে তা দিয়েই মাসআলা বোঝাতে হবে। যে ভাবে মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের 'এসো আরবী শিখি'র ছাত্রকেও এরাব শিখাতে হয়। নাহুর পরিভাষাগুলো শেখাতে হয়।

'তুমি ও তোমরা বুঝবে না' এমন কথা শোনার জন্য প্রজন্মের অবুঝ ছেলেরা একদম প্রস্তুত নয়। তাই এ পথে পা না বাড়ালেই ভালো হবে। আল্লাহ সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন। অযথা হঠধর্মিতা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

## 'আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই না'

'আমরা রাজনীতি করি সর্বস্তরে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আহ্বানকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আমরা ক্ষমতা দখল করতে চাই না। ক্ষমতা দখল করাতো মওদূদীর চিন্তাধারা'।

প্রথম কথা হচ্ছে, এ বড়রা তাদের ইসলামী রাজনীতি রাজনীতি খেলার ক্ষেত্রে যেসব তরুণ ও যুবকদেরকে ব্যবহার করে থাকেন সেসব তরুণ ও যুবকরা তাদের বড়দের মনের এ কথাটি জানে কি না? আমারতো মনে হয় তারা জানে না।

কারণ, স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেতো মনের মরা গাছে ফুল ফুটে সে ফুলের সুগন্ধিও ছড়াতে শুরু করে। মনের অজান্তেই শেরওয়ানীর বোতামটা, জুতার ফিতাটা, সদরিয়ার রশিটা, জামার কলারটা, রুমালের ভাঁজটা ঠিকঠাক করে নেয়ার জন্য হাত-পা নড়াচড়া শুরু করে। বলা যায় না, কখন চেয়ারে বসার ডাক এসে যায়, কখন সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক এসে যায়, সর্বোপরি কখন জাতির উদ্দেশ্যে নবনির্বাচিত ইসলামী খলিফা হিসাবে ভাষণ দেয়ার জন্য দলের নেতাকে কেতাদুরস্ত করে তৈরি করার জন্য ছুটে যেতে হয়।

কথাগুলো মনের কল্পনা নয়। বিগত কোন কোন নির্বাচনে একশত বা একশত পঁচিশটি সংসদীয় আসন পাওয়ার মত সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোন বিবেচনায় তারা আসনগুলোর লোভ করেনি। তাহলে এ আসন সংখ্যা একশত পঞ্চাশ পার করতে আর কতক্ষণ?

এছাড়া বিভিন্ন নির্বাচনেতো দ্বিতীয় অবস্থান পেয়েই চলেছে। হোক জামানত বাজেয়াপ্ত। কিন্তু দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পেরেছে এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। আর দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছার পর প্রথম স্থানে যেতে আর কতক্ষণের ব্যাপার? অথচ দলের নেতার বক্তব্য হচ্ছে এই। তাঁরা ক্ষমতায় যেতেই চান না। ক্ষমতা দখল করা মওদূদীর মতবাদ।

## তাহলে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির গন্তব্য কী?

দলের নেতা ও দলের কর্মীর বক্তব্যের এ তফাত দেখে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি, রাজনীতির নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতির কর্মীদের কাছ থেকে অনেকগুলো বিষয় জানতে ইচ্ছা করে। প্রশ্নগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে সঠিক উত্তরের ফিকর করলে ভালো হবে। নেতিবাচক চিন্তা করলে 'মুতাহাররেক বেলা এরাদা' কর্মীদেরকে হয়ত উত্যক্ত করা যাবে, কিন্তু কারো

জন্য সেটা সুফল বয়ে আনবে না। তাই এবার প্রশ্নগুলোর উল্লেখ শুরু করা যায়।

## এর নাম রাজনীতি কেন?

ক. প্রথম জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে, প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্য? না কি শুধু সময়ে সময়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য? যদি শুধুমাত্র সময়ে সময়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য হয়ে থাকে তাহলে এ দলগুলো রাজনৈতিক দল কেন। তিনশত আসনে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনী লড়াই করা হয় কেন? রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধিত হয় কেন? সংসদ ভবনের চেয়ারে বসার জন্য সব ধরনের অন্যায়গুলো করা হয় কেন।

এমনিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা সময়ে সময়ে হবে কেন? যে দেশের রাষ্ট্রপক্ষ কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের আইনের উপর তালা লাগিয়ে সিলগালা করে দিয়ে কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেখানে প্রতিবাদের জন্য সময়ে সময়ে ইস্যু তৈরি হওয়ার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কেন? গ্যাসের দাম বাড়ানোর কারণে, বিশেষ একটি মূর্তি স্থাপনের কারণে আলাদা করে আন্দোলন করতে হয় কেন? আলাদা করে নতুন ব্যানার তৈরি করতে হয় কেন? নতুন নতুন শ্লোগান তৈরি করতে হয় কেন? না কি কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের উপর তালা লাগিয়ে দেয়াকে কোন অন্যায় বলে মনে হয় না?

আর যদি প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে ছোটদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে-

## এ রাজনীতি কেন?

খ. রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা মানেতো হচ্ছে বর্তমান যে রাষ্ট্রপ্রধান আছে তাকে সরিয়ে দেয়া এবং নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা। এ ক্ষেত্রে ছোটদের প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির দায়িত্বশীলগণ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে কাফের মনে করেন? না কি মুসলমান মনে করেন? যদি মুসলমান মনে করেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকে শরীয়তের পরিভাষায় কী বলে? এবং তার হুকুম কী?

আমাদের ক্ষুদ্র অধ্যয়ন অনুযায়ী একে বাগাওয়াত বা বিদ্রোহ বলা হয়। আর এ বাগাওয়াতকারীর ও বিদ্রোহীর বিধান হচ্ছে গর্দান উড়িয়ে দেয়া।

রাষ্ট্রপক্ষ চাইলে রাষ্ট্রের শৃংখলা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যখন তখন এ বিদ্রোহীদের গর্দান উড়িয়ে দিতে পারবে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ দায়ী থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিধান দিয়ে যদি কেউ বলতে চান যে, বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইয়ের বৈধতা গণতন্ত্রের আইনে আছে। তাই এ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াই করলে মুবাহুদ দম হবে না।

এর জন্য আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, আমরা ইসলামের আইনের কথা বলছি, মুসলিম সরকারের কথা বলছি। গণতন্ত্রের আইনেতো কোন নাস্তিক সরকার প্রধান হলেও সমস্যা নেই এবং তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াইতেও কোন সমস্যা নেই। আর ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে কুফর না পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার লড়াই করা যায় না।

আর যদি প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির কর্ণধারগণ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে কাফের মনে করেন তাহলে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে-

গ. আপনারা যদি রাষ্ট্রপ্রধানকে কাফের মনে করেন তাহলে তা নিশ্চয় কুফরী আইন, কুফরী প্রশাসন, কুফরের লালন এবং বিভিন্ন সময়ে সুস্পষ্টভাবে কুফরীর স্বীকৃতির কারণেই তাদেরকে কাফের মনে করেন। যারফলে আপনারা এ কুফরী আইনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী খেলাফতের আন্দোলন করেন। এইতো?

বিষয়টি যদি এমনই হয় -তাছাড়া না হয়ে কোন উপায়ও নেই- তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কাফের, যে দেশের আইন শতভাগ কুফরী, যে দেশের প্রশাসন কাফের, যে দেশে কুফরের সযত্নে লালন হয়, যে দেশে শরীয়তের আইন পরিচালনা বৈধ নয়, কুরআন-হাদীস ও ফিকহের পরিভাষায় সে দেশের নাম কী? দারুল হারব কাকে বলে এবং দারুল ইসলাম কাকে বলে? দারুল হারব ও দারুল ইসলাম হিসাবে এ দেশের নাম দারুল হারব না কি দারুল ইসলাম?

প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির নেতা কর্মীরা জানেন না তাঁরা দারুল হারবে বাস করছেন না কি দারুল ইসলামে বাস করছেন। পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখার সুযোগ তাঁদের হয়নি। যারা শুধু কিতাব নিয়ে বসে আছেন এবং কিতাবই যাঁদের জীবন তারাই পৃষ্ঠাগুলো উল্টানোর সময় পাচ্ছেন না, এনার্জিও পাচ্ছেন না। তাহলে রাজনৈতিক নেতারা সে সুযোগ কীভাবে পাবেন? আমি মাসআলা তাহকীক করছি না। সে যোগ্যতা আমারও নেই, আমার এ ছোট্ট বইয়েরও নেই। শুধুমাত্র তাহকীক করার জন্য সহযোগিতামূলক কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দিতে পারি।

## দু'টি বিলুপ্ত (?) পরিভাষা

বাদাইউস সানায়ে, রাদ্দুল মুহতার, মাবসূত, কাশশাফুল কিনা, আলইনসাফ, আলমুদাওয়ানা ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে 'আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুয়েতিয়্যাহ' -তে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে-

١- دَارُ الإِسْلاَمِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ ظَاهِرَةً.

٢- دَارُ الْحَرْبِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الْكُفْرِ ظَاهِرَةً .

بدائع الصنائع ١٣٠/٧-١٣١، ابن عابدين ٢٥٣/٣، المبسوط ١١٤/١٠، كشاف القناع ٤٣/٣، الإنصاف ١٢١/٤، المدونة ٢٢/٢.

কোন দেশ কাফের হুকুমতের হাতে চলে গেলে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

**الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:**

٥- إِذَا اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى بُقْعَةٍ مِنْ دَارِ الإِسْلاَمِ صَارَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ النَّاحِيَةِ الَّتِي اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ، رِجَالاً وَنِسَاءً، صِغَارًا وَكِبَارًا، أَصِحَّاءَ وَمَرْضَى، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَهْل النَّاحِيَةِ دَفْعَ الْعَدُوِّ عَنْ دَارِ الإِسْلاَمِ، صَارَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ أَهْل النَّوَاحِي الأخْرَى مِنْ دَارِ الإِسْلاَمِ، وَهَكَذَا حَتَّى يَكُونَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَمْكِينُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ دَارِ الإِسْلاَمِ. وَيَأْثَمُ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَرَكُوا غَيْرَهُمْ يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ دَارِ الإِسْلاَمِ. (ر: جِهَادٌ) .

وَيَجِبُ عَلَى أَهْل بُلْدَانِ دَارِ الإِسْلاَمِ، وَقُرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ شَعَائِرِ الإِسْلاَمِ، وَإِظْهَارُهَا فِيهَا كَالْجُمُعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ، وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَالأذَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ تَرَكَ أَهْل بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ إِقَامَةَ هَذِهِ الشَّعَائِرِ أَوْ إِظْهَارَهَا قُوتِلُوا وَإِنْ أَقَامُوهَا سِرًّا.

أسنى المطالب ١٧٤/٤، روضة الطالبين ٢١٧/١٠، بدائع الصنائع ٢٣٢/١، و٩٨/٧، وكشاف القناع ١٣٤/١، ونهاية المحتاج ١٣٦/٢-١٣٧.

একটি দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে রূপান্তরিত হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ) : تَصِيرُ دَارُ الإِْسْلاَمِ دَارَ كُفْرٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِيرُ دَارَ كُفْرٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ شَرَائِطَ:

١- ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

٢- أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ.

٣- أَنْ لاَ يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ، وَلاَ ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالأَْمَانِ الأَْوَّل، وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ.

وَوَجْهُ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ وَمَنْ مَعَهُمَا أَنَّ دَارَ الإِْسْلاَمِ وَدَارَ الْكُفْرِ: أُضِيفَتَا إِلَى الإِْسْلاَمِ وَإِلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الإِْسْلاَمِ أَوِ الْكُفْرِ فِيهِمَا، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلاَمِ، وَالنَّارُ دَارَ الْبَوَارِ، لِوُجُودِ السَّلاَمَةِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَوَارِ فِي النَّارِ، وَظُهُورُ الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ إِنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ أَحْكَامِهِمَا، فَإِذَا ظَهَرَتْ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ، فَصَحَّتِ الإِْضَافَةُ، وَلِهَذَا صَارَتِ الدَّارُ دَارَ إِسْلاَمٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةٍ أُخْرَى، فَكَذَا تَصِيرُ دَارَ كُفْرٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

بدائع الصنائع ٧/١٣٠-١٣١، وابن عابدين ٣/٢٥٣، وكشاف القناع ٣/٤٣، والإنصاف ٤/١٢١، والمدونة ٢/٢٢.

وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِضَافَةِ الدَّارِ إِلَى الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ: الأَْمْنُ، وَالْخَوْفُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الأَْمْنَ إِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الدَّارِ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَالْخَوْفَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى الإِْطْلاَقِ فَهِيَ دَارُ إِسْلاَمٍ، وَإِنْ كَانَ الأَْمْنُ فِيهَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَالْخَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الإِْطْلاَقِ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ، فَالأَْحْكَامُ عِنْدَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الأَْمَانِ وَالْخَوْفِ، لاَ عَلَى الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ، فَكَانَ اعْتِبَارُ الأَْمْنِ وَالْخَوْفِ أَوْلَى.

মনে রাখতে হবে, মুসলমান যদি কুফরী আইনকে মেনে, কুফরের মূর্তিকে মেনে নেয় এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ না করে তাহলে সে কুফরের রাজ্যে আজীবনই নিরাপদ। নিরাপদ নয় তারা যারা কুফরী আইনকে লঙ্ঘন করে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়। কুফরের মূর্তিকে প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে তাহকীক করলে যদি ফলাফল দাঁড়ায় যে, এ দেশটি দারুল হারব, তাহলে আমাদের এসব রাজনীতি রাজনীতি খেলার অর্থ

কী? আমাদেরকে তো আগে পড়তে হবে দারুল হারবে একজন মুসলমানের অবস্থান করার বিধান কী এবং তার করণীয় কী?

## একটি উপসর্গ

কোন দেশকে দারুল ইসলাম বলার মত দলিল নেই, আর দারুল হারব বলার মত হিম্মত নেই এবং দারুল হারব বলার পর যা করণীয় তা শুনলে রীতিমত ...... শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সর্বকূল রক্ষা করার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে 'দারুল আমান' নামের একটি উপসর্গকে।

অথচ এটা কোন আলাদা দারের নাম নয়। এটা হচ্ছে দারুল হারবেরই একটি সাময়িক অবস্থা। আর সে সাময়িক অবস্থা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লাগবে দু'টি পক্ষ। এক পক্ষ কাফের, এক পক্ষ মুসলমান। দুই পক্ষের মাঝে একটি সাময়িক চুক্তি হবে। কিন্তু এখানে কোথায় সেই পক্ষ, কোথায় 'আমান' বিষয়ক আলোচনা? এসব কিছুই তলিয়ে দেখার দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন সাময়িকভাবে জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করা। কিন্তু জান যে আখের কোনভাবেই বাঁচবে না -এ কথা চিন্তা করার মত সময়ও নেই, মানসিকতাও নেই।

যাই হোক বিষয়গুলো তাহকীক করার জন্য আমি আবদার করছি। ইতিবাচক চিন্তা করলে আশা করি আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে উম্মত একটি ভালো দিক নির্দেশনা পাবে। আর যদি নেতিবাচক চিন্তা করা হয়, তাহলে উম্মত মাহরূম হবে। আর আমরাও সত্য গোপন করার পক্ষে উপযুক্ত কোন ওযর খুঁজে পাব না। এতে সবাই সর্বকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্তই হব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

## বিষই কেন ওষুধ হল?

ঘ. গণতন্ত্রের আবিষ্কার হলো গত কয়েক শতাব্দী আগে। আবিষ্কার করেছে ইসলামের শত্রুরা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষ যেন পৃথিবীতে নিজের হাতের তৈরি বিধান আনুযায়ী চলতে পারে। বানানো হয়েছে, মানুষ যেন তাদের সুবিধা অনুযায়ী বিধান বদলাতে পারে, সংযোজন করতে পারে, বিয়োজন করতে পারে। বানানো হয়েছে মানব সিদ্ধান্তের বিপরীতে ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেন চলতে না হয় সে জন্য।

একটি বিধান যদি সর্বসম্মতিক্রমে সবার জন্য ক্ষতিকর হয়, কিন্তু সবাই তা চায়, এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের দাবি হচ্ছে ক্ষতিকর হলেও অধিকাংশ মানুষ তা চাইলে তাই হবে। গণতন্ত্রের ফলপ্রসূতার ফলশ্রুতিতেই সমকামিতার মত সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষতিকর, মানব রুচির পরিপন্থী, মানব প্রকৃতির পরিপন্থী, সকল ধর্মের দৃষ্টিতে ঘৃণিত একটি অপকর্ম বৈধতা পেয়ে চলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী খেলাফতের মুখ দেখার জন্য সে পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল? ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সেই পদ্ধতিটিই কেন পছন্দ হল যে পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্তির সূচনা হয়েছে এবং ইসলামী খেলাফতের বিলুপ্তি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের মহাপুরুষরা কি জানে না, পৃথিবীর বুকের সর্বশেষ ইসলামী খেলাফত খেলাফতে উসমানিয়া কার হাতে, কোন শিরনামে ধ্বংস হয়েছে? যদি না জানে তাহলে এ না জানার কী বৈধতা আছে? তারা কি জানে না কামাল আতাতুর্ক কে ছিল? সে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে কী করতে চেয়েছিল? কী করেছিল? এসব লোকদের এসব বিষয় না জানার কী বৈধতা আছে?!

গণতন্ত্রের জোয়ারে ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলাম ভেসে চলে গেল। আর আমরা আশা নিয়ে বসে আছি, সে জোয়ারে আবার ইসলাম ভেসে অসবে। অথচ জোয়ারের চাবি কাঠি আগেও ইসলামের শত্রুদের হাতে ছিল, এখনো ইসলামের শত্রুদের হাতেই আছে।

## কিছু ভালো কোথায় নেই?

ঙ. গণতন্ত্রের কিছু ভালো দিকের কথা যে বলা হচ্ছে, সে দিকগুলোকে যদি ভালো হিসাবে মেনে নেয়াও হয়, তবু কি কিছু ভালোর জন্য এত খারাপে ভরা একটি বিষয়কে গ্রহণ করা যায়? পৃথিবীতে কোন খারাপ জিনিসটা এমন আছে যার কোন ভালো দিক নেই। যিনা ব্যভিচারের মধ্যেও তো দু'জন মানুষের মনোরঞ্জনের মতো একটা ভালো দিক আছে। চুরির মধ্যে একটি গরিব পরিবারের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা আছে। মদের মত খারাপের মাঝে যে কিছু ভালোও আছে সে কথাতো কুরআনেই আছে। কিন্তু তাই বলে কিছু ভালোর ভিত্তিতে কি একটি বিষয় বৈধতা পেতে পারে?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, গণতন্ত্রের মাঝে যে ভালো দিকগুলো আছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সে ভালো দিকগুলো ইসলামে আগে থেকে ছিল কি ছিল না? যদি না থেকে থাকে তাহলে তা ভালো হওয়ার যৌক্তিকতা কী, আর যদি তা ভালো মনেও হয় তবু তা গ্রহণ করার বৈধতা কী? আর যদি সে ভালো বিষয়গুলো ইসলামে আগে থেকে থেকে থাকে তাহলে সে বিষয়গুলো আমাদেরকে ইসলাম থেকে না নিয়ে গণতন্ত্র থেকে কেন নিতে হচ্ছে?

ইসলামে সে ভালো দিকগুলোর কি কোন শিরনাম ছিল না? থেকে থাকলে সে শিরনাম বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের শিরনামে তা গ্রহণ করতে হচ্ছে কেন? পতিতালয়ে যৌন মিলনের যদি কোন বৈধ ব্যবস্থা রাখা হয়, তাহলে সে বিশেষ বৈধ পদ্ধতিটি পতিতালয়ে গিয়ে কেন গ্রহণ করতে হবে? একটি পতিতালয়কে একজন মুসলমানের আনাগোনার জায়গা বানানোর বৈধতা কী?

## মুদ্রার পিঠ উল্টে দেখা হয়নি

তৃতীয় কথা হচ্ছে, আমরা মূলত গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতিটাই দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি। নির্বাচনী পদ্ধতি দেখে আমাদের মনে হয়েছে, অধিকাংশের মতেই যখন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা একটা বাম হাতের খেলা মাত্র। আর নির্বাচনী পদ্ধতির মাঝে ভয়ঙ্কর রকমের শরীয়তবিরোধী কোন ব্যাপারও নেই। আর কিছু শরীয়ত বিরোধী ব্যাপার থাকলেও ইসলামী খেলাফতের মত একটি বিশাল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখলে এ পরিমাণ শরীয়ত বিরোধী কাজ করার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত আমরা বুঝতেই পারিনি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরাই যে ইসলামী খেলাফত চায় না। এর ছোট্ট একটা কারণ এখানে বলে রাখা যেতে পারে।

মুসলমানের কোন কুফরী কর্মকাণ্ডকেই আমরা কুফর বলিনি। কুফরী কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কারণে যেসব লোক বহু আগেই ঈমান হারিয়ে বসে আছে তাদেরকেও আমরা মুসলমান হিসাবে দেখতেই পছন্দ করেছি। তাদের সামনে যখন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে তখন তারা দেখতে পেয়েছে ইসলামী খেলাফত মানে ইসলামী আইন। আর ইসলামী আইন মানেই এমন কিছু বিষয় যা তারা কখনো মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি। বহু আইনকে তারা মনে প্রাণে প্রত্যাখ্যান করে রেখেছে। তাদের কথা কাজে সেগুলো প্রকাশও পেয়েছে।

তখন যদি তাদের কুফরী কথা ও কাজের ভিত্তিতে তাদেরকে মুসলমান থেকে আলাদা করে রাখা যেত তাহলে একই সঙ্গে দু'টি ফায়দা হত। ১. বিশাল জনগোষ্ঠীকে মুসলমান ভেবে আমরা ধোঁকা খেতাম না। ২. মানুষ ঈমান ও কুফরকে আলাদা করে চিনতে পারত এবং সে হিসাবে কুফর থেকে বাঁচার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। এ হচ্ছে একটি বিষয়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমরা যে মনে করেছি নির্বাচনী পদ্ধতির মাঝে ভয়ঙ্কর রকমের শরীয়ত বিরোধী কোন ব্যাপার নেই। আমাদের এ মনে করার মাঝে ভয়ঙ্কর রকমের একটা ভুল আমরা করে ফেলেছি। গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতিতে যে অসংখ্য পরিমাণ এমন শরীয়ত বিরোধী বিষয় রয়েছে যার বৈধতা শরীয়ত কোন অবস্থাতেই দেয়নি তা আমরা খেয়াল করিনি। সুযোগ হলে সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

**এ লোক আসলেই গণ্ডমূর্খ!**

কোন কোন গণ্ডমূর্খ তো গণতন্ত্রকে খেলাফতে রাশেদার খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছে। কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রচলিত ইসলামী

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সর্বোচ্চ ভালো উদ্দেশ্য হিসাবে যদি ধরা হয়, এর মাধ্যমে জনমত যাচাই করা হবে যে, অধিকাংশ জনগণ ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হওয়াকে চায় কি চায় না। যদি এ উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর সঙ্গে খেলাফতে রাশেদার পরামর্শের কী সম্পর্ক? সেখানে কি পরামর্শের বিষয় এটা ছিল যে, দেশে ইসলামী আইন চলবে না কি মানব রচিত আইন চলবে?

যে দেশের ভোটারদের শতকরা নব্বই ভাগকে মুসলমান মনে করা হচ্ছে, সেখানে পরামর্শ চলছে, দেশ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলবে, না কি মানব রচিত আইন অনুযায়ী চলবে। একটু বলুন, মুসলমানের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাওয়ার শরয়ী বিধান কী? যে মুসলমান শরয়ী বিধানের বিপরীতে রায় দিবে তার ঈমানের ব্যাপারে ফয়সালা কী? আর সে নির্বাচনকে আমরা তুলনা করছি খেলাফতে রাশেদার পরামর্শের সঙ্গে। লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

## মানুষ মাছের মত বোকা হলে চলে না

বলছিলাম, গণতন্ত্রের নির্বাচনী পদ্ধতিটাই আমরা দেখেছি এবং সমস্যাকে হালকা মনে করে একে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী একটি ষড়যন্ত্রের জাল হিসাবে সন্দেহ করতে পারিনি। আমরা গণতন্ত্রের এ হাকীকত শুনতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে যে, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির বাইরে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব, লেনদেন সর্বক্ষেত্রে বিধান হিসাবে তাই প্রযোজ্য হবে যা অধিকাংশ জনগণ নির্ধারণ করবে। সংবিধান, আইন আদালত সব সেভাবেই চলবে যেভাবে অধিকাংশ মানুষ চাইবে। অধিকাংশ মানুষ যা চাইবে তাই হবে, ইসলামী শরীয়ত সেটাকে সমর্থন করলেও তাই হবে, সমর্থন না করলেও তাই হবে। কুরআনের আদেশ নিষেধের মোতাবেক হলেও মানতে হবে, কুরআনের আদেশ নিষেধের বিপরীত হলেও মানতে হবে। রাসূলের আদেশের মোতাবেক হলেও মানতে হবে, রাসূলের আদেশের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে।

গণতন্ত্রের এ হাকীকত গণতন্ত্রের কিতাবাদিতে আগে থেকেই ছিল। আমরা তা জানতে পারিনি বা কৌশলে সে বিষয়গুলোকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখা হয়েছিল। গণতন্ত্রের জন্ম ও বাস্তবায়নের সূচনা কাল থেকে আজো পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে এর দ্বারা কুফরী আইনগুলোই প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং যেকোন কুফরী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গণতন্ত্রের সকল দরজা খোলা রয়েছে।

## একটি স্বপ্ন

কুফরী আইনকে ঠেকিয়ে রাখার দুর্বলতম কোন ব্যবস্থাও গণতন্ত্রের কাছে নেই। গণতন্ত্রের এমন কোন ইচ্ছাও নেই। বরং বিপরীত ইচ্ছা ঘোষণার সাথে সবার সামনে বার বার তুলে ধরা হচ্ছে। এরপরও গণতন্ত্রের কুফরী পাইপ লাইন দিয়ে আমরা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও শরয়ী আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেই চলেছি। আল্লাহ আমাদের চোখের ভারি পর্দাগুলো সরিয়ে দিন।

চ. প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির অধিপতিগণ স্বপ্ন দেখছেন, ইসলামের শত্রুদের আবিষ্কার করা গণতন্ত্রের অস্ত্র দিয়ে শত্রুদেরকেই ধরাশায়ী করে ফেলবেন। শত্রুর বানানো অস্ত্র দিয়ে কখন যে হঠাৎ শত্রুকে আক্রমণ করে ফেলবেন তা শত্রু টেরই পাবে না। গণতন্ত্রের গান গাইতে গাইতে, শত্রুকে অন্যমনস্ক রেখে, শত্রুর চোখে ভেলকি লাগিয়ে অতি সন্তর্পনে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে হঠাৎ করেই ইসলামী খেলাফত ঘোষণা করে ফেলবেন। তখন শত্রু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের বানানো জালে নিজেরা আটকা পড়ার কারণে শুধুমাত্র আফসোসের আঙ্গুল কাটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

### স্বপ্নের তাবীর

এ স্বপ্নের উপর আমার কয়েকটি নিবেদন।

ক. গণতন্ত্রের জালটি ইসলামের মিত্রের তৈরি না কি ইসলামের শত্রুর তৈরি? যদি ইসলামের শত্রুর তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এ জালের গ্রন্থিগুলো এ জালের আবিষ্কারকের বেশি ইয়াদ থাকবে না কি এ জালে আটকা পড়া মাছের বেশি ইয়াদ থাকবে? তুলনামূলকভাবে শিকারী বেশি চালাক হয় না কি মাছ বেশি চালাক হয়?

একান্ত মাছ যদি বেশি চালকও হয় তবু সে তার চালাকি দিয়ে কী কী করতে পারবে? সে শিকারীকে শিকার করে ফেলতে পারবে? না কি সর্বোচ্চ সুযোগ বের করে নিজে পালিয়ে যেতে পারবে?

এ জালের আবিষ্কার, তার শিকারী এবং তাতে আটকা পড়া মাছের বয়স এখন অনেক। মুসলমান ও মুসলিম বিশ্ব এ জালে আটকা পড়ার শতবর্ষ পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ শত বছরের ইতিহাস কী বলে? ইতিহাস পড়ে সবক নেয়ার মত উপাদান কি আমাদের সামনে আসেনি? না কি রাজনীতিবিদরা রাজনীতির ইতিহাস পড়ার মত সময় পাচ্ছেন না। গাফলতের ঘুমকেও যদি লোহার হাতুড়ি দিয়েই ভাঙতে হয় তাহলে অসহায়ত্বের শেষ আর কোথায় হবে?

খ. এ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সাপ-বেজির যে খেলা আমরা দেখছি তাতে কী দেখলাম? ধীরে ধীরে গণতন্ত্র প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির খাঁচায় ঢুকছে? না কি প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি গণতন্ত্রের খাঁচায়

ঢুকছে? প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি গণতন্ত্রের লেজ কেটে কেটে শুদ্ধ করে গণতন্ত্রকে ইসলামের কাছে নিয়ে এসেছে? না কি গণতন্ত্র প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির লেজ কেটে কেটে ইসলামকে গণতন্ত্রের কাছে নিয়ে গেছে?

গ. প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির প্রভাবে গণতন্ত্রের মৌলিক ধারাগুলোর কোনটি কোনটি পরিবর্তন করা হয়েছে? আর গণতন্ত্রের প্রভাবে ইসলামের কোন কোন ধারাগুলোর মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে? প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির প্রভাবে ইসলাম কি ব্যক্তি জীবন থেকে বের হয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের উপর বিস্তার লাভ করতে পেরেছে? না কি গণতন্ত্রের প্রভাবে ইসলাম রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্যক্তির মাঝেও টিকে থাকতে পারছে না?

কথাগুলো আমি প্রশ্নের আকারেই তুলে ধরছি; কারণ এতে পাঠক একটু নিজের মত করে ভাবার সুযোগ পাবেন। নচেৎ কেউ ধারণা করতে পারে যে, লেখক পাঠকদেরকে নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত একটি গলিতে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।

## একটু বিশ্বটা দেখে আসুন

ঘ. মিসরে মুসলিম ব্রাদার হুড গণতন্ত্রের নৌকায় চড়ে গণতন্ত্রের মালিক পক্ষের চোখে ধূলা দিয়ে, সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে -এমন কোন আলামত প্রকাশ পাওয়ার আগেই গণতন্ত্রের মালিক পক্ষ ক্ষুদ্র আশঙ্কার ভিত্তিতে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সেনাপতিদেরকে লালঘরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছে এবং করতে পেরেছে। সে ক্ষেত্রে ভোটদাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে জিজ্ঞেস করারও কোন প্রয়োজন হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিজয়ী রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকার পাওয়া ক্ষমতাসীনদেরকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়নি।

এখন গণতন্ত্রের জালে আটকা পড়া প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির মাছদের সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাবে, যদি তারা প্রাণ বাঁচিয়ে কোন রকমে জেলখানা থেকে পালিয়ে যেতে পারে, বা গণতন্ত্রের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে দেশান্তর হতে পারে।

উল্লেখ্য, যে ইখলাসের উপর মুসলিম ব্রাদার হুডের জন্ম সে ইখলাস পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জন্মের মধ্যে ছিল না। যে জনসম্পৃক্ততা ও জনসমর্থন মুসলিম ব্রাদার হুড অর্জন করেছে তা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি অর্জন করতে পারেনি। যে জনশক্তি ও সমরশক্তি মুসলিম ব্রাদার হুড অর্জন করতে পেরেছে পৃথিবীর কোন প্রচলিত

ইসলামী রাজনীতি তা অর্জন করতে পারেনি। যে অভিজ্ঞতা ও ত্যাগের অনুশীলন মুসলিম ব্রাদার হুডের ছিল তা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির অর্জন হয়নি। যে সাহস ও আর্থিক সবলতা মুসলিম ব্রাদার হুডের অর্জিত হয়েছিল তা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির অর্জিত হয়নি। যে পরিমাণ বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে মুসলিম ব্রাদার হুড পরিচালিত হত তার শত ভাগের এক ভাগও পৃথিবীর অন্যান্য প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির তত্ত্বধান করেনি। মুসলিম ব্রাদার হুড আন্তর্জাতিকভাবে মুসলমান ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের যে পরিমাণ আস্থা অর্জন করেছিল, সে পরিমাণ আস্থা পৃথিবীর কোন প্রচলিত ইসলামী রাজনীতি তার দেশেও অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু!

মুসলিম ব্রাদার হুড তার জন্মলগ্নের মূল মানহাজ ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আর সে মানহাজ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস-ফিকহ তথা ইসলামী শরীয়ার বিধি-বিধানকে জিজ্ঞেস করেনি। গণতন্ত্রের জালে প্রবেশ করে গণতন্ত্রের আবিষ্কারকদেরকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং পদে পদে শরীয়তের নির্দেশিত পথকে লঙ্ঘন করেছে। কুফরী শক্তির সঙ্গে মুসলিম শক্তির যা করণীয় ছিল সে রোডম্যাপকে উপেক্ষা করে তারা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। দলিল প্রমাণসহ তার বাস্তবতা বিশ্বের সামনে ও মুসলিম উম্মাহর সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

### সফলতার মাপকাঠি

দেখুন, কোন আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা কখনো বাহ্যিক সফলতা ও ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সফলতা ও ব্যর্থতা যার উপর নির্ভর করে তা হচ্ছে, সে আন্দোলন ও পদক্ষেপ শরীয়তের নীতি ও উসূল মোতাবেক হচ্ছে কি না? তার উপর। যে বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস তথা ইসলামী শরীয়তে সর্বস্বীকৃত নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সে নীতিগুলোকে উপেক্ষা করে এবং সেসব নীতিকে মাপকাঠি না বানিয়ে সফলতা ও ব্যর্থতার হিসাব মিলাতে যাওয়া কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না।

আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী রাজনীতিগুলো মুসলিম ব্রাদার হুডের রাজনীতির ইতিহাসের প্রভাবেই উজ্জীবিত। কেউ সে আদর্শকে চার হাত পা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, আর কেউ পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির একেকটি দল অপর দলের যে নীতিগুলোর প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছে, কিছুকাল পরেই প্রয়োজনের তাগিদে সে নীতিকেই আবার আঁকড়ে ধরেছে, পারলে দু'চার কদম অগ্রসর হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। এক্ষেত্রে কোন নীতির সমালোচনা করার সময়েও

শরীয়তের মাপকাঠিকে সামনে রাখা হয়নি, আবার সমালোচিত কোন নীতিকে গ্রহণ করার সময়েও শরীয়তের মাপকাঠিকে সামনে রাখা হয়নি।

তবে এ দলগুলো যে বিষয়ে কখনো দ্বিমত করেনি তা হচ্ছে, তারা গণতন্ত্রকে কুফর বলে সে কুফর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি। বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে পৃথিবীর সকল মুসলমানের মনে গণতন্ত্রকে একটি বস্তুনিষ্ঠ বিষয় ও ইসলামবান্ধব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের এমন কোন বিধান মানার জন্য মুসলমানের মন তৈরি নয় যাকে গণতন্ত্র সমর্থন করে না। অথচ সবাই গণতন্ত্রের এ শক্তির কথা জানে যে, গণতন্ত্র চাইলে বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট অপকর্মকেও শুধু বৈধ নয়; বরং ফরয হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারে এবং গণতন্ত্রের জন্ম থেকে সে তা করে চলেছে।

### স্বপ্নের ভগ্নাংশের তাবীর

ঙ. এ স্বপ্নেরই একটি ভগ্নাংশ হচ্ছে, এ রাজনীতির মাধ্যমে সুকৌশলে দেশের মালিক পক্ষকে দ্বীন বোঝানো হবে এবং তাদেরকে ইসলামবান্ধব করে তোলা হবে। তাদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসকে বহাল রেখেই তা বোঝানো যাবে বলে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কিছু কৌতুকপ্রদ ঘটনাও ঘটে চলেছে।

দেখানো হচ্ছে, আবু জাহলের দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত শত বার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন সে বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বনূ কুরাইযার ছয় থেকে আটশত কাফেরকে যে এক দিনে জবাই করে দেয়া হয়েছিল সে ঘটনা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা চলছে যে, একটি বিষয় জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগের, আর আরেকটি বিষয় জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের।

ইবরাহীম আলাহিস সালাম তাঁর কাফের বাবার জন্য দোয়া করবেন বলে ওয়াদা করেছেন বলে কুরআনে যে উল্লেখ এসেছে সে বিষয়টিকে বার বার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এ বিষয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরবর্তী ও সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত কুরআনে বিবৃত হয়েছে وَمَا كَانَ

اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) তা বেমালুম ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'রাহমাতুন লিল আলামীন' সিফত ও উপাধিটি সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কিন্তু এরই সাথে উল্লিখিত 'কাফেরদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন' গুণ সম্বলিত مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) আয়াতটির কথা একেবারেই ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

## খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধারের ব্যবধান

আর বিশেষভাবে যে বিষয়টি সবাই মিলে ভুলে গেছে এবং অন্যদেরকে ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, খেলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও খেলাফত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের কথা। কুরআন, হাদীস তথা ফিকহের সিদ্ধান্তের আলোকে এ দু'টির মাঝে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে তা আমরা ভাবতেই প্রস্তুত নই। যারফলে ইসলামী খেলাফত পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ সামনে আসলেই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন থেকে উদ্ধৃতিগুলো তুলে ধরতে আগ্রহবোধ করি। এর বিপরীতে খেলাফত টিকিয়ে রাখা ও খেলাফত পুনরুদ্ধার বিষয়ক হাদীসগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্যকে এড়িয়ে যেতে আমাদের সামান্যতম দ্বিধাও হয় না। আবার মক্কী জীবনের প্রক্রিয়াকেও আমরা নিজের মত করে সাজাতেই বেশি পছন্দ করি।

যারফলে সুস্পষ্ট ইরতিদাদ যেখানে রয়েছে সেখানে আমরা মক্কী জীবনের দাওয়াতের উদ্ধৃতিগুলো তুলে আনছি। সে ক্ষেত্রেও যদি আপত্তি করা হয় যে, মক্কী জীবনেতো কুফরকে কুফর বলা হয়েছে এবং কুফরে পতিত ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়েছে, এখন কেন দাওয়তের ক্ষেত্রে কুফরকে কুফর বলা হচ্ছে না এবং কুফরে পতিত ব্যক্তিকে কাফের বলা হচ্ছে না? সে ক্ষেত্রে হেকমত ও কৌশল নামের বায়বীয় একটি ফানুস ওড়ানো হয় যার অস্তিত্ব মক্কী জীবনেও ছিল না।

ফলাফল দাঁড়িয়েছে, মাদানী জীবন থেকে বাঁচার জন্য মক্কী জীবনের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, আবার মক্কী জীবন থেকে বাঁচার জন্য মাদানী জীবনের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। যার দরুন স্বপ্নের তাবীর আর হয়নি।

## আখের হেকমতের শেষ কোথায়?

চ. সাবেক রাজনৈতিক দলের যে ভুলের কারণে নতুন নতুন দল তৈরি করতে হচ্ছে, সে ভুলকেই শত সহস্র গুণ বাড়িয়ে অনুশীলনের মহড়া চলছে। কোন রাজনৈতিক দল নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকলে প্রত্যাখ্যানকারী দল কুফরী নেতৃত্বকে সমর্থন করে চলেছে। কোন রাজনৈতিক নেতা নারীর সঙ্গে ইফতার করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকলে প্রত্যাখ্যানকারী নেতা নাস্তিক মুরতাদের সঙ্গে নামাযের মুসাল্লায় কোলাকুলি করাকে গুনাহ মাফের উসিলা হিসাবে গ্রহণ করে চলেছে।

কোন রাজনৈতিক দল মুনাফিক কাফের দলের সমর্থন করার কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকলে প্রত্যাখ্যানকারী দল কাফেরে মু'লিনকে সমর্থন করে চলেছে। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাদের ৪০/৪৫ বছর বয়সী অর্ধশিক্ষিত নেতার বিরোধিতা করার করণে বিরোধীদেরকে বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করে থাকলেও তারা বিরোধিতা করে চলেছে ৮০/৯০ বছর বয়সী ওলামায়ে কেরামের জামাতের। এ এক অদ্ভুত পৃথিবী। অদ্ভুত পৃথিবীর সব প্রাণী। দু'পা নিয়ে চার পায়ের যোগ্যতা, মুহাম্মদের উম্মত হয়েও খিযিরের ঢেকুর। নাট্যলিলা বড়ই উপভোগ্য।

সমস্যা হচ্ছে আগেরটাই। প্রত্যাখ্যাত ও প্রত্যাখ্যানকারী কেউ কোন উদ্ধৃতি ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করছে না। শরীয়তের ফয়সালার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার সময় পাচ্ছে না। সে ফয়সালা জানার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে না। **পদ্ধতিটা আগের মতই** وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣)। **আবার নতুন আঙ্গিকে মঞ্চস্থ** হয়েছে।

কোন বিষয়ে উদ্ধৃতি চাইলে উত্তর নির্ধারিত, বড়রা কি কুরআন কম বোঝেন? হাদীস ফিকহ কি তারা কম বোঝেন? কিন্তু বড় বলে যে কাকে বোঝানো হয়েছে? তা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ বড় হিসাবে যাদের নাম এসেছে তাঁদের কাছেও আমরা একই উত্তর পেয়েছি।

যাই হোক, এসব বহু পুরাতন কথা। এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারি। এবারের প্রসঙ্গ খতম।

# সহীহ বুখারী ও ফাতওয়া শামীর খতম

কারো কারো কাছে নতুন মনে হতে পারে। তবে বিষয়টি অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। কারো ধারণা মতে এতটাই পুরাতন হয়ে গেছে যে, একে আর বিদআত বলা চলে না। কারণ, বিদআত হচ্ছে নতুন আবিষ্কার। আর কোন পুরাতনকে নতুন আবিষ্কার বলা বোকামী। অনেকের কাছে একটি বিদআত হলেও আরেকটি বিদআত নয়। কারণ, একটির মাঝে হাজার তালাশ করেও কোন নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব দু'টিকে এক পাল্লায় মাপা যাবে না। যাইহোক বড় ছোটর তফাতটা এ ক্ষেত্রেও দেখে নেয়া চাই।

## বড়

সমস্যা যদি স্বাভাবিক ধরনের হয় তাহলে কুরআন খতম করলেই চলবে। সমস্যা একটু অস্বাভাবিক হলে এবং সাহেবে দাওয়াতের হিম্মত যদি ভালো হয় তাহেল বুখারী খতম করা চাই। আর সমস্যা একটু ব্যতিক্রম হলে ফাতওয়া শামীর খতমে বেশি উপকার হওয়ার আশা করা যায়।

বলাবাহুল্য, পর্যাক্রমে কুরআন খতম শিশুদের মাধ্যমেও করে ফেলা যায়। বুখারী খতমের জন্য স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষিত প্রয়োজন হয়। আর ফাতওয়া শামী খতম করতে হলে এসব ডিগ্রিতে চলে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই উপকারিতা ও খরচের মাঝে বিস্তর ব্যবধান হয়ে যায়। উপকারিতা ও মেহনতের ব্যবধানের কারণে এর খরচের তারতম্যের কথাটি বুঝিয়ে বলতেও হয় না। গ্রাহক মাত্রই তা বুঝে নেয় এবং বুঝে শুনেই ইজাব-কবুল হয়।

## ছোট

পরিভাষায় যাকে 'কুরআন খতম' বলা হয় সে খতমের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করবে এবং এর জবাব দিতে হবে সে প্রস্তুতি আমাদের নেই। কিন্তু কোন কিতাব কেন নাযিল হয়েছে এবং কোন কিতাব কেন লেখা হয়েছে সেসব আলোচনা এখন বৃথা। আমরা এখন কোন কাজে লাগাচ্ছি সেটাই হল বাস্তবতা। উম্মতের ঐক্যমত এখন কোন কথার উপর সেটাই দেখার বিষয়।

শায়খ আবুল হাসান আলি নদভী রহ. এক প্রসঙ্গে বলেছেন 'কুরআন এখন শুধুই মৃত ব্যক্তিদের জন্য, জীবিতদের জন্য তাতে কিছু নেই'। অর্থাৎ

কুরআনের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস এ পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। এ পরিস্থিতিতে ছোটদের মনে যে কয়েকটি বিষয়ে খটকা রয়েছে সেগুলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে-

ক. কুরআন খতম। খ. সহীহ বুখারী খতম। গ. ফাতওয়া শামী খতম। ঘ. ইফতেতাহে বুখারী। ঙ. ইখতেতামে বুখারী। চ. দরূদে নারিয়ার খতম। ছ. খতমে জালালী। জ. মরে যাওয়ার দোয়া খতম।

**ক. কুরআন খতম**

কুরআন খতম করার কথা হাদীসে আছে। খতমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সে খতম আমাদের পরিভাষায় যাকে কুরআন খতম বলা হয় সে খতম নয়। হাদীসে উল্লিখিত খতম হচ্ছে, দৈনন্দিন ধারাবাহিক তিলাওয়াতের মাধ্যমে খতম করা। হাদীসের মধ্যে এর জন্য এক মাসের একটি স্বাভাবিক সময়ের কথা বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদীসে বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। তিনি বলেন-

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله. قال: «فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. لا صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صم كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر» . قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: " صم أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم وإفطار يوم. واقرأ في كل سبع ليال مرة ولا تزد على ذلك " ٢٠٥٤ -[١٩] (متفق عليه)

এর দ্বারা কখনো এক বসায় বা এক দিনে যে খতমে কুরআন করা হয়, বা অনেকে মিলে এক খতম করা হয় তার কথা বলা হয়নি; বরং অন্যান্য হাদীসে এর বিপরীত কথা রয়েছে। যেমন এক হাদীসে এসেছে-

وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه» ٢١٩٠ -[٤] (متفق عليه)

আরেক হাদীসে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» . (رواه الترمذي وأبو داود والدارمي)

এর দ্বারা হাদীস নির্দেশিত খতমে কুরআনের একটি চিত্র আমরা অবশ্য পাই।

এছাড়া কুরআনের ভাষ্যমতে কুরআন তিলাওয়াতের একটি মৌলিক উদ্দেশ্যও আছে, যা কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤). سورة محمد.

তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদাব্বুরে মাআনী ও অর্থ বোঝা ছাড়া তিলাওয়াত করলেও তিলাওয়াতের সাওয়াব রয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হাদীসের ভাষ্য এ বিষয়ে স্পষ্ট। এখানে শুধু এ কথা দাবি করা হচ্ছে যে, কুরআন খতম বর্তমানে যে পরিভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, এ পরিভাষাটি নতুন। হাদীসের পরিভাষায় কুরআন খতম ও বর্তমানে ব্যবহৃত পরিভাষায় কুরআন খতম এক নয়। তাই এ কুরআন খতমকে মাসনূন কোন তরিকা বলার সুযোগ নেই।

তবে যে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই তা হচ্ছে, যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত বড় ধরনের একটি সাওয়াবের কাজ এবং এর শুধু তিলাওয়াতের উপরই প্রতি হরফে দশ নেকীর ওয়াদা রয়েছে, সেহেতু কুরআন খতম করা মানেই হল একটি বড় ধরনের নেক কাজ সম্পন্ন করা। এমন একটি নেক কাজের উপর দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা খুবই স্বাভাবিক গতির একটি আশা। এতে দোষের কিছু নেই। দোয়া করা উচিৎ এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা উচিৎ।

## সতর্ক থাকা শরয়ী দায়িত্ব

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী তা হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াতের যে আদাবগুলো হাদীসে বলা হয়েছে সে আদাবগুলো যেন রক্ষা করা হয়। তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য যেন সহীহ হয়। প্রচলিত খতমের কারণে কুরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেন মানুষ ভুলে না যায়। জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবান অংশটি যেন শুধু এর পেছনে ব্যয় না হয়ে যায়।

এর কারণে বদদ্বীন যেন দ্বীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। কুরঅনের বাহকরা যেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ বিস্মৃতির সহযোগী না হয়ে যায়। মূল উদ্দেশ্যের দিকে ডাকলে বা মূল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও যেন তাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি না হয়। সর্বোপরি কুরআন যেন বাজারের আলু ও টমেটোর মত ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত না

হয়। কুরআনের এ খতম যেন হামেলে কুরআনকে কুরআন ব্যবসায়ী বানিয়ে না তোলে।

এতো গেল কুরআন খতমের বিষয়টি। এবার আলোচনা করা যায় বুখারী খতম নিয়ে।

### খ. সহীহ বুখারীর খতম

কুরআনের মত সহীহ বুখারীর খতমের বিষয়ে ছোটদের মনে ছোট্ট একটি খটকা রয়েছে। খটকাটিকে জিইয়ে না রেখে দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রচলিত পরিভাষার কুরআন খতমকে যেসব কারণে শর্তহীনভাবে বিদআত বলা হয়নি বা বিদআত বলার সুযোগ নেই সে কারণগুলো সহীহ বুখারীর খতমের ক্ষেত্রে কতটুকু উপস্থিত ও কতটুকু প্রযোজ্য? এটি যদি দোয়া কবুলের জন্য একটি আমল হয়ে থাকে তাহলে এর উৎপত্তি কবে থেকে? এ কিতাবের জন্ম ওহির জীবনের কমপক্ষে দুই শত বছর পর। এটিকে একটি আমলে পরিণত করার জন্য যা দরকার তা কি এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব?

খটকাটি গাঢ় হয়ে যায় যখন أصح الكتب بعد كتاب الله উপাধিতে ভূষিত কিতাবটিকে أصح الكتب قبل كتاب الله (নাউযুবিল্লাহ) এর মানে উন্নীত করা হয়। কেউ মনে করতে পারেন যে, এমন দাবিতো কেউ করেনি। তাই এটি একটি অপবাদ এবং একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। কিন্তু খটকাতো লেগে গেছে, তাই খটকা লেগে যাওয়া এবং এমন সন্দেহ করার পেছনে যে বিষয়গুলো কাজ করে তা নিয়ে মতবিনিময় করা যেতে পারে। যে কারণগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

ক. খতমের বাজারমূল্য হিসেবে কুরআন খতমের মূল্য হচ্ছে এক হাজার থেকে তিন হাজার বা তার চাইতে কিছু বেশি। পক্ষান্তরে সহীহ বুখারীর খতম বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত বা তার চাইতে কিছু কম বা কিছু বেশি।

খ. তুলনামূলক ছোট খাট সমস্যা সমাধানের জন্য বা ছোট খাট আশা পূরণ করার জন্য কুরআন খতম করানো হয়। এরই বিপরীত বড় সমস্যার সমাধানের জন্য বা বড় আশা পূরণ করার জন্য বুখারী খতমের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গ. কুরআন খতম সাধারণত নাবালেগ বাচ্চাদের মাধ্যমেও সেরে ফেলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। আর বুখারী খতম বড়রাই করতে হয় এবং বাস্তবে তা ছোটদের দ্বারা সম্ভবও নয়। একান্ত ব্যস্ততা না থাকলে বড়রা নিজেরাই তা করে থাকেন।

ছোটদের যে জায়গাটায় খটকা তা এখানেই। খতমে কুরআনের এ পরিভাষা যেখানে নেই সেখানে খতমে বুখারী পর্যন্ত আমরা কীভাবে পৌঁছে গেলাম? দুনিয়াবী উখরবী কোন সমস্যা এমন আছে যার সমাধানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবস্থা দিয়ে যাননি।? যার দরুন সমস্যার সমাধান সেখানে তালাশ না করে এ কঠিন থেকে কঠিন পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে যে দলিলগুলো উপস্থাপন করা হয়, সেসব দলিল দিয়ে কি আসলেই বুখারী খতমের মত একটি আমল আমল হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে? বাকি থাকে অভিজ্ঞতার কথা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এর দ্বারা ফায়দা হয়। এখন এই অভিজ্ঞতা যদি একটি আমল আমল হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য মাপকাঠি হয়, তাহলে এরকম আমলের সংখ্যা কত দাঁড়াবে। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাইতো অভিজ্ঞতা। তখন এ অভিজ্ঞতাভিত্তিক আমলের ভিড়ের মধ্য থেকে হাদীসের আমলগুলোকে কি খুঁজে বের করা যাবে? বর্তমানে হাদীসে বর্ণিত আমলগুলো কি খুঁজে বের করা যাচ্ছে? আর অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা কি এখানে থামানো যাবে? থামানো কি গেছে?

### গ. ফাতওয়া শামীর খতম

থামানো যায়নি। আর সে কারণেই দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনাবলীও খতমের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। ফাতওয়া শামীর খতম চলছে। ফাতওয়া শামীর গবেষক ও গবেষকদের প্রধানের নির্দেশনায় চলছে। ইবাদতের তালিকায় ফাতওয়া শামীর তিলাওয়াত?! এবং শুধু তিলাওয়াত?!

সহীহ বুখারী খতমের তালিকায় প্রবেশ করলে, ইবাদতের স্থান দখল করলে খতম ও ইবাদতের তালিকায় প্রবেশ করবে আরো শত শত কিতাব। আর ফাতওয়া শামী ইবাদত ও খতমের তালিকায় প্রবেশ করলে প্রবেশ করবে আরো লক্ষ লক্ষ কিতাব। আর এভাবেই ইবাদতের গোলা যখন উম্মতের রচনাবলীর শুধু তিলাওয়াতে ভরে যাবে, তখন সে গোলায় আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতের ইবাদত আর জায়গা পাবে না। পাচ্ছে না।

আর যখন কুরআন ও হাদীসের শুধু তিলাওয়াত ইবাদতের গোলাকে ভর্তি করে ফেলবে তখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কালাম নিয়ে তাদাব্বুর করার ইবাদত সে গোলায় প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালামে যেসব বিধি-বিধানের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোতো স্থান পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। স্থান পাচ্ছেও না।

ফাতওয়া শামীর পাঠকদের কাছে কি ইবাদতের কোন সংজ্ঞা নেই? সে সংজ্ঞাটি জানতে খুব ইচ্ছা করে। সে সংজ্ঞার আলোকে উম্মতের রচনাবলী শুধু তিলাওয়াত করা কিভাবে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয় তাও জানতে খুব ইচ্ছা করে। ইলম শেখা একটি ইবাদত -এর উপর ভিত্তি করে কি বলা যাবে যে, ফাতওয়া শামীর তিলাওয়াত একটি ইবাদত? ছোটদের মনের এ খটকা দূর করা বড়দের দায়িত্ব।

দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ যে বিষয়গুলোকে বিদআত হিসাবে আখ্যায়িত করে আসছে, সেগুলোকে যে মূলনীতির আলোকে বিদআত বলা হয়েছে সে মূলনীতির আলোকে সহীহ বুখারীর খতম এবং ফাতওয়া শামীর খতম এমনিভাবে এ ধরনের আরো যেসব খতম রয়েছে সেগুলোকে কেন বিদআত বলা যাবে না? দারুল ইফতাগুলোতে কমপক্ষে এ বিষয়ক ইস্তিফতা করার দরজাগুলো খোলা থাকা চাই। আপনাদের অবর্তমানে এ প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলে সাধারণ মুসলমান আমাদেরকে ছাড়বে না। তারা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। আর আমরাই বা এর জবাব না দিয়ে ইলমের যিম্মাদারী আদায়ের দাবি কীভাবে করব?

## ঘ. ইফতেতাহে বুখারী

বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক রাখলে বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়তো ছিল না। কিন্তু কোন স্বাভাবিক বিষয়কেই আমরা স্বাভাবিক রাখি না। রাখতে পারি না। সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট ছিল যে, আমরা বলার সময় কিতাবটিকে সহীহ কিতাব বলে উল্লেখ করব এবং সহীহ কিতাব হিসাবে বিশ্বাস করব।

আরেকটু বাড়াতে চাইলে, এর যে কোন হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে শুধু এ কিতাবের নাম উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করব। আমরা মনে করব যে, হাদীসটি সনদের বিচারে আমলের যোগ্য। কিতাবটির মুসান্নিফ যা করেছেন তা আমার জানামতে এটাই। তাই আমরা আমাদের কথা ও বিশ্বাসকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আমানতের খেয়ানতেরও কোন আশঙ্কা ছিল না এবং অতিরঞ্জনের অপবাদেরও শিকার হতাম না। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি।

আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, অতিরঞ্জন করবই, তখন আমরা এর সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। আর সহীহ বুখারীর মকাম ও মর্যাদা প্রমাণ করতে গিয়ে একই সঙ্গে ভিত্তিহীন কাহিনী তৈরি, কল্পনা বিলাসিতার উর্ধ্বগতি, অপরের তানকীস ও সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে জড়িয়ে পড়েছি। বিষয়গুলো আজ একটু খুলে খুলেই বলার ইচ্ছা করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা যে কাজগুলো করছি তা যথাক্রমে:

**১. ইফতেতাহে বুখারী:**

কোন দাওরা হাদীস পর্যন্ত মাদরাসার যখন সবক উদ্বোধন হয় তখন আমরা এর শিরনাম 'ইফতেতাহে দরস' না দিয়ে আমরা এর নাম দেই 'ইফতেতাহে বুখারী'। যে মাদরাসায় কুরআনের সবক উদ্বোধন হবে, তাফসীরের দরসের উদ্বোধন হবে, হাদীসের আরো আট-দশটি কিতাবের উদ্বোধন হবে, ফিকহের দরসের উদ্বোধন হবে সে মাদরাসায় ব্যাপক একটি পরিভাষা ব্যবহার না করে আমরা একটি কিতাবের নামে সবক উদ্বোধন করে থাকি। যারফলে অশিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত মানুষগুলো জানতে পারে যে, মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের মাঝে একটি মাত্র কিতাবই আসল কিতাব যার নাম সহীহ বুখারী।

পাঠক একটু ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের সথে থাকলে এর সমস্যাগুলো দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। যদি আগে না দেখে থাকেন।

**২. শায়খুল হাদীস:**

সহীহ বুখারীর উস্তাযকে আমরা নাম দিয়েছি শায়খুল হাদীস। বাকি আট-দশটি হাদীসের কিতাবের উস্তাযকে শায়খুল হাদীস বলতে আমরা রাজি নই। পরিভাষা নিয়ে কোন বিতর্ক করার সুযোগ নেই এ মূলনীতির সুযোগে আমরা অন্যায়গুলো করে চলেছি। কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি যে, পরিভাষাটিকে আমরা এতটাই লোভনীয় করে তুলেছি যে, এর প্রাপ্তির জন্য আমরা জান কুরবান দিতে প্রস্তুত হয়ে আছি। আবার এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে মুসাবাকা ফিল খায়রাত হিসাবে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি।

**৩. শায়খুল হাদীসের বেতন:**

বাকি আট-দশটি হাদীসের কিতাবের বেতনের তুলনায় সহীহ বুখারীর উস্তাযের বেতন থাকে সাধারণত দুই গুণ, তিন গুণ। কখনো কখনো অসম্ভব রকমের গুণ। যারফলে যাঁরা হাদীসের অন্যান্য কিতাব পড়ান তাঁরা এবং সবাই এমন একটি ধারণা তৈরি করে নেন যে, সহীহ বুখারী যেমন মানবীয় সীমা পরিসীমার বাইরের একটি কিতাব তেমনিভাবে এ কিতাবের উস্তাযও মানবীয় সীমাবদ্ধতার অনেক ঊর্ধ্বে। তখন আরো হাজারো ফরিযাকে অতিক্রম করে সে অবস্থানটি অর্জন করার জন্য লবিংজাতীয় পথগুলোও খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়।

**৪. ত্রিশ পারায় বন্টন:**

অনেক ক্ষেত্রেতো একে কুরআনের উপর স্থান দেয়া হয়েছেই, সাথে সাথে কুরআনের সাদৃশ বজায় রাখার জন্য কিতাবটিকে কুরআনের আদলে

ত্রিশ পারায় বন্টনও করা হয়েছে। অবশ্য এ বন্টন খতমের সুবিধার্তেও করা হতে পারে।

### ৫. অধ্যায়ে অধ্যায়ে বন্ধন:

সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ের পর যে আরেকটি অধ্যায় আসবে তার সঙ্গে আগের অধ্যায়ের সম্পর্ক কী -এ বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করেও তা শেষ করা যাচ্ছে না। কৌতুকপ্রদ কিছু ঘটনাও এ ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। কিন্তু সবাই মনে করে যাচ্ছে, এটাই নিয়ম, এটাই পদ্ধতি।

একটি ঘটনা এখানে না বললেই নয়।

ইফতেতাহ বা ইখতেতাম এখন মনে নেই। বিদেশী মেহমান আলোচনার এক পর্যায়ে অধ্যায়ে অধ্যায়ে মিল সম্পর্কে আলোচনা করে চলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুল হজ্ব আগে উল্লেখ করে কিতাবুস সাওম পরে কেন উল্লেখ করেছেন এর উপর ঘন্টা দেড় ঘন্টা  আলোচনা করেছেন। যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে যদি কিতাবুস সাওম আগে হয়ে কিতাবুল হজ্ব পরে হতো তাহলে মস্ত বড় ভুল হয়ে যেত। অনেক গভীরভাবে চিন্তা করেই ইমাম বুখারী কিতাবুল হজ্ব আগে এনেছেন এবং কিতাবুস সাওম পরে এনেছেন।

কিন্তু এ বিষয়ক আলোচনার শেষে তিনি যে কথাটি বললেন তা শুনে আমাদের মত ছোটরা রীতিমত জিহ্বায় কামড় দিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেছেন, কোন কোন নুসখায় (কপিতে) কিতাবুস সাওম আগে এসেছে এবং কিতাবুল হজ্ব পরে এসেছে। সে নুসখা হিসাবে সামঞ্জস্য সাধনের আলোচনা আরেকটা হবে। তাঁর উর্দূ ইবারতটি সম্ভবত এমন ছিল, 'কেসী কেসী নুসখে মেঁ কিতাবুস সাওম পহলে আওর কিতাবুল হজ্ব বাদ মেঁ হ্যাঁ। উস ওয়াক্ত তাতবীক কী তাকরীর দোসরী হোগী'।

পাঠক মনে হয় বুঝতে পারেননি যে, এখানে আমার পেরেশানীর বিষয়টি কী? পেরেশানীর বিষয় হচ্ছে, আগের বয়ানের মূল বিষয়ই ছিল হজ্ব আগে ও সাওম পরে হওয়ার মাহাত্ম্যের বর্ণনা। এখন অন্য কপিতে যদি সাওম আগে ও হজ্ব পরে হয় এবং তাতবীকের তাকরীর ভিন্ন হয় তাহলে সে দ্বিতীয় তাকরীর ও বয়ানটি কি আগের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত হবে না? এ ক্ষেত্রে দু'টি বয়ানের কমপক্ষে একটি কি অবশ্যই ভুল হবে না? এবং এমন ধারণা কি করা যায় না যে, তাতবীকের এ তাকরীরগুলো কোন তথ্য নির্ভর নয়; বরং কল্পনার ঘোড়দৌড় থেকে অর্জিত। আর এর পেছনেই আমাদের এত আয়োজন।

একজন লিপিকার কপি নকল করতে গিয়ে একটি আগে হয়ে গেছে আর আরেকটি পরে হয়ে গেছে -এর জন্য বিপরীতমুখী এমন তাকরীর আমরা দিয়েও চলেছি এবং নিয়ে চলেছি। কারণ কিতাবটি সহীহ বুখারী।

### ৬. তরজমাতুল বাবঃ

সহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাব নিয়ে আমরা অসম্ভব রকমের পেরেশানী যাহির করছি। আমার মনে হয় এ নিয়ে মাতামাতি একটু বেশি হয়ে গেছে। তরজমাতুল বাবের সঙ্গে হাদীসের মিল খুঁজে না পওয়ার কয়েকটি করণ থাকতে পারে, যার কোনটিই এমন নয় যার কারণে হাদীসের অন্যান্য কিতাবের উপর সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে।

আবেগ তাড়িত না হয়ে একটু শুনুন। এ সহজ কথাগুলো আজ কেন বলতে হচ্ছে তাও আমি ইনশাআল্লাহ বলব। বড়রা কী কী করে চলেছেন, আর সে কারণে ছোটরা কোন কোন সমস্যার শিকার হচ্ছে তা বলব।

তরজমাতুল বাবের সঙ্গে হাদীসের মিল খুঁজে না পওয়ার কারণ হতে পারে যথাক্রমেঃ ১. ইবারাতুন নাসসের স্থলে ইশারাতুন নাস, ইকতিযাউন নাস বা দালালাতুন নাসসের ভিত্তিতে মাসআলা ইস্তিম্বাত করার কারণে। ২. মুসান্নিফের অস্পষ্টতা জনিত দুর্বলতার কারণে। ৩. তিনি তরজমাতুল বাবে যে দাবি করেছেন তার পক্ষে হাদীস না পেয়ে অন্য এমন হাদীস উল্লেখ করার কারণে যে হাদীসে তাঁর দাবির পক্ষে কোন কথা নেই।

উদাহরণসহ বিষয়গুলো দেখানোর মত ব্যবস্থা আমার কাছে আছে। কিন্তু এ লেখার সঙ্গে তা খাপ খাবে না বিধায় সে দিকে গেলাম না।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এ বিষয়গুলোকে আমরা এমনভাবে উপস্থাপন করতে পছন্দ করি যাতে বোঝা যায়, এখানে অলৌকিক কোন ব্যাপার ঘটেছে। আর এর মাঝে যত অলৌকিকত্ব ফুটিয়ে তোলা যায় ততই কিতাব, মুসান্নিফ ও পাঠদানকারী উস্তাযের শান বাড়তে থাকে। এসব কপটতার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতিরঞ্জনের মাত্রা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, দাবি করা হচ্ছে, শত শত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেও আজ পর্যন্ত সহীহ বুখারীর তরজমাতুল বাবের হক আদায় করা যায়নি। আর যবানে হাল যেন বলতে চায় وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ হলেও তা হবে না।

### ৭. হাজার রকমের তাতবীকের খোঁজেঃ

সহীহ বুখারীর একেকটি বিন্দু বিন্দুর মাহাত্ম্য ও রহস্যের খোঁজে আমরা ফিরে চলেছি দিনের পর দিন। শুরু শেষের মিল, বর্ণনাকারী বর্ণনাকারীতে মিল, শব্দে শব্দে মিল, অক্ষরের পরিমাণে মিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল বক্তব্য বা আমলের উল্লেখ এসেছে তখন তা থেকে চলমান জীবনের আদেশ নিষেধগুলো বের করা ও তা বাস্তবায়ন করার সময় পাইনি। ইলম শেখা ও শেখানো যে ফরয আমল সে দায়িত্ব আমরা কীভাবে আদায় করছি তা ভাবার মত সময় কি এখনো হয়নি?

### ৮. সহীহ'র চাইতেও বেশি কিছু:

সহীহ বুখারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. যা দাবি করেননি এমন কিছু দাবিও আমরা তাঁর পক্ষ থেকে করে চলেছি। একেকটি হাদীস তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সরাসরি অনুমতি নিয়ে নিয়ে লিখেছেন এমন উপাখ্যানও আমরা শুনিয়ে চলেছি। সহীহ হাদীসকে সহীহ বুখারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার মত বক্তব্য আমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

ইফতেতাহে বুখারীর অনুষ্ঠানেই আমরা ঘন্টাব্যাপী বয়ান করে চলেছি যে, সহীহ হাদীস নির্বাচনের এমন মাপকাঠি আর হতে পারে না। পৃথিবীর কোন ধর্ম আজো পর্যন্ত এমন নমুনা দেখাতে পারেনি।

অথচ আমরা তারাই যারা হাজার বছরের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেও মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে রাখতে পারার মত অসম্ভব রকমের প্রতিভার অধিকারী। কোন মিথ্যুকের বক্তব্যকে রাসূলের হাদীস বলে বয়ান করতে আমাদের বুক সামান্যও কাঁপে না। জানার পরেও নয়। বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও নয়। সে মজলিসেও নয় যে মজলিসে সহীহ হাদীসের মকাম ও মর্যাদা বয়ান করা হয়েছে। হাদীস ও সনদের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পরও সে মজলিসেই ভিত্তিহীন ঘটনা ও হাদীস বর্ণনা করতে আমাদের সামান্যতম দ্বিধা হয় না। তখনই ছোটদের খটকা লাগে, তাহলে এতক্ষণের বয়ান আসলে কেন করা হয়েছে?

### ৬. ইখতেতামে বুখারী

সহীহ বুখারীর সূচনা যেমন ঘটা করে করা হয়েছে তার সমাপ্তিও সেভাবেই করা হচ্ছে। এটাই নিয়ম। সহীহ বুখারী এমনি এমনি শেষ করে ফেললে চলে না। যে উস্তায সহীহ বুখারীর সবগুলো হাদীস পড়িয়েছেন তিনি শেষ হাদীসটি আর পড়াতে পারেন না। অথবা সে উস্তায শেষ হাদীসটি পড়ালে সহীহ বুখারী, ইমাম বুখারী ও দারুল হাদীসের মানহানি হয়।

সে কারণে খতমে বুখারী উপলক্ষে মাহফিলের আয়োজন করতে হয়। হাজার হাজার মানুষকে দাওয়াত করতে হয়। দাওয়াতের খানার জন্য মানুষের কাছে টাকা চাইতে হয়। শেষ হাদীসটি পড়ানোর জন্য দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা বিদেশী কাউকে আনতে হয়। প্রয়োজনে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়াতে হয়। আবার সে জন্যও মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে টাকা চাইতে হয়। হারামখোর মানুষদের কাছ থেকে টাকা এনে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান দেখলে আমার কেবলই মনে পড়ে এক ভিক্ষুকের কথা।

একটি মহিলা আমাদের বাড়িতে এসেছিল সাহায্য চাওয়ার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন সাহায্য চাইছ। সে বলল মিলাদ পড়ানোর জন্য। জিজ্ঞেস করলাম, ভিক্ষা করে মিলাদ পড়ানোর মানেটা কী? সে বলল, কী করব? টাকা ছাড়াতো হুজুররা মিলাদ পড়ে না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, যে হুজুর টাকা ছাড়া মিলাদ পড়ায় না তার মিলাদের দরকার নেই। যারা টাকা ছাড়া পড়াবে তাদেরকে দিয়ে পড়াও। তার চেহারার পরিবর্তন দেখে বুঝতে পরলাম, সে বুঝে ফেলেছে যে, আমি দুনিয়া সম্পর্কে কোন খবর রাখি না।

একজন পেশাদার মহিলা ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে তো এটা চলতে পারে, কিন্তু আমরা এর বৈধতা কীভাবে পেতে পারি? বিশেষত যখন চাঁদার বৈধতার পেছনে যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে দ্বীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাকে। আমাদের এ কাজগুলো কি আসলে এমনই যার উপর দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভরশীল? না কি বিপরীত কিছু? এসব বিষয়ে ফিকহের কিতাবাদিকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন আছে কি না?

### খ, ঘ ও ঙ এর উপসংহার

খতমে বুখারী, ইফতেতাহে বুখারী ও ইখতেতামে বুখারী এ তিনটি শিরনামের একটি যৌথ উপসংহার এখানে পাঠকের সামনে আমি তুলে ধরব। এ বিষয়ে আমি ওয়াদাও করে এসেছি। এ তিনটি বিষয়ের যে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তা বড়দের। এর কারণে আমরা ছোটরা যে সমস্যায় পড়ে আছি সে সমস্যার সঙ্গে পাঠকবর্গকে শরিক করতে চাই।

অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ এতটুকু জানতো যে, হাদীসের অনুসরণ করতে হয়। তারা জানতো, হাদীসের অনেক কিতাব আছে। তারা জানতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজকে হাদীস বলা হয়। মানুষ জানতো, রাসূলের কথা ও কাজ মুসলমানদের জন্য পালনীয় বিষয়। মানুষ জানতো, রাসূলের হাদীসের সঙ্গে বেয়াদবি করা যায় না। মানুষ জানতো, হাদীসের উস্তাযকে মুহাদ্দিস বলে, হাদীসের শায়খ বলে।

মানুষ জানতো না, সহীহ বুখারীই হাদীসের একমাত্র কিতাব যার অনুসরণ করা যায়। মানুষ জানতো না, সহীহ বুখারী ব্যতীত হাদীসের অন্য কিতাবগুলো এত মূল্যহীন। মানুষ জানতো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সহীহ বুখারীতে থাকলে তা হাদীস, আর অন্য কিতাবে থাকলে তা হাদীস নয়। মানুষ জানতো না, হাদীসের উল্লেখ করতে হলে সহীহ বুখারীর নাম নিয়েই উল্লেখ করতে হবে, নচেৎ হাদীসের উল্লেখ করে কোন লাভ নেই। মানুষ জানতো না, ফিকহের কোন মাসআলা বয়ান করতে হলে তার জন্য সহীহ বুখারী থেকেই হাদীস দেখাতে হবে। মানুষ জানতো না যে, সহীহ বুখারীর উস্তায ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাবের উস্তাযগন মাদরাসায় বসে বসে শুধু ঘোড়ার ঘাস কাটেন। মানুষ জানতো না যে, যারা সহীহ বুখারী ব্যতীত হাদীসের অন্যান্য কিতাব পড়ায় তারা মানুষের কাতারেই পড়ে না।

### এক দিকে

আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, সহীহ বুখারী হাদীসের একমাত্র কিতাব। এছাড়া হাদীসের অন্যান্য কিতাবের নাম জানা থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, যারা সহীহ বুখারী পড়ায় তারা পৃথিবীর সেরা আলেম, আর যারা কিতাবুল আসার, মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ, শরহু মাআনিল আসার পড়ায় তারা পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট আলেম। আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, সহীহ বুখারী এমন কিতাব যা দরসের সময়ে চার ঘন্টা পড়ানোর পরও রাত-বিরাতেও পড়াতে হয়, কিন্তু মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও শরুহু মাআনিল আসার এমন কিতাব যা শুক্রবারে শুক্রবারে পড়াতে হয় এবং এর মাঝেও দু'চার দিন বাদ গেলে কোন সমস্যা নেই। আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, সহীহ বুখারী পড়ানোর জন্য পাঁচ দশ গুণ মূল্য দিয়ে হলেও উস্তায নির্বাচন করতে হবে, আর মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও শরহু মাআনিল আসারের জন্য যারা বিনামূল্যে পড়াতে পারলেও খুশি তাদেরকে দিয়ে পড়ালেই চলবে। আমরা মানুষদেরকে শিখিয়েছি, সহীহ বুখারীতে শরীয়তের সকল মাসআলার সমাধান আছে। অতএব আর কোন কিতাবে কী আছে তা জানার কোন প্রয়োজন নেই।

এক দিকে সহীহ বুখারীকে মানুষের সামনে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

### অপর দিকে

অপর দিকে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, হানাফী মাযহাবের কোন আমল সহীহ বুখারীর হাদীসের খেলাফ হলে কোন সমস্যা নেই। আবু হানীফা রহ. রচিত কিতাবটিকে সহীহ বুখারীর আশেপাশে বসারও অনুমতি দেয়া

হয়নি, কিন্তু বোঝানো হয়েছে, ইমাম বুখারীর চাইতে ইমাম আবু হানীফা বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষকে মুখস্থ করানো হয়েছে হাদীসের একটি মাত্র কিতাবের নাম, আর তা হচ্ছে সহীহ বুখারী। কিন্তু তাদেরকে মানতে বলা হচ্ছে এমন কিতাবের হাদীস যার নাম সে কখনো শোনেনি। এক দিকে বলা হচ্ছে, ইমাম বুখারী লক্ষ লক্ষ হাদীস জানতেন আর আবু হানীফা রহ. কুরআন মাজিদ ছাড়া আর কোন কিতাবই পড়েননি, অপর দিকে বলা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মাসআলাগুলোই হাদীসের বেশি কাছাকাছি।

## বুখারীভক্ত হানাফী

গরিব উম্মতের পক্ষ থেকে আমার প্রশ্ন, যার কাছে আমি জানতে পেরেছি সহীহ বুখারীই হাদীসের একমাত্র কিতাব তাঁর কাছে শুনতে পেলাম সহীহ বুখারীর হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমার মত একজন গরিব উম্মত কী ধারণা করবে? হুজুরের ব্যাপারে কী ধারণা করবে? সহীহ বুখারীর ব্যাপারে কী ধারণা করবে? সর্বোপরি হানাফী মাযহাব সম্পর্কে কী ধারণা করবে? কী ধারণা করছে?

আমার ক্ষুদ্র এ জীবনে গায়রে মুকাল্লিদ ফিতনার বিরুদ্ধে কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছি। লিখেছি। সেমিনার সম্মেলনও করেছি। বলাই বাহুল্য, শ্রোতা ও প্রতিপক্ষের শত করা নিরানব্বই ভাগ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। উসূলে হাদীসের বিচারে সর্বোচ্চ সহীহ হাদীসটিও তাদের সামনে উপস্থাপন করার উপায় নেই; কারণ তা সহীহ বুখারীতে নেই। আর সহীহ বুখারীতে না থাকাটাই দুর্বলতার একটা কারণ -এ কথা সে তাদের গায়রে মুকাল্লিদ আলেমদের কাছ থেকে শিখেনি। শিখেছে মুকাল্লিদ আলেমদের কাছ থেকে। আর সে বিষয়টি তার জন্য বোঝা খুবই সহজ। এরই বিপরীতে উসূলে হাদীসের গবেষণামূলক বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝানোর মত যোগ্যতা আমার কখনো ছিল না, এখনো নেই।

## অর্ধশিক্ষিতের কথা ভোলা যাবে না

একজন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষ যদি উসূলে হাদীসের আলোকে একটি হাদীসের অবস্থান নির্ণয় না করে জনশ্রুতি ও ব্যাপক সমাদৃতির আলোকে হাদীসের অবস্থান নির্ণয় করে তাহলে আমি তাকে কী বলে দোষারোপ করব? তাকে আমি কী বলে সঠিক পথ দেখাব?

বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। ঘরের লোকেরাই যদি তা বোঝার চেষ্টা না করে তাহলে বাইরের লোকেরা তা বুঝবে এ আশা কীভাবে করতে পারি? অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষগুলোকেতো আমরা সহীহ বুখারীর ব্যাপারে

এতদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছি যে, সে কিতাবের প্রতিটি কথাকেই তারা রাসূলের হাদীস মনে করে এবং অকাট্য মনে করে। খোদ ইমাম বুখারীর নিজস্ব কথাগুলোকেও তারা রাসূলের হাদীস হিসাবে উপস্থাপন করে আমাদের সঙ্গে মুনাযারা-বিতর্ক করতে আসে। সাহাবায়ে কেরামের কথা কাজ থেকে শুরু করে ইমাম বুখারীর কথা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যাপারেই তাদের ধারণা এগুলো সব অকাট্য দলিল। কারণ তা সহীহ বুখারীতে আছে।

যে কিতাবের প্রতি হরফ শুধু তিলাওয়াতে নেকি হয় বলে ধারণা দেয়া হয়েছে, সে কিতাবে উল্লিখিত কথা দলিল না হয়ে পারে না। কথা যারই হোক।

তাদের এসব বিশ্বাসের পেছনে আরবের কোন আলেমের উদ্ধৃতি তারা দেয় না। অন্য মাযহাবের কারো উদ্ধৃতি তারা দেয় না। তারা উদ্ধৃতি দেয় এ দেশের শায়খুল হাদীস এবং ইফতেতাহে বুখারী ও ইখতেতামে বুখারী অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমানের।

এ বৈপরীত্য থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না। বাঁচার কোন উপায় দেখছি না। প্রথাগত রীতি-নীতি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোজাখুঁজির পর যেসব পথকে পথ বলে মনে হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও খবর পাচ্ছি, এগুলো না কি কোন পথ নয়। পথ কোনটি? এমন প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাচ্ছি না। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা।

### চ. দরূদে নারিয়ার খতম

দরূদে নারিয়ার খতম জায়েয বা না জায়েয এ বিষয়ে আলোচনা করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র খতম প্রসঙ্গের টানেই শিরনামটি এসে গেছে। এসে গেছে কয়েকটি কারণে। দরূদে নারিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে আশা করি পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন। বিষয়গুলো হচ্ছে: ১. এ দরূদটি মাসূর কোন দরূদ নয়। ২. এ দরূদের মাঝে তাওয়াসসুলের এত ভয়ঙ্কর চিত্রায়ন করা হয়েছে যার দরুন আমাদের ঘরের লোকেরাও যাঁরা তাওয়াসসুল বিননবীকে জায়েয বলেন তাঁরা আপত্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৩. ভুলক্রমে ও নুকতা লেখার ভুলের কারণে এ দরূদের নাম 'তাযিয়া'র পরিবর্তে হয়ে গেছে দরূদে নারিয়া, কিন্তু এর পরও আমাদের ধারণামতে দরূদটি আগুনের মত কাজ করে। ৪. এ দরূদটি খায়রুল কুরূনেরও অনেক পরের বানানো একটি দরূদ।

কিন্তু এ বিষয়গুলো আপন জায়গায় সত্য হওয়া সত্ত্বেও খতমের বাজারে কুরআন খতমের তুলনায় দরূদে নারিয়ার খতমের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। যাতে পাঠক বিচার করতে পারেন,

কুরআন খতম ও দরূদে নারিয়ার খতমের মাঝে মানগত এ পার্থক্যগুলো মেনে নেয়া যায় কি না। পাঠক যেন ভাবতে পারেন, এ বিষয়গুলোর মধ্যে শরয়ী কোন সমস্যা আছে কি না। যদি থেকে থাকে তাহলে কীভাবে আমরা নিরবে তা মেনে নিচ্ছি। আর যদি কোন সমস্যা না থাকে তাহলে তা আমার ব্যক্তিগত রুচি হিসাবেই থাকল। কুরআন খতম ও দরূদে নারিয়ার খতমের মানগত পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

**ক.** কুরআন খতমের সাধারণ বাজার দর হচ্ছে এক হাজার থেকে তিন হাজার। আর দরূদে নারিয়ার বাজার দর হচ্ছে সাধারণত সাত হাজার থেকে বিশ হাজার। এ ক্ষেত্রে কেউ দোয়া চাইতে আসলে বলতে শোনা যায়, আট-দশ হাজার টাকা খরচ করার মত অবস্থা থাকলে দরূদে নারিয়া পড়িয়ে নিতে পারেন। আর সে পরিমাণ সামর্থ্য না থাকলে কুরআন এক খতম করিয়ে দেয়া যাবে। সমস্যা হবে না।

**খ.** দরূদে নারিয়া পড়ার জন্য আলাদা একটি পবিত্র সাদা কাপড় বিছাতে হয়, যে কাপড়ের উপর দরূদ পাঠকারীগণ বসবেন এবং গোটাগুলো রাখবেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মসজিদে নামায পড়ার পর নামাযের সে জায়গাতেই দরূদে নারিয়ার খতম পড়তে হলে পবিত্র সাদা কাপড়টি সেখানে বিছানোকে জরুরি মনে করা হয়। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমন করতে দেখা যায় না।

**গ.** দরূদে নারিয়ার খতমের ক্ষেত্রে দরূদ পড়ার শুরু থেকে দরূদের নির্দিষ্ট সংখ্যা শেষ করে সম্মিলিত দোয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন প্রকার কোন কথাবার্তা বলা যায় না। এমন কি যে সমস্যাকে উপলক্ষ করে দরূদে নারিয়ার খতমের আয়োজন করা হয়েছে সে সমস্যার কথাও এর মাঝে বলা যাবে না। যার দরুন দরূদ পড়া শুরু হওয়ার আগে দোয়ার বিষয়বস্তু বলে নিতে হয়। দরূদ শেষ করার পর সম্মিলিত মোনাজাতের আগেও দোয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমন বাধ্যবাধকতা করতে দেখা যায় না। বরং তিলাওয়াতের মাঝে কথা বলা যায় এবং সম্মিলিত দোয়ার আগেও কথা বলা যায়।

**ঙ.** যে কামরায় বা যে এলাকায় দরূদে নারিয়ার খতম হয় সে কামরা বা এরিয়ার দুয়ারে একজন প্রহরী বসিয়ে দেয়া হয়, যাতে খতমের একাগ্রতার মাঝে কেউ ব্যঘাত ঘটাতে না পারে, বা কারো কারণে যেন খতমের নিয়ম ভঙ্গ না হয়ে যায়। কুরআন খতমের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না।

চ. সমস্যা একটু বেশি জটিল হলে দরূদে নারিয়ার খতমের আয়োজন করা হয়। আর সমস্যার ধরন মোটামুটি স্বাভাবিক হলে সে ক্ষেত্রে কুরআন খতমকে যথেষ্ট মনে করা হয়।

শরীয়তের বিচারে বিষয়গুলো আমার কাছে জটিল মনে হয়েছে বলেই পাঠকবর্গকে এ পেরেশানীর সঙ্গে শরিক করতে চাচ্ছি। তবে এ বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে কোন চাপাচাপি নেই। অনেকে এসব ক্ষেত্রে তাজরাবা বা অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। বলেন, আমল করে দেখা গেছে এর ফায়দা পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে আমার দু'টি কথা। একটি কথা হচ্ছে, তাজরাবা বা অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমলের তালিকা বাড়াতে বাড়াতে কোথায় নিয়ে যেতে চাই? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি ইলমের মাপকাঠিটি ঠিক রাখার অনুরোধ করছি মাত্র। ফায়দাকে অস্বীকার করিনি। আরেকটি কথাও এখানে মনে রাখতে হবে যে, গায়রে শরয়ী পদ্ধতিতে আমলের ফায়দার তালিকা কিন্তু ছোটখাট নয়। এমনকি কুফরীর মাধ্যমে ফায়দা পাওয়ারও বিশাল তালিকা শয়তানের অনুসারীদের কাছে আছে। তাই অভিজ্ঞতাকে দলিল না বানালেই ভালো হয় এবং অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে শরীয়তের মানদণ্ডে মেপে নিশ্চিত হলেই ভালো হয়। কারণ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا এর কথাটি মনে রাখতে হবে।

## ছ. খতমে জালালী

আল্লাহর নাম কাগজে লিখে আটার গোল্লার ভেতরে ঢুকিয়ে সম্ভবত এভাবে এক লক্ষ আটার গোল্লা তৈরি করে সেগুলোকে সাগরে ফেলতে হয়। আকাশ ছোঁয়া কোন সমস্যার মুখোমুখী হলে সাধারণত এ দোয়া পড়া হয়। কিছুটা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এর মাঝে ঠিকাদারী পদ্ধতিও আছে এবং এর বাজার দরও অনেক। সাহেবে দাওয়াতের পক্ষ থেকে একজন ঠিকাদারী নিয়ে অন্যদের সহযোগিতা নিয়েও এ খতমটি সম্পন্ন করা যায়। এর শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না।

তবে পাঠক একটু ভেবে দেখবেন, আল্লাহর নামের এ পদ্ধতির ব্যবহার কতটুকু সম্মানজনক। এমনিভাবে এত পরিমাণ আটা পানিতে ফেলে নষ্ট করার জন্য যে পরিমাণ দলিলের সমর্থন দরকার সে পরিমাণ দলিল এ ক্ষেত্রে পাওয়া যাওয়া সম্ভব কি না? তবে যদি এর দ্বারা সাগরের মাছের খাদ্য বিষয়ক সহযোগিতার নিয়ত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এমন নিয়ত থাকতেও পারে। আমার জানা নেই। আমি শুধু পাঠককে এ বিষয়ে একটু ভাবতে বলছি।

এর মত আরো কিছু আমল আছে যার মাঝে লেখা ধুয়ে খাওয়া, লিখিত কাগজ খাওয়া, কয়লা খাওয়া, গাছের টুকরা খাওয়া ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। খাদ্য নয় এমন সব বস্তু খাওয়ার বিষয়ে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

এখন আমলের ও তাবিজের খাতিরে এসবের হুকুমে কোন পরিবর্তন আসবে কি না দেখা দরকার। বিজ্ঞজনকে এ বিষয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করছি।

আমাকে কেউ ভুল বুঝলে সর্বোচ্চ আমি ধিকৃত হব, প্রত্যাখ্যাত হব, অবাঞ্চিত ঘোষিত হব। কিন্তু এটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যা। এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। কিন্তু বিষয়গুলোকে বিবেচনায় না নিয়ে যদি উম্মত কোন ভুলের শিকার হয়ে যায় তাহলে এর ক্ষতি অপূরণীয়, অনন্তকালের।

আরো কিছু আমল আছে এমন যার মধ্যে আল্লাহর সিফাতগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সিফাতের মূল অক্ষরগুলোর মধ্যে এক দু'টি তিনটি অক্ষর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যারফলে সিফাতের মূল রূপ বহাল থাকেনি। আমার মনে হয় শরীয়ত এটাকে কোনভাবেই সমর্থন করবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার সিফাতগুলোর উল্লেখ হাদীসে এসেছে। এমতাবস্থায় এর পরিবর্তন মানেই মাসূর নামের মাঝে পরিবর্তন। এর সঙ্গে অর্থের বিকৃতি যুক্ত হলে এর শরয়ী সমস্যার আর কোন শেষ নেই।

আবার কিছু আমল আছে যে আমলে শুধু নম্বর ব্যবহার করা হয়। একটি দোয়া, একটি আয়াতকে নম্বরের মাধ্যমে লিখে আয়াত ও দোয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা দরকার, যে ইলমের ভিত্তিতে বিভিন্ন অক্ষরের নম্বর বসানো হয় তার সঙ্গে শরীয়তের কী সম্পর্ক? এমনিভাবে এটাও দেখা দরকার যে, একটি সংখ্যা একটি দোয়া ও একটি আয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কি না। পারলে এর দলিল কী? এতটুকু বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যতটুকু দলিল দরকার কমপক্ষে ততটুকু দলিল তালাশ আমাদের জন্য জরুরী। না হয় একজন মুসলমান শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার আলোকে একটি আমল করবে কেন? আর শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে হলে একে আমল বলবে কেন? এবং আরেক ধাপ এগিয়ে একে আমলে কুরআনী বলবে কেন? আমল ও আমলে কুরআনী হওয়ার জন্য উদ্ধৃতি লাগবে। আমরাতো এরকমই জানি।

তাই ছোটদের পক্ষ থেকে আবদার, বিজ্ঞজন বিষয়গুলোর উপর নযরে সানী করাকে জরুরী মনে করবেন এবং প্রজন্মের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে যাবেন।

### জ. মরে যাওয়ার দোয়া খতম

মৃত্যুর বিছানায় শায়িত ব্যক্তির জন্য আলাদা রকমের একটি দোয়ার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সে দোয়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে, হায়াত না থাকলে যেন রোগী এখনই মরে যায়। আর হায়াত থাকলে যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। বড়রা

এ দোয়াটি করে থাকেন। ছোটদের মনে এ দোয়ার বিষয়ে একটা খটকা লেগে আছে। খটকাটি দূর হওয়া দরকার। বড়রা আমলটি করা সত্ত্বেও ছোটদের মনে যে কারণে খটকা লাগে তার কারণগুলো নিম্নরূপ-

ক. কারো মৃত্যুর দোয়া করার শরয়ী বিধান কী? এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার। হাদীসের আলোকে রোগীর কি এমন কোন অবস্থা হওয়া সম্ভব যখন তার জন্য মৃত্যুর দোয়া করা যেতে পারে?

খ. হাদীসের মধ্যে এসেছে দোয়া করলে যেন বিশ্বাসের সাথে ও আস্থার সাথে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া চাওয়া সহীহ নয় যে, হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমার এ কামনা পূরণ কর। হাদীসে পরিস্কারভাবে এসেছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له". رواه البخاري

অতএব একজন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির জন্যও শেফার দোয়াই করা চাই। তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা করে চলেছি।

যারা এ দোয়াটি করেন এবং এ দোয়াটি করানোর জন্য অসুস্থ ব্যক্তির অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন তারা একটু বর্তমানের বস্তুবাদী মানসিকতাকে অনুভব করা দরকার। ইসলাম ধর্মের শেখানো আখেরাতমুখী জীবন ছাড়া এ পৃথিবীতে আর যত নীতি ও দীক্ষা রয়েছে সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ, ঝঞ্জাটমুক্ত প্রাত্যহিক দিনাতিপাত ও আরামের ব্যঘাত ঘটায় এমন সব বিষয়কে দূর করে দিতে হবে। মুছে পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

এমন কি অসুস্থ পিতা-মাতার জীবন যদি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনকে কষ্টকর করে তোলে তাহলে তার মৃত্যু কামনাও করা হয়ে থাকে। ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতে মৃত্যুকামনামূলক দোয়ার আয়োজন করে আমরা মূলত তাদের সে বস্তুবাদী ধ্যানধারণাকে যোগান দেই। তারা এমন একটি প্রস্তাবেরই অপেক্ষায় থাকে যার দ্বারা নিজেদের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় না, আবার ঝামেলাও দূর হয়ে যায়।

বিষয়টিকে সহজ করার জন্য আরেকটি শিরনামও এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিরনামটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তিটিকেও কষ্ট থেকে বাঁচানো হয়। তাই রোগীর স্বার্থেই এমন দোয়া করা হয়ে থাকে। আমার

দৃষ্টিতে এ কথাটি বিশ্বাস করা যায় না বা বিশ্বাস করা গেলেও কয়েকটি কারণে এ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

এক. অসুস্থতার অবস্থা যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা মৃত্যুর চাইতে সহজ। দুই. অসুস্থতার কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। খোদ রোগীর জন্যও তার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে অন্যরা এ কামনা করার বৈধতা কীভাবে আসতে পারে? তিন. অসুস্থতা সারবে না এ সিদ্ধান্ত আমরা কেন নিতে যাব? আমাদেরকে যখন সর্বাবস্থায় এবং কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী হওয়াকে শেখানো হয়েছে তখন আমরা নৈরাশ্যের পথ কেন ধরব। একজন মুমিন তা করতে পারে না।

বস্তুবাদী স্বার্থপর মানুষ তা করতে পারে যাদের নীতিতে এ বৈধতাও আছে যে, মানুষ যখন কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে তখন কাজের লোকদের সুন্দর জীবনের স্বার্থে অকর্মন্য লোকদেরকে মেরে ফেলা বৈধ।

কিন্তু ইসলামতো এমন শিক্ষা দেয়নি। ইসলামতো শিখিয়েছে, এ ধরনের লোকদের খেদমত করার দ্বারা একজন সেবক কতভাবে লাভবান হতে পারে। একজন বয়োবৃদ্ধের সেবার দ্বারা কত রকমের অর্জনের কথা কুরআনে হাদীসে বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের যারা ধারক বাহক কমপক্ষে তারা এমন কাজ করা বা এমন কাজের সমর্থন করা বা এমন কাজে সহযোগিতা করা একদম শোভা পায় না।

সর্বশেষ কথা হচ্ছে, এ আমলটি যদি ইসলামী তরিকার কোন আমল হয়ে থাকে তাহলে তার উৎপত্তি কোথায় কখন থেকে? এর কি এমন কোন উৎপত্তিস্থল আছে যার উপর ভিত্তি করে এমন একটি আমলকে মুসলমানদের অনুসৃত আমল হিসাবে গ্রহণ করা যায়? এমন কোন উদ্ধৃতি কি এর আছে যার উপর ভিত্তি করে এমন একটি আমল মুসলমানদের রাহবারদের কাছেও সমাদৃতি পেতে পারে?

لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى.

উপরোক্ত দোয়াটি দিয়েও কোন রূপ ছিদ্র বের করার কোন সুযোগ নেই। হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ দোয়ার আলোকেই স্পষ্ট করে বলেছেন, কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর দোয়া করা যাবে না, শুধুমাত্র নিজের দ্বীনী বিষয়ে কোন ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা হলে তখন এ দোয়া করা যেতে পারে। কোন প্রকারের অসুস্থতা বা কষ্টের কারণে মৃত্যুর দোয়া করার সুযোগ নেই। আর যে ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে তা শুধু মাত্র নিজের জন্য নিজের দোয়া, আরেক জনের মৃত্যুর জন্য নয়। দেখুন, শরহুন নববী আলা সহীহি মুসলিম।

বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য অনুরোধ করছি। শুধুমাত্র এসব বাস্তবতাকে তুলে ধরা, এ বিষয়ে পেরেশান হওয়া এবং এ বিষয়ে জানতে চেয়ে অনুরোধ করার কারণেই আমাদেরকে দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু মনে করা মনে হয় উচিত হবে না।

আর প্রচলিত প্রথা ও নীতি ধারাকে চলতে দেয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়ার কারণে এবং দলিলকে উপেক্ষা করার সকল ব্যবস্থা তৈরি করে দেয়ার কারণেই কাউকে মিত্র ভাবা উচিত হবে না। দারুল উলূম দেওবন্দ, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মানহাজে দেওবন্দ কখনো এর অনুমতি দেবে না। অনুমতি দেয়ার কথা নয়।

আল্লাহ তাআলা প্রথমে লেখককে এবং এর সঙ্গে সবাইকে সহীহ পথ খুঁজে বের করার তাওফীক দান করুন। আমাদের মাঝে ও সত্যের মাঝের সকল পর্দাকে সরিয়ে দিন। আমীন।

*********************

# উলূমে হাদীস, ভাষাচর্চা-বেয়াদব

এ বিষয়ে একটি তথ্য অনেক পুরাতন। এ বিষয়ে বহু আগে থেকেই দেখে আসছি এবং শুনে আসছি। আরেকটি বিষয়ে খারাপ ধারণাভিত্তিক কিছু ধারণা থাকলেও সরাসরি কোন তথ্য ছিল না। কিছু দিন আগে কিছু তথ্যও হস্তগত হয়েছে। তথ্য হাতে এসে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, এ বিষয়ে কিছু কথা বলাই উচিত।

**বড়**

যারা আদব বিভাগে পড়ে তারা বেয়াদব হয়। যারা ভাষা ও সাহিত্য শিখে তারা বেয়াদব হয়। আমাদের আকাবিররা আদব পড়েননি, তাই তাঁরা বেয়াদব ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা আরবী জানতেন। ভাষা জানতেন। আদব না পড়েও তাঁরা কত বড় বড় কিতাব লিখে গেছেন।

আমি গবেষণা করে দেখেছি এবং জরিপ করে দেখেছি, যারা উলূমে হাদীস পড়ে তারা সবাই বেয়াদব হয়। উস্তাযের বিরুদ্ধে কথা বলে। উস্তাযের সমালোচনা করে। এ পর্যন্ত যত লোক উলূমে হাদীস পড়েছে তাদের সবার ক্ষেত্রে আমি এটাই দেখেছি। আমাদের আকাবিররা উলূমে হাদীস পড়েননি। কিন্তু তাঁরা কি হাদীসের সহীহ-যয়ীফ চিনতেন না? তাঁরা কি উলূমে হাদীস না পড়ে মুহাদ্দিস হননি? এরা এখন উলূমে হাদীস পড়ে আনওয়ার শাহ কাশমীরীর চাইতে বড় মুহাদ্দিস হতে চায়! আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ভুল ধরে থানভীর চাইতে বড় হতে চায়!

**ছোট**

**যারা ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করে**

যারা আদব বিভাগে তথা আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে পড়ে তারা আরবী ভাষা, সরফ, নাহু ও বালাগাতের জন্য দরসে নেযামীর নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাস্তবায়ন শিখে। শব্দের আভিধানিক ভুল দূর করার চেষ্টা করে। শব্দের কাঠামোগত ভুল শুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বাক্যের কাঠামোগত ভুল শুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বাক্যের মানোন্নয়ন করার চেষ্টা করে। নাহবেমীরের শুরুতে মুসান্নিফ রাহিমাহুল্লাহ নাহবের একজন ছাত্রের কাছে যে আশাগুলো করেছেন মুসান্নিফের সে আশাগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে। মনের ভাবকে শ্রোতার উপযোগী করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। তার ফলাফল হিসাবে কখনো

প্রবন্ধ-নিবন্ধ তৈরি হয়, আবার কখনো বই রচনা পর্যন্তও পৌঁছে যায়। শব্দের আঁচড়ে বর্তমানের ছবি এঁকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। যাতে প্রজন্ম জানতে পারে, বিগত দশকগুলোতে কে কী করেছে? কে সেরা ঈমানদার হয়েও কুফরের তল্পী বহন করেছে? কে সত্যকে সত্য বলার অপরাধে ভবঘুরে হয়েছে?

এ কাজগুলোই হয়ত আমাদের আকাবিরের এমনি এমনি হয়ে যেত, আমাদের হচ্ছে না বলে আলাদা চেষ্টা করতে হচ্ছে। আমার কোন এক বিভাগে ভর্তি হওয়া প্রসঙ্গেও বর্তমান বড়দের একজন বলেছিলেন, এটার জন্য আলাদা সময় দিতে হয় না। দাওরা পর্যন্ত ঠিক মত পড়লে এমনি এমনি হয়ে যায়। আমি শুধু বলেছিলাম, আমার হয়নি তাই পড়ছি।

### আর যারা উলূমে হাদীস পড়ে

আর যারা উলূমে হাদীস বিভাগে পড়ে তারা তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করে যে, আজ চৌদ্দশত বছর পর যে কথা ও কাজগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি তা আসলেই তাঁর কথা ও কাজ।

যেসব মিথ্যাবদীরা রাসূলের নামে মিথ্যা কথা বাজারে ছড়িয়েছে তাদের মিথ্যাগুলোকে রাসূলের পবিত্র হাদীস থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করে। যে বক্তব্যটিকে রাসূলের বক্তব্য বলে প্রচার করা হচ্ছে তার কোন বর্ণনা সূত্র আছে কি না তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

যে সনদ উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তবেই গ্রহণযোগ্য কিতাবাদিতে আছে কি না তা তাহকীক করে দেখে। হাদীসের শুরুতে উল্লিখিত সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য কি না তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। সনদের প্রত্যেক দুই বর্ণনাকারীর মাঝে কোন ফাঁকা আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করে।

নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য হাদীসটিকে আমলের যোগ্য বলেছেন কি না তা তালাশ করার চেষ্টা করে। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী নিজেদের আবিষ্কৃত কোন এজেন্ডার প্রচার প্রসারের জন্য কোন মিথ্যুকের কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতে চাইলে তাদের রশি টেনে ধরার চেষ্টা করে, সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকাবাজদের ধোঁকা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

## মাযহাবের অনুসারী উলূমে হাদীসের ছাত্র

একজন মাযহাবের অনুসারীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যে, সে মাযহাবের অনুসরণের মাধ্যমে মূলত রাসূলেরই অনুসরণ করছে এবং হাদীসেরই অনুসরণ করছে। যেসব হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত সেসব হাদীসের সনদভিত্তিক অবস্থান যাচাই করে নিশ্চয়তা লাভ করে।

মাযহাবের হাদীস সম্পর্কে মাযহাবের লোকদের গায়ে ঠেলা জবাবগুলোর কারণে নিজের মাযহাবের উপর যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে সেগুলো দূর করার পথ খুঁজে পায়। হাদীসের বিষয়গুলোকে উলূমে হাদীসের আলোকে সমাধান করে তৃপ্তি বোধ করে। বর্ণনার বিষয়গুলোকে যুক্তি, আকলের ঘোড়া, স্বপ্ন, কাশফ ও মোরাকাবার মাধ্যমে সামাধান করতে গিয়ে সমাধানের পরিবর্তে যেসব সমস্যা আরো বাড়ানো হয়েছে সেসব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করে।

গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় যখন মাযহাবের হাদীসগুলোকে জাল ও যয়ীফ বলে প্রচার করে চলেছে তখন উলূমের হাদীসের একজন ছাত্র উলূমে হাদীসের আলোকে তাদের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার চেষ্টা করে চলে।

## মাযহাবের বিশুদ্ধতার বিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে

মাযহাবের লোকেরা যখন ফরীদ উদ্দীন আত্তার ও মসনবীর শের/কবিতা দিয়ে মাযহাবের ইমামের মাকাম সাব্যস্ত করে, এর মাধ্যমে মাযহাবের সত্যতা ও দলিলনির্ভরতা প্রমাণ করতে থাকে এবং গায়রে মুকাল্লিদদের হাসির খোরাকের ব্যবস্থা করতে থাকে, তখন উলূমে হাদীসের ছাত্র মাযহাবের প্রত্যেকটি মাসআলাকে হাদীসের কিতাব থেকে বের করে এবং উলূমে হাদীসের আলোকে হাদীসগুলোকে দলিলের যোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

## সত্যকে সত্য পথে উপস্থাপন করে

মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদদের আপত্তির জবাবে যখন মাযহাবের লোকেরা বলতে থাকে, আবু হানীফা কি তোমার চাইতে কম বোঝেন? হেদায়ার মুসান্নিফ কি তোমার চাইতে কম বোঝেন? বড় বড় মুহাদ্দিস মুফতীগণ কি তোমাদের চাইতে কম বোঝেন? তুমি শার্ট-প্যান্ট পর তুমি দলিলের কী বোঝ? তুমি কলেজে পড় তুমি দলিলের কী বোঝ? মক্কার ইমাম কী বোঝে? মদীনার ইমাম কী বোঝে?

হানাফী আর দেওবন্দী ছাড়া পৃথিবীতে আবার কোন মুহাককিক আলেম আছে না কি? মাযহাবের দলিল অনেক সূক্ষ্ম, এটা বোঝার মত মেধা

তোমাদের হয়নি। মাযহাবের অনেক দলিল ছিল সব তাতারীদের হামলায় সাগরে ভেসে চলে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে। হাদীসগুলোর সনদ আবু হানীফা পর্যন্ত সহীহ ছিল, পরে এসে দুর্বল হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি যা শুধুমাত্র মাযহাববিরোধীদের জন্য হাসির খোরাক যোগাতে পারে

-তখন উলূমে হাদীসের ছাত্ররা সরাসরি হাদীসের ভাণ্ডার থেকে মাসআলার দলিল বের করে নিয়ে আসছে এবং উলূমে হাদীসের সর্বস্বীকৃত নীতির আলোকে যাচাই বাছাই করে প্রমাণ করছে যে, না, মাযহাবের দলিল এবং গ্রহণযোগ্য দলিলই আমাদের হাতের কিতাবগুলোতে রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে চলমান কিতাবগুলো এবং মুদ্রিত কিতাবগুলোতেই রয়েছে।

### আগুন পানির উপর মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি প্রমাণ করে

তারা প্রমাণ করে চলেছে যে, যেসব কিতাব সাগরে ভেসে গেছে এবং আগুনে পুড়ে গেছে সেসব কিতাবের হাদীসের উপর নির্ভর করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা প্রমাণ করে চলেছে, যে হাদীসের সনদ আবু হানীফা পর্যন্ত সহীহ ছিল এরপর দুর্বল হয়ে গেছে সেসব দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাযহাবের ইমামের মকাম ও মর্যাদার উপর ভিত্তি করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে।

উলূমে হাদীসের ছাত্ররা প্রমাণ করে চলেছে, মাযহাববিরোধীদের কাছে এমন একটি মাসআলাও নেই যে বিষয়ে তারা দাবি করতে পারে যে, তাদের মতের পক্ষের দলিল সনদের বিবেচনায় বেশি শক্তিশালী। তারা প্রমাণ করে চলেছে, গায়রে মুকাল্লিদরা হয়তো কোন মাসআলার পক্ষে সর্বোচ্চ সহীহ মানের হাদীস দেখাতে পারবে, কিন্তু সে হাদীসে তাদের দাবির পক্ষে কিছুই থাকবে না।

### মীরাসে নববীকে সন্দেহাতীত প্রমাণ করে চলেছে

উলূমে হাদীসের ছাত্ররা তালাশ করে বের করে চলেছে, হাদীসের কিতাবের মুসান্নিফগণ কিতাব লিখে দিয়ে যাওয়ার পর যে এক হাজার বছর বা বার শত বছর অতিক্রম করেছে, এ হাজার বার শত বছর পর্যন্ত কিতাবগুলো কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। ছাপাখানার যামানা পর্যন্ত রাসূলের হাদীসগুলো এবং হাদীসের কিতাবগুলো কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা তালাশ করে বের করছে।

ছাপাখানার মালিকরা কিসের ভিত্তিতে হাদীসের হাজার বার শত বছর আগের কিতাবগুলো ছাপছে। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে, যারা হাদীসের কিতাবাদি ছাপছে তারা কারা। তারা ইসলামের বন্ধু না শত্রু। তারা হাদীসের বন্ধু না শত্রু। উলূমে হাদীসের আলোকে এসব বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করছে

এবং তাদের ঈমানকে ঝালাই করে নিচ্ছে এবং অন্যদের ঈমান রক্ষায় সহযোগিতা করে চলেছে।

## দাজ্জাল কায্যাবদের টুঁটি চেপে ধরছে

আজো পর্যন্ত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলোকে বয়ান, গবেষণা ও আলোচনার টেবিল থেকে বিদায় করে দিয়ে সেখানে দাজ্জাল, কাযযাব ও মিথ্যুকদের মিথ্যাগুলোকে প্রচার প্রসার করে চলেছে, উলূমে হাদীসের ছাত্ররা সেসব মিথ্যাকে চিহ্নিত করে চলেছে, যারা প্রচার করে চলেছে তাদেরকে সতর্ক করে চলেছে, সর্বোপরি সাধারণ মুসলমানকে সে ধোঁকা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে চলেছে।

## ফিতনায়ে ইস্তিশরাকের টুঁটি চেপে ধরছে

ইস্তিশরাক তথা পাশ্চাত্যের গবেষকরা যখন ইলমী গবেষণার শিরনামে ইসলামের প্রতিটি বিভাগকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছে এবং সন্দেহ প্রতিটি মুসলমানের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং পৌঁছে দিয়েছে, উলূমে হাদীসের ছাত্ররা তখন উসূলুত তারীখ ও উসূলুল হাদীসের আলোকে প্রাচ্যগবেষকদের মিথ্যার ভাণ্ডার মুসলমানদের সামনে এবং মুসলিম গবেষকদের সামনে তুলে ধরেছে।

'মুতাহাররেক বেলা এরাদা' বেখবর রাহবাররা যখন মুস্তাশরিকদের দেয়া বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে গর্ব করে চলেছে, এবং প্রাচ্যবিদদের হাতে তিরস্কার ও উপহাসের উপাদানগুলো তুলে দিচ্ছে, তখন উলূমে হাদীসের ছাত্ররা বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিভাবে এ বেখবর মানুষগুলোকে সে আত্মঘাতী অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়।

ইস্তিশরাকের ফিতনা যখন কুরআনকে আল্লাহর কুরআন বলে স্বীকার না করে তাকে ওসমানের বানানো কুরআন বলে প্রমাণিত করার অপচেষ্টা করে চলেছে, এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসকে হাদীস বলে স্বীকার না করে তৃতীয় শতাব্দীর আবিষ্কার বলে এ মিথ্যাকে মুসলিম সমাজে প্রতষ্ঠিত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে, তখন উলূমুল হাদীসের ছাত্ররা তাদের সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তার সনদ ও বর্ণনাসূত্রের বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণিত করে চলেছে।

## ধমক দিয়ে ইতিহাস প্রমাণিত হয় না

আমাদের গরীব রাহবারদের মনে রাখতে হবে, ইতিহাস ও হাদীসের যে বিষয়গুলো দলিল, তথ্য ও উসূলনির্ভর সে বিষয়গুলোর সমাধান কখনো ধমকি, বড়ত্ব, গালাগালি, স্বপ্ন, কাশফ, মুরাকাবা, গায়ের জোর ও যুক্তির ঘোড়দৌড় দিয়ে সম্ভব নয়।

তাই মুস্তাশরিকরা ইসলামের যত অঙ্গে কুড়াল দিয়ে আঘাত করেছে, উলূমে হাদীসের ছাত্ররা তখন ঐ প্রত্যেকটি অঙ্গকে উসূলে হাদীস উসূলুত তারীখের আলোকে সুসাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে।

ইস্তিশরাকের ফিতনা যখন ইতিহাসের লম্পট, বদমাশগুলোকে ইসলামের হিরো বানানোর চেষ্টা করেছে উলূমে হাদীসের ছাত্ররা তখন ইতিহাসের পাতা থেকে সেসব লম্পট-বদমাশের লাম্পট্য ও বদমাশীগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে।

ইস্তিশরাকের ফিতনা যখন ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিবর্গকে, সর্বসমাদৃত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, মুজাহিদ ও ইসালামের দা'য়ীগণকে এবং ইসালামী খেলাফতের বীরপুরুষদেরকে সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রে চিত্রায়িত করে চলেছিল, সর্ব নিকৃষ্ট দোষে দোষারোপ করে চলেছিল, তখন উলূমে হাদীসের ছাত্ররাই তাঁদের জীবনীগ্রন্থগুলো মন্থন করে, প্রাচীন ইতিহাসের পাতাগুলো ঘেটে ঘেটে সত্য উদ্ঘাটন করে মুস্তাশরিকদের মিথ্যার ঝুলি তাদেরই চেহারায় নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে।

**দারুল উলূম দেওবন্দ**

একটি পক্ষ বলছে উলূমুল হাদীসের ছাত্ররা বেয়াদব হয়, উস্তাযের বিরুদ্ধে কলম ধরে। আর ঘটনাক্রমে এ পক্ষটি বড়। আরেকটি পক্ষ বলছে উলূমে হাদীসের ছাত্ররা দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের পক্ষে উপরোক্ত কাজগুলো করে চলেছে। এমতাবস্থায় দারুল উলূম কাদের পক্ষে রায় দেবে? কাকে বন্ধু বলে কাছে টেনে নেবে? আর কাকে শত্রু বলে দূরে ঠেলে দেবে?

আমরা কি এ ধারণা করব যে, একটি শাস্ত্র যা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসদার-উৎসকে রক্ষা করার জন্য, শত্রুর কালো হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অস্তিত্ব লাভ করেছে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের স্বার্থে যার চর্চা শুরু হয়েছে সে শাস্ত্রের শত ভাগ ফলাফল এত ভয়ঙ্কর হবে?! আমরা কি মনে করব যে, দারুল উলূম দেওবন্দ এ সিদ্ধান্ত দেবে? দারুল উলূম দেওবন্দ যদি বড়র পক্ষে ফয়সালা দেয় তাহলে ছোটর পক্ষের উত্থাপিত তথ্যগুলোর জবাব কী? আর যদি ছোটর পক্ষে ফায়সালা দেয় তখন বড়র পক্ষ থেকে ওযর কী? সিদ্ধান্তের এক কঠিন দোলাচলে আমরা দারুল উলূমকে ফেলে দিয়েছি।

## ভাগ্য, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

ভাগ্যক্রমে আমি এ দুই বিভাগেরই ছাত্র। মুতলাকভাবে 'ভাগ্য' লিখলাম। 'সৌভাগ্য'ও লিখিনি, 'দুর্ভাগ্য'ও লিখিনি। এ সিদ্ধান্তের বোঝাটি কমপক্ষে আমার উপর না থাকুক, এটা আমি চাই।

অনেকে বলতে পারেন বা বলার হিম্মত না হলে কমপক্ষে ধারণা করতে পারেন, আপনার কারণেই আজ এ দু'টি বিভাগ বদনাম হয়েছে। নচেৎ আদব বিভাগে পড়ে এবং উলূমুল হাদীস বিভাগে পড়ে একজন তালিবুল ইলম বেয়াদব হতে যাবে কেন? আপনি আদব বিভাগ ও উলূমুল হাদীস বিভাগে পড়ে ধারাবাহিক বেয়াদবি করেই চলেছেন। এ থেকেই এ ফলাফল বেরিয়ে আসছে যে, এ বিভাগে পড়লে বেয়াদব হয়।

এ অভিযোগ দূর করার জন্য এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য সামান্য চেষ্টা আমি করব। এবং আমি পাঠককে বলে রাখছি, এখান থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিস্বার্থে। তাই পাঠক ইচ্ছা করলে এ অংশটুকু পড়তেও পারেন, আবার ইচ্ছা না হলে নাও পড়তে পারেন। আমার চেষ্টার সারমর্ম হচ্ছে, আদব বিভাগ ও উলূমুল হাদীস বিভাগের ছাত্ররা কেন এ বদনামের ভাগী হয়েছে সে বিষয়ে আমার দেখা ও শোনা কিছু লিখব এবং ইতিহাসের পাতা থেকেও কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

## নিজের দেখা ও শোনা

ক. ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্ররা যখন অভিধান দেখে একটি শব্দের সঠিক বানান ও সঠিক উচ্চারণ দেখে নেয় তখন তারা বেয়াদব হয়ে উঠে। বেয়াদবীর চিত্রটি হয় এমন, উস্তায লিখে দিয়েছেন 'প্রতিটি ভূলের জন্য একটি করে বেত মারা হবে'। ছাত্র লেখাটি তার খাতায় এভাবে তুলেছে 'প্রতিটি ভুলের জন্য একটি করে বেত মারা হবে'। উস্তায বললেন, তুই লেখাটি দেখে দেখে লিখতে গিয়েও ভুল শব্দটি লিখতে গিয়ে ভুল করলি? আয় তোকে নগদে চারটা ঘা লাগিয়ে দেই। ছাত্র বলল, উস্তাযজি! অভিধানে দেখলাম মনে হয় এভাবেই আছে। উস্তাযজি বললেন, বেশি বুঝিস? না? অভিধান দেখা শিখেছিস? বেয়াদবগুলো কোথাকার! আরেক বেয়াদব বসে বসে ছেলেদেরকে শুধু বেয়াদবি শেখায়। বেশি পণ্ডিতি দেখালে কান ধরে ঘন্টা থেকে বের করে দেব!

খ. ছাত্রকে আরবীতে সপ্তাহের সাত দিনের নাম লিখতে বলা হলে সে এভাবে লিখে এনেছে, يوم الثُلاثاء، يوم الأربِعاء উস্তায দেখে বললেন, হয়নি। এভাবে হবে يوم الثَلثاء، يوم الأربَعاء। ছাত্র বলল, উস্তাযজি সেদিন 'আলমুজামুল

ওয়াসীত’ থেকে এভাবে দেখালেন। উস্তায বললেন, খুব একটা মুজামে ওয়াসীত দেখা শিখে ফেলেছ না? আমাদের আকাবির সব সময় মিসবাহুল লুগাত দেখতেন। (অথচ মিসবাহুল লুগাতে ছাত্র যেভাবে লিখেছে সেভাবেও আছে।) তোমরা খুব একটা বেশি বোঝা শুরু করেছ? বেয়াদব কোথাকার!

গ. এক মাদরাসায় প্রথম জামাতের ছাত্রদেরকে আরবীর উপর বিশেষভাবে অনুশীলন করানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন উস্তায আনা হয়েছে। এক বছরে এর ভালো একটা ফলাফল সামনে আসার কারণে দ্বিতীয় বছরও এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হয়েছে এবং অবস্থা উন্নতি করে চলেছে। তৃতীয় বছর সে ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ অনুশীলন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ কী? খবর নিতে নিতে জানা গেল, ছেলেরা আরবী অনুশীলন করতে গিয়ে বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে।

ঘ. উস্তায ঘন্টার মধ্যে একটি হাদীসের আলোকে ঘন্টাব্যাপী বয়ান করেছেন। উলূমে হাদীসের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক রাখে এমন একজন হাদীসটির উদ্ধৃতি জানতে চাইল। কোন উদ্ধৃতি উস্তাযের মনে না আসলে উপস্থিত ছাত্রদের একজন উস্তাযের পক্ষ থেকে পরবর্তী যামানার গায়রে মুসনাদ একটি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়েছে। উস্তায উদ্ধৃতিটি লুপে নিয়ে বললেন, এ কিতাবে দেখে নিও, পেয়ে যাবে। ছাত্র বলল, এ কিতাবে হাদীসটি সনদ ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসবিশারদগণ এ বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন। উস্তায বললেন, খুব একটা সহীহ-জাল চিনে ফেলেছ? বেয়াদব কোথাকার? রাসূলের হাদীস আবার জাল হয় কীভাবে? নতুন নতুন ইলমের আমদানী হয়ে ছেলেগুলো সব বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে!

ঙ. বড়দের লেখা একটি কিতাবের তালীম হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হাদীসের উল্লেখ এসেছে। উলূমে হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এমন একজন বলে উঠলেন, হাদীসটিকে মনে হয় হাদীস বিশারদগণ জাল বলেছেন। উত্তর দেয়া হয়েছ, জাল না সহীহ এটা মুহাককিকগণের তাহকীকের বিষয়, আপনি পড়ে যান।

বলা হল, বিষয়টিতো এমন নয়। জাল হলেতো এটিকে হাদীস হিসাবে পড়া এবং হাদীস হিসাবে বিশ্বাস করা জায়েয হবে না। উত্তরে বলা হয়েছে, ....... রহ. হাদীসটি তাঁর কিতাবে লিখতে পেরেছেন, আর আমাদের জন্য পড়াও জায়েয হবে না?! বেয়াদবীর একটা সীমা পরিসীমা থাকা চাই। নতুন সব মুহাদ্দিস গজিয়েছে। যার তার ব্যাপারে যে কোন মন্তব্য করে দিতে সামান্য দ্বিধাপর্যন্ত হয় না।

বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এমন হতেই পারে। হাজার সঠিকের মাঝে এক দু'টি ভুল অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। কিন্তু তাহকীক হওয়ার পর

তাহকীক মানা চাই। কিন্তু বোঝানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, উলূমে হাদীসের বাতাসে লোকগুলো বেয়াদব হয়ে গেছে।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যারা এ বিভাগগুলোর ছাত্র তারা ছোট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। আর তাই তারা বেয়াদব হতেই পারে। কারণ পৃথিবীতে সব সময় ছোটরাই বেয়াদব হয়। বড়রা বেয়াদব হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বড়রা যখন ছোট ছিল তখন হয়ত সে সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। এমনিভাবে যারা এখন ছোট তারা যখন বড় হয়ে যাবে তখন তাদেরও বেয়াদব হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। কিন্তু যারা এসব বিভাগের উদ্ভাবক তারাতো ছোট হওয়ার কথা নয়। তাদের কী বিচার হওয়া চাই?

## ইতিহাসের পাতা থেকে

এবার ইতিহাসের পাতা থেকে উলূমে হাদীসের ছাত্রদের বেয়াদবীর তালিকা তুলে ধরছি। এ তালিকার বেয়াদবী এক দুই ঘটনা নয়। এর ইতিহাসটাই বেয়াদবীর। দুয়েকটি ঘটনা আমরা দেখাব। তবে এর আগে সংক্ষেপে যে কথাটি বলে রাখা যায় তা হচ্ছে, উলূমে হাদীসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক আলোচিত বিভাগ হচ্ছে জার্‌হ-তাদীলের বিভাগ। জারহ্ মানেই হচ্ছে একজন মানুষের ইলমী জীবনের বারটা বাজিয়ে দেয়া। কিন্তু বিষয়টি এমন যার কোন বিকল্প নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে সকল মিথ্যুক ও অপদার্থ মানুষদের মিথ্যা কথা ও ভুল কথা থেকে আলাদা করে সংরক্ষিত রাখার জন্য জারহ্-তাদীলের কোন বিকল্প নেই। আরো সত্য কথা হচ্ছে, জার্‌হ-তাদীলের বিভাগে আইম্মাতুল জার্‌হি ওয়াত তাদীল তথা যাঁরা হাদীসের বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করেছেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বড়দের এবং তাদের সলফেরই জারহ্-তাদীল করেছেন।

উলূমে হাদীসের ছাত্রদের জন্যতো বিষয়টি বোঝা একেবারেই সহজ। আর যারা উলূমুল হাদীস পড়েননি তারা একটু সৎ সাহস রেখে বোঝার মত হিম্মত করলেই বুঝতে পারবেন। জারহ্-তাদীলের যাঁরা ইমাম বর্ণনাকারীদের নকদ বা যাচাই করতে গিয়ে যাদেরকে তাঁরা জার্‌হ বা তাদীল করবেন তাঁদের প্রথম সারি হচ্ছে তাঁদের উস্তায। এর পরের সারি হচ্ছে তাঁদের দাদা উস্তায, এরপরে হচ্ছে তাদের পরদাদা উস্তায। এভাবে তাবেঈনের জামাত পর্যন্ত।

অর্থাৎ জারহ্ তাদীলের ইমামগণ যে যামানারই হোক না কেন এবং যে তাবাকারই হোক না কেন তাদের জারহ্-তাদীল বা সামালোচনা বা নকদ বা যাচাই যাই বলুন এ কাজটি তাঁরা শুরু করেন তাঁদের উস্তাযের তাবাকা থেকে

এবং শেষ করেন তাবেঈনের জামাতে গিয়ে। আর অল্প সংখ্যক থাকে যারা সমবয়সী। ছোটদের থেকে এর সংখ্যা থাকে নিতান্তই সামান্য।

### খুবই স্বাভাবিক ও দারুন বিষয়

খুবই স্বাভাবিক বিষয়। একজন মুহাদ্দিসের সামনে যখন একটি সনদ আসে তখন তিনি সে সনদের একেক জন বর্ণনাকারীকে যাচাই করতে থাকেন। জারহ্-তাদীল করতে থাকেন। আর বলাই বাহুল্য, আমার সামনে যে সনদ থাকবে সে সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী আমার আগের হবে এবং বড় হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ছোটরাই সমালোচনা করবে এবং বড়দেরই সমালোচনা করবে। এটাই হাজার দেড় হাজার বছরের ইতিহাস। ইতিহাস না পড়ে, উলূমে হাদীসের বারান্দা দিয়ে না হেঁটে এখন নতুন করে প্রতিদিন অবাক হওয়ার জন্য এবং প্রতিদিন ইলমের উপর বিরক্ত হওয়ার জন্য কে দায়ী? কাকে দায়ী করা যাবে?

আরো দারুন বিষয় হচ্ছে, এটা উলূমে হাদীসের কোন বৈশিষ্ট্য নয়। যে কোন শাস্ত্রের এ একই অবস্থা। ফিকহ বিভাগ দেখুন। আগের ইমাম যা বলে গেছেন পরের ইমাম তার ভুল ধরছেন। যাঁর ভুল ধরেছেন তিনি উস্তায। আর যিনি ভুল ধরছেন তিনি তাঁর ছাত্র। এছাড়া এর বিকল্প ব্যবস্থাই বা কী? সলফ যা বলে গেছেন, করে গেছেন তাতো খলফের সামনে আছে। কিন্তু খলফ ভবিষ্যতে যা করবে তাতো সলফের সামনে থাকা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই ইলমের সকল শাখার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে যে, খলফ সলফের কাজের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সঙ্গে দ্বিমত করেছে। আর বহু ক্ষেত্রে পরবর্তীর সিদ্ধান্তই মুফতা বিহী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

### কিন্তু সত্য সত্য হয়েই কী লাভ?!

কিন্তু এসব সত্য সত্য হয়ে কী হবে? মায়াকান্নাতো আর সত্যের জন্যও নয়, বড়র জন্যও নয়। মায়াকান্নাতো নিজের মতলবের জন্য। মতলবের বিপরীত হওয়ার কারণে এ জীবনে আমরা কত সত্য আর কত বড় বড়কে বাম হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়েছি তার কোন হিসাব নেই। নিজের মতলবের সমর্থক হিসাবে সলফের যে অঙ্গকে খুঁজে পেয়েছি সে অঙ্গকে বড় থেকে আরো বড় বানিয়ে বাকি সব অঙ্গকে ছোট থেকে ছোট বানানোর সকল ব্যবস্থা করেছি। আর এ বিষয়ে আমাদের প্রতিভার কোন তুলনা হয় না।

অনেকে হয়ত মনে করার চেষ্টা করবেন যে, সলফের জারহ-তাদীলের সঙ্গে এসব সমালোচনাকে তুলনা করাও আরেক বেয়াদবি। তাদের জন্য নিবেদন হচ্ছে, যতক্ষন পর্যন্ত তারা সলফের সে কাজগুলো সরাসরি না

দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর সঠিক পরিমাপ করতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব কিতাব না দেখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মোনাযারার মজলিস গরম রাখতে পারবেন। কিতাব মুতালাআ করার পর আশা করি মোনাযারা করার মত আগ্রহ আর থাকবে না।

সলফের সে কর্মকাণ্ডগুলো দেখার পর একটু ইনসাফের সাথে মিলিয়ে দেখবেন, অমিলগুলো কোথায়? একটা অমিলতো আছেই, আমরা ছোট আর তাঁরা বড়। কিন্তু এ অমিল দেখার সময় এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা যাঁদের জার্‌হ করেছিলেন তাঁরাও তাঁদের চাইতে বড় ছিলেন। তাঁদের উভয় পক্ষ যেমন একই শতাব্দীর ছিলেন তেমনি আমরাও একই শতাব্দীর মানুষ। বরং জার্‌হ-তাদীলের বিভাগে পাঁচশত এক হাজার বছর পরের ব্যক্তিও পাঁচশত এক হাজার বছর আগের ব্যক্তির উপর জার্‌হ করে গেছেন।

## তবে খুব বিরক্তিকরও

এ কথাগুলো লিখতেও আজ বড় বিরক্তি লাগছে। এ লোকগুলো যদি ইলমের দু'চারটা পৃষ্ঠা পড়ে দেখত, দু'চার দিন যদি ইলমের সঙ্গে দেখা হত তাহলে আজ এ কাঁচা বিষয়গুলো নিয়ে এতগুলো পৃষ্ঠা নষ্ট করতে হত না। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, আকাবিরের প্রথম বা দ্বিতীয় সারির চেয়ার দখল করে বসে আছে, কিন্তু দেড় দুই ঘন্টা কিতাব নিয়ে তার পেছনে পেছনে ঘোরার পরও আধা পৃষ্ঠা লেখা তাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পারিনি। বসে আছেন, কথা বলছেন, শের পড়ছেন। অনুরোধ করতে থাকলাম, এ আধা পৃষ্ঠা লেখা একটু দেখুন। দেখেননি।

যাই হোক, এটা হচ্ছে জীবনের এক তিক্ত বাস্তবতা। বাস্তবতার উপর রাগ করে লাভ নেই, তবে ব্যথা জাগতে বাধা নেই। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হয়, আর সে আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কথা ছিল ইতিহাসের পাতা থেকে বড়দের সঙ্গে বেয়াদবীর কিছু চিত্র দেখাব। এবার সে দিকে যাচ্ছি। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। বেয়াদবীর চিত্র আমি কেন তুলে ধরছি? প্রজন্মকে বেয়াদবীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য? সম্মানিত পাঠক মনে রাখবেন, এ চিত্রগুলো যদি বেয়াদবীর হয়ে থাকে তাহলে মানতে হবে এ বেয়াদবী ফরয। দ্বীনের জন্য এ বেয়াদবী ফরয। ইসলামের স্বার্থে এ বেয়াদবী ফরয। মুসলমানদেরকে বাঁচানোর তাগিদে এ বেয়াদবী ফরয। ইমাম ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রাহিমাহুল্লাহর ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করে আমি আমার বোঝা কিছুটা হলেও হালকা করতে পারব বলে আশা করছি।

## কমপক্ষে ইলমের মাত্র দু'টি পাতা

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خلّاد، قال: قيل «ليحيى بن سعيد» : أما تخشى أن يكون الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يقول: لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ البيهقي في دلائل النبوة.

'আলকামেল ফী যু'আফাইর রিজাল' কিতাবে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে-

وَفِي كِتَابِي بِخَطِّي عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ الطَّرْسُوسِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ خَلادٍ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى يَحْيى بْنِ سَعِيد فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا تَرَكْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَتَكَلَّمُونَ؟ قُلْتُ: يَذْكُرُونَ خَيْرًا، إلاَّ أَنَّهُمْ يَخَافُونَ عَلَيْكَ مِنْ كَلامِكَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّي؛ لأَنْ يَكُونَ خَصْمِي فِي الآخرة رجل مِنْ عَرَضِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمِي فِي الآخِرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَلَغَكَ عَنِّي حَدِيثٌ وَقَعَ فِي وَهْمِكَ أَنَّهُ عَنِّي غَيْرُ صَحِيحٍ، يَعْنِي فَلَمْ تُنْكِرْهُ.

(الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، في خطبة الكتاب.)

ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পূর্বসূরিদের কাছ থেকেই এ মূলনীতি শিখেছিলেন। ইমাম বায়হাকী রহ. পূর্বোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْغَضَائِرِيُّ ببغداد، حدثنا أحمد ابن سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ محمد الصائغ، حدثنا عفّان: قال: حدثني يحيى ابن سعيد القطان، قال: سألت شعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ الرجل يتهم في الحديث ولا يحفظ؟ فقالوا: بيّن أمره للناس.

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাঈন রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর আগে ও পরের জার্‌হ-তাদীলের ইমামগণের আরো কিছু বক্তব্যও এখানে দেখা যেতে পারে।

فِي آخَرِينَ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ، مِنْهُمْ فِي شُيُوخِ شُيُوخِنَا الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ تِلْمِيذُهُ شَيْخُنَا، وَفَاقَ فِي ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ أَدْرَكَهُ، وَطُوِيَ الْبِسَاطُ بَعْدَهُ إِلَّا لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ، خُتِمَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَعَدَّلُوا وَجَرَّحُوا، وَوَهَّنُوا وَصَحَّحُوا، وَلَمْ يُحَابُوا أَبًا وَلَا ابْنًا وَلَا أَخًا.

وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ كَانَ مِنَ الْوَرَعِ بِمَكَانٍ، كَالْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ صَاحِبِ (الْكَمَالِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ) الْمُخَرَّجِ لَهُمْ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ الَّذِي هَذَّبَهُ الْمِزِّيُّ وَصَارَ كِتَابًا حَافِلًا، عَلَيْهِ مُعَوَّلُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَاخْتَصَرَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ، وَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مَنْ لَمْ يُشَكَّ فِي وَرَعِهِ ; كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، بَلْ قَالَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. وَابْنِ الْمُبَارَكِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنِ ادْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنِ الْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُحَرَّرِ لَاخْتَرْتُ أَن الْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَابْنِ مَعِينٍ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي أُنَاسٍ قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي الْجَنَّةِ. وَالْبُخَارِيِّ الْقَائِلِ: مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ. وَحُجَّتُهُمُ التَّوَصُّلُ بِذَلِكَ لِصَوْنِ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّ حَقَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ الْمُقَدَّمُ. فتح المغيث، المتكلمون في الرجال.

أنا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ الْبَلْخِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مَهْرَوَيْهِ بْنِ سِنَانٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: " إِنَّا لَنَطْعُنُ عَلَى أَقْوَامٍ لَعَلَّهُمْ قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ سَنَةٍ قَالَ ابْنُ مَهْرَوَيْهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ كِتَابَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ فَبَكَى وَارْتَعَدَتْ يَدَاهُ حَتَّى سَقَطَ الْكِتَابُ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَسْتَعِيدُنِي الْحِكَايَةَ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ " وَكَلَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الرُّوَاةِ أَمْرًا لَا يَجُوزُ مَعَهُ قَبُول رِوَايَتِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِظْهَارُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُكْتَفَى فِي قَبُولِهِ لِمُجَرَّدِ الصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا لَا يُكْتَفَى بِذَلِكِ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. في بحث كَتْبُ كَلَامِ الْحُفَّاظِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ)

এ বর্ণনাগুলো আমাদের যে বার্তা দিয়ে যায় তা হচ্ছে, জার্‌হ-তাদীলের ক্ষেত্রে তাঁরা যা করেছেন তা হুঁশের সাথে করেছেন, বিষয়ের ভয়াবহতা মাথায় রেখেই করেছেন। এরপরও দায়িত্বের খাতিরেই সব করেছেন।

বিষয়টি হচ্ছে দ্বীনের। বিষয়টি হচ্ছে আমানতের। বিষয়টি হচ্ছে আখেরাতে জবাবদিহীতার। বিষয়টি হচ্ছে ফরয দায়িত্ব আদায়ের। সে ফরয দায়িত্ব আদায়ের কিছু নমুনাই এখানে তুলে ধরছি-

ক. ইমাম আলি ইবনুল মাদীনী রহ. এর বাবা একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে বাবা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার করণে বাবার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না। আর যদি কখনো করতেন তাহলে শাগরেদদেরকে সতর্ক করে বলে দিতেন, বাবার হাদীসে সমস্যা আছে। তোমরা সতর্ক থেক। ইবনে হাজার রহ. এর 'তাহযীবুত তাহযীব' কিতাবে বক্তব্যটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وقال عبدان الأهوازي سمعت أصحابنا يقولون حدث علي عن أبيه ثم قال وفي حديث الشيخ ما فيه.

ইমাম সাখাভী রহ. তাঁর 'ফতহুল মুগীস' কিতাবে বিষয়টি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন-

فَعَدَّلُوا وَجَرَّحُوا، وَوَهَّنُوا وَصَحَّحُوا، وَلَمْ يُحَابُوا أَبًا وَلَا ابْنًا وَلَا أَخًا، حَتَّى إِنَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ سُئِلَ عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: سَلُوا عَنْهُ غَيْرِي. فَأَعَادُوا، فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هُوَ الدِّينُ، إِنَّهُ ضَعِيفٌ. (من فتح المغيث للسخاوي، المتكلمون في الرجال)

খ. ওকী ইবনুল জার্‌রাহ রহ. এর বাবা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল ছিলেন। যার ফলে বাবা একজন মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও ওকী রহ. এককভাবে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করাকে মুনাসিব মনে করতেন না। সে কারণে যখনই তাঁর বাবা থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন সঙ্গে আরেকজন বর্ণনাকারীকে যুক্ত করে নিতেন। ফাতহুল মুগীসের উদ্ধৃতি দেখুন-

وَكَانَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ لِكَوْنِ وَالِدِهِ كَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، يُقْرِنُ مَعَهُ آخَرَ إِذَا رَوَى عَنْهُ.(من فتح المغيث للسخاوي، المتكلمون في الرجال)

গ. এরকমভাবে যায়েদ ইবনে আবী উনাইসা রহ. তাঁর ভাইয়ের বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার ভাইয়ের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করো না। ফাতহুল মুগীসের উদ্ধৃতি দেখুন-

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي. يَعْنِي يَحْيَى الْمَذْكُورَ بِالْكَذِبِ. (من فتح المغيث للسخاوي، المتكلمون في الرجال)

ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর ছেলেকে জার্‌হ করেছেন, ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর ছেলেকে জার্‌হ করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের অসংখ্য ইমাম, জার্‌হ-

তাদীলের ইমামগণ তাঁদের শত শত উস্তাদের উপর জার্‌হ করেছেন। এটি একটি সত্য ইতিহাস। তাঁরা কেন তা করেছেন তাও বলে গেছেন। সে কারণ যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে জার্‌হ করতে হবে সে কথাও তাঁরা বলে গেছেন।

এভাবে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের প্রশ্নে ছেলে বাবার বিরুদ্ধে বাবা ছেলের বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে তরবারী ধারন করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি, তেমনিভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইলমের আমানতের প্রশ্নে বাবার বিরুদ্ধে, উস্তাযের বিরুদ্ধে, কোন বড়র বিরুদ্ধে জার্‌হ-তাদীলের তীর নিক্ষেপ করতে সামান্যতম দ্বিধা করেননি। এ হচ্ছে উলূমে হাদীসের সলফের জীবন ও আচরণ। এখন একই বিভাগের খলফ কী করবে? তাদের কী করা উচিৎ।

## অনুজের দ্বিমুখী বিপদ

অনুজ যখন তার অগ্রজকে কোন বিদআতে লিপ্ত দেখবে, ইলমের মাপকাঠিকে লঙ্ঘন করতে দেখবে, দ্বীনের কোন ফরয আমলকে অস্বীকার করতে দেখবে, কুফরী শক্তীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে দেখবে, ঈমান ও কুফরের সীমারেখা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাধা দিতে দেখবে, হারাম ও হালালের সীমারেখা মুছে দিতে দেখবে, স্পষ্ট আয়াতের অপব্যাখ্যা করতে দেখবে, হাদীসের অপব্যাখ্যা করতে দেখবে, ইজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করতে দেখবে, উসূলে ফিকহের উসূলকে উপেক্ষা করে স্বপ্ন, কাশফ ও মুরাকাবার মাধ্যমে মাসআলা দিতে দেখবে, হাজার বছরের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেও মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে দেখবে, কিতমানে ইলম করতে দেখবে, পরিস্থিতির ভয়ে শত বছর যাবত শরীয়তের মাসআলা স্পষ্ট করে বয়ান না করে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যেতে দেখবে - তখন!

তখন একজন অনুজ কী করবে? তার কী করণীয়? শরীয়তের পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কী? এ ক্ষেত্রে সলফের কর্মপদ্ধতি কী? পরকালে তার জবাবের ব্যবস্থা কী?

## হলাম আমিই দোষী! কিন্তু

আর যদি কথা এটাই হয় যে, আমার ব্যক্তিগত আচরণের কারণে পুরা বিভাগ বদনাম হচ্ছে। তাহলে এ বিষয়ে আমার প্রথম নিবদন হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের কিছু ফরদ, অবাঞ্চিত কিছু সদস্য বিদআত, চুরি, কুফর, ভিক্ষা, দালালি ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে পুরা দেওবন্দ ও মানহাজে দেওবন্দের উপর এবং পুরা দেওবন্দিয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা বৈধ হয়নি। এমন কি দেখা গেছে, যারা সরাসরি এসব অপরাধে

লিপ্ত তাদেরকেও অপরাধী বলা যাচ্ছে না -এমতাবস্থায় উলূমে হাদীসের একজন ছাত্রের অপরাধে পুরা উলূমে হাদীসের বিরুদ্ধে কীভাবে ফাতওয়া দেয়া বৈধ হবে?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার ভুলগুলোতো আমি গোপন রাখিনি। আমার ভুলের একটি ভাণ্ডারের উপর দিয়ে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও ভুলগুলো কী তা কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আপত্তি পাওয়া গেছে, ঠেলা ধাক্কা অনেক হয়েছে, বিপজ্জনক বলে কমপক্ষে দুই শত হাত দূরে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আজো পর্যন্ত বলা হয়নি যে, সমস্যাগুলো কী? এখন হয়তো বছর পেরিয়ে যাবে। ঠেলা-ধাক্কার পরিমাণ বাড়তে থাকবে। কিন্তু কোন আল্লাহর বান্দা ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেবে না।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, আমি আবদার করেছিলাম আমার কাজের কোন পৃষ্ঠাটি? কোন অনুচ্ছেদটি? কোন ছত্রটি? কোন বাক্যটি এবং কোন শব্দটি সলফের তরীকার খেলাফ হয়েছে এবং উসূলে ফিকহ, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলুদ দাওয়ার ও আদাবুল ইখতিলাফের খেলাফ হয়েছে তা চিহ্নিত করে দিলে উম্মত উপকৃত হতে পারত, উম্মত সতর্ক হতে পারত। কিন্তু আজো পর্যন্ত তা করা হয়নি।

এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই কেউ কেউ বলে উঠতে পারেন, পট্টি কত জায়গায় লাগাবে? পুরোটাইতো ক্ষত। এ মহান ব্যক্তির কাছে আমার আবেদন, পুরা শরীরে ক্ষত হলেও একজন মানুষ মারা যায় না। তাই কমপক্ষে উদাহরণ হিসাবে একটি ক্ষত নির্ধারণ করা হোক এবং পট্টি লাগানো শুরু করা হোক। আর যদি বলেন, এ কাজের মাধ্যমে এ রোগী মারা গেছে তাই পট্টি লাগিয়ে লাভ নেই। তাহলে বলব, স্পষ্ট কুফরীর পরও যারা হাল্লাজের কলবে হাত দিতে রাজি নয় তারা কীভাবে আমার কলবের উপর হাত দিবে?

আল্লাহর ওয়াস্তে এড়িয়ে যাওয়ার পথ পরিহার করে ইলমের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। কেন আমাকে এবং আমার মত লাখো তালিবুল ইলমকে ইলমের আলোকে বিষয়গুলো বোঝাতে পারবেন না। একটু চেষ্টা করে দেখুন।

### এ ভুলের আসামী কে?

**বড়রা আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে**, যে ভুলের দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা চলছে সে ভুল আমার একার নয়। এ ভুলের আসামী লক্ষ লক্ষ ওলামা তালাবা। আর এরা এমন ওলামা তালাবা যারা মওদূদীপন্থী জামাত শিবিরকে সমর্থন করে না। যারা গায়রে মুকাল্লিদদেরকে গোমরাহ মনে করে। যারা আহমদ রেজা খান বেরেলভীর নীতির অনুসারী বাতেনী রাষ্ট্রের সকল পথ

ও পন্থা এবং সকল হর্তা-কর্তাদেরকে গোমরাহ মনে করে। যারা মাযহাবের অনুসরণকে জরুরি মনে করে। যারা হয়ত সরাসরি নয়ত কোন মাধ্যমে দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। এবং দারুল উলূম দেওবন্দের বৈধ সন্তান। দারুল উলূম দেওবন্দ যাদেরকে সন্তান হিসাবে স্বীকার করে।

বড়দের মাথায় এ বাস্তব অবস্থাটি থাকলে সবার জন্য ভালো হত। নয়ত হঠাৎ যে দিন তুফান এসে দোরগোড়ায় আছড়ে পড়বে সে দিন হয়ত বলা যাবে, আমাদেরকে আগে কেন খুলে বলনি? কিন্তু এ দাবি তখন কোন কাজে আসবে না।

## একটু হিম্মত করুন

উলূমে হাদীসের বারান্দা দিয়ে যারা কখনো হাটেননি এবং বেয়াদব হয়ে যাওয়ার ভয়ে কখনো হাটবেনও না তাদের জন্য সামন্য প্যারাসিটামল হিসাবে একটু ব্যবস্থা এখানে দিয়ে দেয়া হল। কষ্ট করে পড়বেন, বুঝবেন, চিন্তা করবেন এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন-

قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ كلمنا شُعْبَة أَنا وَعباد بن عباد وَجَرِير بن حَازِم فِي رجل يُرِيد أبان بن أبي عَيَّاش فَقُلْنَا لَو كَفَفْت عَنهُ فَكَأَنَّهُ لَان وأجابنا قَالَ فَذَهَبت يَوْمًا أُرِيد الْجَامِع فَإِذا شُعْبَة يُنَادي من خَلْفي فَقَالَ ذَاك الَّذِي قُلْتُمْ لَا أرَاهُ يسعني.

قَالَ عَفَّان: كنت عِنْد إِسْمَاعِيل بن علية فَحدث رجل عَن رجل فَقَالَ لَا تحدث عَن هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بثبت فَقَالَ اغْتَبْته فَقَالَ مَا اغتابه وَلكنه حكم عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بثبت.

وَقَالَ ابن مهْدي: مَرَرْت مَعَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِرَجُل فَقَالَ كَذَّاب وَالله لَوْلَا أَنه لَا يحل لي أَن أسكت لسكت

وَقَالَ أَبُو نعيم: حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن بن عون قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِيَّاكُمْ والمغيرة بن سعيد وَأَبا عبد الرَّحْمَن فَإِنَّهُمَا كذابان.

وَإِنَّمَا يجوز للمجرح أَن يذكر الجرح بِمَا فِيهِ مِمَّا يرد حَدِيثه لما فِي ذَلِك من الذب عَن الحَدِيث وَكَذَلِكَ ذُو الْبِدْعَة يذكر ببدعته لِئَلَّا تغتر بِهِ النَّاس حفظا للشريعة وذبا عَنْهَا وَلَا يذكر غير ذَلِك من عيوبه لِأَنَّهُ من بَاب الْغَيْبَة.

قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: فِي صَاحب الْبِدْعَة يذكر ببدعته وَلَا يغتاب بِغَيْر ذَلِك يَعْنِي وَالله أعلم أَن يُورد مَا فِيهِ لَا على وَجه السب لَهُ أَو يُقَال فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَأَما أَن يذكر مَا فِيهِ مِمَّا يثلم دينه على وَجه التحذير مِنْهُ فَلَيْسَ من بَاب الْغَيْبَة وَالله أعلم.

من كتاب "التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح" المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ المحقق: د. أبو لبابة حسين الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع — الرياض.

– فِيمَا لَيْسَ بغيبة ذكر النَّوَوِيّ فِي رياض الصَّالِحين وَالْغَزالِيّ فِي إحْيَاء عُلُوم الدّين – وَغَيرهمَا فِي غَيرهمَا أَن غيبَة الرجل حَيا وَمَيتًا تُبَاح لغَرَض شَرْعِي لَا يُمكن الْوُصُول إِلَيْهِ إِلَّا بهَا وَهِي سِتَّة:

التظلم فَيجوز للمظلوم أَن يتظلم إِلَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا مِمَّن لَهُ ولَايَة أَو قدرَة على إنصافه من ظلامه فَيَقُول فلَان ظَلَمَنِي كَذَا الِاسْتِعَانَة على تَغْيِير الْمُنكر ورد العَاصِي إِلَى الصَّوَاب فَيَقُول لمن يَرْجُو مِنْهُ إِزَالَة الْمُنكر فلَان يفعل كَذَا فأزجره الاستفتاء فَيَقُول للمفتي ظَلَمَنِي أبي بِكَذَا فَمَا سَبَب الْخَلَاص مِنْهُ تحذير الْمُؤمنِينَ من الشَّرّ ونصيحتهم وَمن هَذَا الْبَاب الْمُشَاورَة فِي مصاهرة إِنْسَان أَو مشاركته أَو ايداعه أَو مُعَامَلَته أَو غير ذَلِك وَمِنْه جرح الشُّهُود عِنْد القَاضِي وجرح رَوَاةُ الحَدِيث وَهُوَ جَائِز بِالْإِجْمَاع بل وَاجِب للْحَاجة وَمِنْه مَا إِذا رأى متفقها يتَرَدَّد – إِلَى المبتدع أَو فَاسق يَأْخُذ عَنهُ الْعلم وَخَافَ أَن يتَضَرَّر المتفقه بذلك فنصحه بِبَيَان حَاله بِشَرْط أَن يَقْصِدهُ النصح وَلَا يحملهُ على ذَلِك الْحَسَد والاحتقار أَن يكون مجاهرا بِفِسْقِهِ أَو بدعته فَيجوز ذكره بِمَا يُجَاهر بِهِ دون غَيره من الْعُيُوب.

التَّعْرِيف كَأَن يكون الرجل مَعْرُوفا بِوَصْف يدل على عيب كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول وَغَيرهَا فَهَذِهِ سِتَّة أَسبَاب وَيلْحق بهَا غَيرهَا مِمَّا يناظها ويشابهها ودلائلها فِي كتب الحَدِيث مَشْهُورَة وَفِي كتب الْفَنّ مسطورة.

من بداية كتاب "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" (الإيقاظ الثاني)

المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: ١٣٠٤هـ)

المحقق: عبد الفتاح أبو غدة

الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب

الطبعة: الثالثة، ١٤٠٧هـ

ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে বিষয়টি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। এরপরও আশা করি পাঠক এর মাঝে কিছু খোরাক পাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

*************************

# নিঃশব্দ হাদীসের পাঠদান-উসূলে হাদীস

উসূলে হাদীস ও উলূমে হাদীসেরতো এখন অনেক বদনাম। আর এ লেখক উলূমে হাদীসের ছাত্র হওয়ার অপরাধে উলূমে হাদীসের পক্ষে কিছু বলা মানেই নিজের পক্ষে বলা। তাই তোহমত বা অভিযোগ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কিন্তু অভিযোগের ভয়ে সত্য না বলারও কোন বৈধতা নেই। তাই এবারের শিরনাম নিঃশব্দ হাদীসের পাঠদান এবং উসূলে হাদীস। আমাদের এবারের চিত্রটি ইলমের মারকায থেকে। তাও সাধারণ মারকায নয়। যে মারকাযে না গেলে বদদোয়া নির্ধারিত এবং যে মারকাযে না গেলে দ্বীনের কাজে না লেগে বদলা-কামলা দিতে হয়, দিনমজুর খাটতে হয়।

### বড়

অমাদের ................ রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন যে, তাঁর শেষ জীবনে হাদীসের দরস দানের পদ্ধতি ছিল, খাদেম তাঁকে কোলে করে এনে দরসে বসিয়ে দিতেন। তিনি দরসের পুরা সময় চুপচাপ বসে থাকতেন, কোন কথা বলতেন না। ঘন্টা শেষ হলে খাদেম তাঁকে কোলে করে বাসায় দিয়ে আসতেন। তালিবুল ইলমরা পড়ে যেত। তিনি হাঁ না কিছুই বলতেন না। এভাবে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তিনি হাদীসের দরস দিয়েছেন। আল্লাহ এভাবে তাঁদেরকে হাদীসের দরসের জন্য কবুল করেছেন।

### ছোট

কতৃপক্ষ এ কাজটি ঠিক করেনি। বড় মুহাদ্দিস সাহেবও তাদেরকে এ কাজের অনুমতি দিয়ে ঠিক করেননি। যদি মুহাদ্দিস সাহেবের অবস্থা এমন হয় যে, কি হচ্ছে তিনি তার কিছুই জানেন না তাহলে ঠিক না হওয়ার পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। দুই বছরের হাজার হাজার ছাত্রের লক্ষ লক্ষ ঘন্টা এভাবে ব্যয় করার অনুমতি শরীয়তে নেই। আর কেন্দ্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানে এমন একটি ঘটনা ঘটলে তা নাদান উম্মতের জন্য আদর্শের মত হয়ে যায়। ফলে এ অন্যায়টি তারাও করার চেষ্টা করে। উম্মতকে এমন একটি কাজে উদ্বুদ্ধ করা একেবারেই ঠিক হয়নি। উপরন্তু এ অন্যায়টিকে ইলমের ফযীলত হিসাবে প্রচার করে অন্যায়ের মাত্রা যারা বাড়িয়ে চলেছে তারা কোনভাবেই ক্ষমা পেতে পারে না।

কারণ, উলূমে হাদীসের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা উসূলে হাদীসের যেসব কিতাব পড়ে থাকে সেসব কিতাব থেকেই তারা জানতে পারে যে, একজন

মুহাদ্দিস যত বড় মুহাদ্দিসই হোক না কেন এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা যত আকাশছোঁয়াই হোক না কেন সর্বাবস্থায় বয়সের কারণে যদি তিনি হাদীস পড়াতে না পারেন তাহলে তিনি হাদীসের দরস থেকে অব্যহতি নেয়া জরুরি। যদি তিনি অব্যহতি না নেন তাহলে তাঁর অতীত অর্জনও হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে।

অর্থাৎ, বয়সটা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, لا يدري ما يحدث তখন তাঁর উচিত হচ্ছে হাদীস পড়ানো বন্ধ করে দেয়া। تغير بأخرة، اختلط بأخرة، اختلط في آخر عمره، ذهبت حافظته في آخر عمره ইত্যাদি বাক্যগুলো হাদীসের পরিভাষা হিসাবে খুবই পরিচিত। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এমন সব বর্ণনাকারীদের কাছ থেক হাদীস গ্রহণ করতে সতর্ক থাকতেন।

কোন মুহাদ্দিসের অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার স্মরণশক্তি হারিয়ে যাওয়ার পরের বর্ণনা ও আগের বর্ণনাকে আলাদা করা যায় না, তাহলে তাঁদের সকল বর্ণনা দুর্বল হিসাবে পরিগণিত হয়। এমন কি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যদি এরকম কোন বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করে তখন তার হাদীসও দুর্বল হিসাবে পরিগণিত হয়। নির্ভরযোগ্য শাগরেদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এ কথা প্রমাণিত হতে হবে যে, এ নির্ভরযোগ্য শাগরেদ তার উস্তাদের স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার আগে তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছে। যদি উস্তাযের স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার পর তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করে, অথবা আগে করেছে না কি পরে করেছে তা জানা না থাকে, তাহলে এ নির্ভরযোগ্য শাগরেদের হাদীসও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

এ বিষয়গুলো উলূমে হাদীসের প্রথম সাময়িকের ছাত্রদের পড়ার বিষয়। আজ অজ্ঞতার কারণে যে বিষয়গুলো সলফের কাছে গর্হিত ছিল, সে বিষয়গুলো ফযীলতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ছিল অপরাধ তা আজ গর্বের বিষয়।

## দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজ

আজ দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজের শুধুমাত্র 'শরহে নুখবা' ও 'মুকাদ্দিমাতু সহীহি মুসলিম'কেও যদি আমরা স্বীকার করে নিতাম তাহলেতো এ দুর্দশার শিকার হতে হত না। শিব্বীর আহমদ ওসমানী রহ. এর 'মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল মুলহিম শরহু সহীহি মুসলিম' ও শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর 'মুকাদ্দিমাতু আওজাযিল মাসালিক' যদি আমাদের মুতালাআ থাকত তাহলে কি সলফের উদ্ধৃতি দিয়ে সলফের বদনাম করা যেত?

যাফর আহমদ থানভী রাহিমাহুল্লাহর 'মুকাদ্দিমাতু ইলাইস সুনান' যদি আমাদের হাতের নাগালে থাকত তাহলে কি আমরা নিজের মত করে ফযীলতের বিষয়গুলা তৈরি করতে পারতাম? আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ., ইউসুফ বিন্নুরী রহ., আব্দুল হাই লাখনৌভী রহ. ও মুফতী আমীমুল ইহসান রহ. প্রমুখের রচনাবলী যদি আমাদের অধ্যয়নে থাকতো তাহলে কি এসব বিষয়ে ছোটদের কোন কথা বলার প্রয়োজন হত?

আমরা তা করিনি। এর পরিবর্তে শুধু ছোটদেরকে চোখ রাঙ্গিয়েছি। ধমক দিয়েছি। আমরা ছোটদের ছোট মনে আঘাত করেছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে চলার জন্য তাদের যে সাহস ও হিম্মতের যোগান দেয়ার প্রয়োজন ছিল সে যোগান না দিয়ে সে হিম্মতের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদের জীবনের বৈপরীত্যগুলো থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তাদেরকে আরো বৈপরীত্যের অনুশীলন করার জন্য তালকীন করেছি।

কেউ ঈমান-কুফরের বৈচিত্রের সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে চলেছে, আর কেউ বৈপরীত্যের ঠেলা-ধাক্কার মূর্ছনায় মূর্ছিত হয়ে চলেছে। কেউ আবার হারাম-হালালের সমান তালের জোয়ারের কল্লোল সুরে বিমুগ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে।

এমতাবস্থায়, কিছু ছোট গরিব তালিবুল ইলমের সামনে বার বার ভেসে উঠছে ইতিহাসের কিছু পৃষ্ঠা, দূর অতীতের কিছু ছবি, সলফের কিছু আকুতি, নিবেদন। পাঠককে নিয়ে এবার আমরা ঘুরে আসতে চাই সেই দূর অতীতে। বর্তমান শিরনামের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কিছু পৃষ্ঠার উপর চোখ বুলিয়ে আসি। হতে পারে শান্তনা পাওয়ার মত কোন ছায়া সেখানে থাকবে। চলুন তাহলে-

## ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.

**ক.** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। সেরাদেরও সেরা মুহাদ্দিস দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। হাদীস বর্ণনা করবেন না। দরজায় হাজার হাজার তালিবে হাদীসের ভিড়। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন না। একান্ত প্রয়োজনে নিজের সন্তানদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে এর উদ্ধৃতি দেখুন ৯/২৪৭ দারুল হাদীস কায়রো।

খ. ইমাম সুয়ূতী রহ. তাঁর তাদরীবুর রাবী কিতাবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন-

وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم، أو خرف، أو عمى، ويختلف ذلك باختلاف الناس) ، وضبطه ابن خلاد بالثمانين، قال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به. [تدريب الراوي] النوع السابع والعشرون

## কয়েকজন ইমামে হাদীসের শেষ জীবন

গ. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। তাই হাদীসের আমানত রক্ষা করতেই হবে। ব্যক্তির অযাচিত মূল্যায়নের চাইতে হাদীসের সংরক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই অনেক ঊর্ধ্বে। তাই বর্ণনাকারীও সচেতন, শাগরেদগণও সচেতন। এর চাইতে সুখের বিষয় হচ্ছে, এ সচেতনতার দ্বারা বর্ণনাকারীর কোন ক্ষতি হয়নি। বরং স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া বা শাগরেদগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়ার দ্বারা যেমনিভাবে হাদীস সংরক্ষিত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তিনিও সংরক্ষিত হয়ে গেছেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সারা জীবনের অর্জন সংরক্ষিত হয়ে গেছে। দু'চার বছরের ভুল সারা জীবনের সহীহ শুদ্ধ বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সহীহকে সন্দেহযুক্ত করার কোন সুযোগ রয়নি।

বর্তমানের নাদান উম্মত তা বোঝার মত মেধার ভাগী হয়নি। তাই আফসোস ছাড়া আর কিছু করার নেই। কয়েককজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যাঁরা শেষ জীবনে স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন সুয়ূতী রহ. এমন কয়েকজনের বিষয়ে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

(و) منهم: (حصين بن عبد الرحمن الكوفي) السلمي. قال الذهبي: لكنه ما ضر تغيره، فإنه لم يحدث بحديث في زمن التغير، ثم استدل بقول أبي داود: وتغير جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي، فحجب الناس عنهم. [تدريب الراوي] النوع الثاني والستون.

বলাবাহুল্য, এর দ্বারা তাঁদেরও মর্যাদার হানী হয়নি, হাদীসও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। বরং হাদীস সংরক্ষিত হওয়ার দ্বারা তাঁদের অতীত জীবনের হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারও সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

ঘ. সুয়ূতী রহ. এর তাদরীবুর রাবী থেকে আরেকটি উদাহরণ দেখুন-

(و) منهم: (أبو طاهر) محمد بن الفضل (حفيد الإمام) أبي بكر (ابن خزيمة). قال الحاكم: اختلط قبل موته بسنتين ونصف. قال الذهبي: ولم يسمع أحد منه في تلك المدة. [تدريب الراوي] النوع الثاني والستون.

**ঙ. ইমাম ও হাফেযে হাদীস ফকীহ আবুত তাইয়েব আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহানাফী আসসালূকী রহ. এর জীবন পড়ুন এবং দেখুন-**

الإِمَامُ الحَافِظُ الفَقِيْه اللُّغَوِيّ، أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَان، الحَنَفِيُّ الصعْلُوكِيُّ. سَمِعَ أَبَا الطَّيِّب يَحْيَى بنَ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيّ، وَعَلِيَّ بنَ الحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيّ، وَمُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاء، وَفِي الرِّحلَة مِنْ مُحَمَّدِ بنِ أَيُّوْبَ بِالرَّيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بن أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَطبقتِهِ بِبَغْدَادَ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو سَهْلٍ الصعْلوكِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الأَخْرَم.

قَالَ الحَاكِمُ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثاً وَاحِداً فِي المذَاكرَة، وَكَانَ إِمَاماً مقدَّمًا فِي الفِقْه وَاللُّغَة، وصنَّف فِي الحَدِيْثِ، وَأَمسكَ عَنِ الرِّوَايَة بَعْد أَنْ عَمر، أَوْ قَالَ: عَمِي، وكنَّا نرَاهُ حَسْرَة، رَحِمَهُ اللهُ.

تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائة. (سير أعلام النبلاء، للذهبي. ٣٠٦٢- الصعْلُوكِيُّ)

তাঁর অসামান্য যোগ্যতা সময়মত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তাঁকে বাধা দেয়নি। আমরা এবং আমাদের মাশায়েখ আরেকটু বেশি কিছুই দাবি করতে চাই। নচেৎ আমাদের আর তাঁদের মাঝে এত ব্যবধান কেন?

চ. আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ আলখুরাইবী রহ. এর জীবন অধ্যয়ন করুন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর জন্য কী উপাধিগুলো নির্বাচন করেছেন আর তিনি তাঁর এত যোগ্যতা নিয়ে জীবনের শেষ অংশে নিজের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকরীবুত তাহযীবের ইবারত দেখুন-

٣٢٩٧- عبد الله ابن داود ابن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي بمعجمة وموحدة مصغرا كوفي الأصل ثقة عابد من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة وله سبع وثمانون سنة أمسك عن الرواية قبل موته فلذلك لم يسمع منه البخاري [يعني بل روى عنه بواسطة] خ ٤

আলইরশাদ লিলখলীলী এর বিবরণ দেখুন-

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ كُوفِيُّ الْأَصْلِ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، رَوَى عَنْهُ الْقُدَمَاءُ مِثْلُ: مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ، أَمْسَكَ عَنِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ، وَاجْتَهَدُوا بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُمْ , وَيَرْوِي عَنْ مَالِكٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَافِظَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ بَدْرٍ، يَقُولَانِ. (الإرشاد للخليلي.)

ছ. আবু বকর জাফর ইবনে মুহাম্মদ ফিরয়াবী রহ. (মৃ: ৩০১ হি:) এর জীবন অধ্যয়ন করুন। ইবনে আসাকির রহ. এর তারীখে দিমাশক অধ্যয়ন করুন। তিনি বর্ণনা করেন-

علي الزيات أنه قال: لما ورد أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي إلى بغداد واستقبل بالطيارات والزبازب ووعد الناس له إلى شارع المنار ليسمعوا منه، فاجتمع الناس، فحزر من حضر مجلسه لسماع الحديث، فقيل نحو ثلاثين ألفا، وكان المستملون ثلاثمئة وستة عشر. كان ثقة، أمينا، حجة. وقال أحمد بن كامل القاضي: جعفر الفريابي كان مكثرا في الحديث، مأمونا موثوقا به. قال الدارقطني: قطع الفريابي الحديث في شوال سنة ثلاثمئة.

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: دخلت بغداد والفريابي حي، وقد أمسك عن التحديث، ودخلنا عليه غير مرة، ونكتب بين يديه، كنا نراه حسرة.

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: جعفر الفريابي ثقة متقن.

مات الفريابي ببغداد، سلخ ذي الحجة، سنة ثلاث مئة، والمحفوظ سنة إحدى وثلاث مئة. وولد سنة سبع ومئتين، وكان عمره أربعا وتسعين سنة. (تاريخ دمشق لابن عساكر.)

### সম্মানের কপট কপাটগুলো বন্ধ করতে হবে

এ হচ্ছে কিছু খণ্ডচিত্র যা প্রজন্মকে শেখাতে চায়, দ্বীনের উৎসগুলো হেফাযতের স্বার্থে, নিজের ইলমী জীবনকে স্বার্থক করার স্বার্থে, পরবর্তী উম্মতকে দ্বীনের উৎসগুলোর প্রতি আস্থাশীল রাখার স্বার্থে, সর্বোপরি দ্বীনের উৎসগুলোর সঙ্গে ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল রাখার স্বার্থে একটি সময় সীমায় এসে হাদীসের দরসদান থেকে বিরত থাকতে হবে। ইলমের দরসদান থেকে বিরত থাকতে হবে। ওস্তায নিজেও বিরত থাকবেন। শাগরেদরাও বিরত থাকার চেষ্টা করবেন।

এতে বেয়াদবীর কিছুই নেই। অবমূল্যায়নের কোন প্রশ্নই আসে না। মানহানীর কোন ব্যাপারই এখানে নেই। আমরা এমন কিছু পথে মান ইজ্জত

তালাশ করে ফিরছি যে পথে আমাদের সলফ মান ইজ্জত তালাশ করেননি। আবার এমন কিছু পথে আমাদের মান-ইজ্জত ক্ষয় হয়ে চলেছে যে পথে চলে আমাদের সলফের মান-ইজ্জত ক্ষয় হয়নি।

**রাসূল ও সাহাবায়ে রাসূলের ইজ্জত ক্ষয় হওয়ার রাস্তা ছিল দ্বারে দ্বারে হাত পাতা এবং ইজ্জত বাড়ার রাস্তা ছিল কাঠ কেটে খাওয়া। আমাদের ইজ্জত ক্ষয় হওয়ার পথ হচ্ছে কাঠ কেটে খাওয়া, আর ইজ্জত বাড়ার পথ হচ্ছে দ্বারে দ্বারে হাত পাতা। তাও আবার আল্লাহর দুশমনদের দ্বারে।** আমাদের হেকমত ও কৌশলের বাহারে আমরা সত্যিই বড় বিমোহিত, বিমুগ্ধ!

এগুলোই মূলত ছোটদের অপরাধ। তাই বার বার প্রশ্ন আসে, **কতটুকু উপাদানের ভিত্তিতে আজ ছোটদেরকে দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু বলে প্রচার করা হচ্ছে এবং কতটুকু দলিলের ভিত্তিতে এ প্রচার করাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে?** জানি না বড়রা কেন যে ভুলে যান, ছোটদের এ ছোট থাকার বয়স সর্বোচ্চ দশ/বিশ বছর। এ বছরগুলো পার হওয়ার পর ছোটদেরকে ছোট করার জন্য এবং বড়দেরকে বড় করার জন্য বড়-ছোটর প্রতিশব্দ হিসাবে কী ব্যবহার করা হবে? তা এখনই ভেবে রাখা উচিত।

*******************************************

## মানসুর হাল্লাজ চরিত-খতম তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয-একলক্ষ ফাতওয়া-ভেদে মারেফাত-ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা-সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও জিহাদ-ফাতাওয়ায়ে মাদানীয়া এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সমাচার

তালিবুল ইলমরা তাদের দরসী কিতাবের বাইরে ঐ বইটিই পড়বে যা তাদের জন্য উপযোগী। আর কোন বই তাদের জন্য উপযোগী তা বুঝে উঠা কখনো কখনো তালিবুল ইলমদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। সে কারণে বড়দের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তা করা উচিৎ। এ ক্ষেত্রে পরমর্শের যে চিত্রগুলো আমাদের সামনে এসেছে তার সামান্য চিত্রায়ন জরুরী মনে করছি।

### বড়

যেসব বইয়ে আমাদের আকাবিরের তাকরীয নেই সেসব বই পড়া যাবে না। যে চিন্তাধারার উপর আমরা বড় হয়েছি এবং আমাদের বড়রা বড় হয়েছেন সে চিন্তাধারার বই পড়তে হবে। নতুন কোন চিন্তাধারার বই পড়া যাবে না। বড়দের, বুজুর্গদের লেখা বেশি বেশি পড়তে হবে। সবাই যে দিকে আছে যে মতের উপর আছে সে দিকটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। বিশেষভাবে পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বইটি পড়া যাবে না। এ বইয়ে আকাবিরের সমালোচনা করা হয়েছে।

### ছোট

বড়দের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ছোটরা শিরনামে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বই পড়ে ফেলেছে। বুঝতে না পেরে 'পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি' বইটিও পড়ে ফেলেছে। কারণ তার উপরে লেখা ছিল, আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ-১। বড়রা এ বই পড়তে নিষেধ করবেন এমন সন্দেহ হওয়ার আগেই ছোটরা বইটি পড়ে ফেলেছে। অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ বই পড়ে ছোটরা যা পেয়েছে তাই এখানে তুলে ধরার বিষয়।

পঠিত প্রত্যেক বইয়ের আলাদা আলাদা প্রতিবেদন সামনে আসলে বুঝতে সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে। যা পাওয়া গেছে তার উপর বিশেষ রকমের বিশ্লেষণ করার মত আমাদের হিম্মত নেই। তাই শুধুমাত্র গ্যালারির একজন

দর্শক হিসেবে প্রত্যেকটি উদ্ধৃতির উপর অস্পষ্ট একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েই ক্ষান্ত করব। বাকি উপলব্ধি পাঠকের দায়িত্ব।

উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা শেষ হলে, আমরা দু'চার লাইনে শুধুমাত্র মনের বেদনাটুকু আরজ করব। আমাদের আর কিছু বলার নেই।

**মানসুর হাল্লাজ চরিত**

বড়দের নামেই বইটি বাজারে ছাড়া হয়েছে। এভাবে বহু বই বড়দের নামে বাজারে ছাড়া হয়। জানি না যাঁদের নামে ছাড়া হয় তাঁদের সঙ্গে এসব বইয়ের কী সম্পর্ক? যারা বাজারে বই ছাড়ে তাদের সাধারণত দ্বীনের চাইতে ব্যবসার পেরেশানীটাই বেশি থাকে। সে জন্য তাঁরা হয়তো এসব বইয়ের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবার জন্য খুব বেশি সময় পায় না। কিন্তু আমাদের যিম্মাদারগণ তা নিয়ে ভাববেন না, বা ভাবার সময় পাবেন না -এমনটি হওয়া কতটুকু বাঞ্ছণীয়?

বিশেষত যে বই পড়ে একজন তালিবুল ইলম, একজন সাধারণ আলেম, বা বাংলা ভাষার যেকোন পর্যায়ের একজন পাঠক তার দ্বীন ও ঈমান নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্ধে পড়ে যাবে। ঈমান ও কুফরের মাঝে কোন প্রকার সীমানা প্রাচীর খুঁজে পাবে না। একত্মবাদের ভয়ঙ্কর এক চিত্র অনুশীলন করতে গিয়ে মাবুদ থেকে আবেদকে আলাদাই করতে পারবে না, খালেক ও মাখলূক এক হয়ে যাবে।

যে কোটি কোটি মুসলমান এ ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো বুঝতে পারবে না তাদের সামনেই তা দিয়ে দেয়া হল। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আছি। হয়তো একই অবস্থা আমার মত লক্ষ লক্ষ পাঠকের। তাই পাঠকের দরবারে তটস্থ হৃদয়ের প্রতিবেদনটুকু তুলে ধরছি।

উম্মতের নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, বেখবর, সরল মানুষগুলো কমপক্ষ এতটুকু জেনে রাখুক যে, এসব কথার বিপরীতেও কথা আছে। বড় বড় কথাই শুধু কথা নয়; বড় বড় কথার বিপরীতে ছোট হলেও কিছু সত্য কথাও আছে।

এ ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রহ. এর মনের সে আকুতিটুকুই আমি অনুভব করার চেষ্টা করছি যা এ বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করে এসেছি। আমি আমার পাঠকবর্গকেও ইমাম যাহাবীর সে আকুতিটুকু অনুভব করার চেষ্টা করতে অনুরোধ করছি। যাহাবী রহ. এমন এক বিপদের মুখোমুখী হয়েই একাকি কেঁদেছেন, আর পাঠকদের সামনে বেদনামাখা কথাটুকু রেখে গেছেন-

ومن عرف هؤلاء الباطنية عذرني، أو هو زنديقٌ مبطنٌ للاتحاد ويذب عن الاتحادية والحلولية، ومن لم يعرفهم فالله يثيبه على حسن قصده. وينبغي للمرء أن يكون غضبه

لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزلل. فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافراً، مع أنا لا نشهد على أعيان هؤلاء بإيمانٍ ولا كفرٍ لجواز توبتهم قبل الموت. وأمرهم مشكل، وحسابهم على الله.

## স্রষ্টা হওয়ার দাবিদার কখনো মুসলমান হতে পারে না

**পৃ: ২৬, অনু: ৩ =** "জনৈক ব্যক্তি ইবনে মানছুরকে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল- তুমি নিজেই যখন স্রষ্টার দাবীদার, তখন তুমি কার পূজা কর? জবাবে তিনি বললেন, আমার 'যাহির' আমার 'বাতিন'কে সিজদা করে।"

**-? গ্যালারি থেকে:** আর কিভাবে হলে কথাটি কুফরী হবে? কথাটি বক্তা বলেছে, হুশের সাথে, প্রকাশ্যে, এর উপর বক্তা অটল, শব্দ ও দাবির মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই, তওবাও নেই।

## আলেমের ফাতওয়ার ভিত্তি হবে শুধু ইলম

**পৃ: ৩১, অনু: ৪ =** "অনেক সময় আরেফ বিল্লাহগণের হৃদয়ের উপর আল্লাহ পাকের তাজাল্লী-প্রতাপ তথা দ্যুতির প্রবাহ প্রবাহিত হয়। তিনি যদি সে প্রবাহের কথা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেন, তখন কামেল আরেফগণও অনেক সময় তার কথা অনুধাবন করতে পারেন না। আর যাদের গায়ে মারেফাতের হাওয়া লাগেনি, এমন যাহেরী আলেমগণ তার প্রতিবাদ আরম্ভ করে দেয়। তখন তারা এ কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যায় যে, যখন আল্লাহ পাক নিজ খাছ বন্ধু বা ওলীগণকে কারামত এবং অলৌকিকতা দান করে তাদেরকে মর্যাদাশীল করেছেন যা মজেজাতেরই একটি শাখা, সে ক্ষেত্রে তাদের যবানে এমন কথা চালু করবেন যা অনুধাবন করতে উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত অপারগ ও অক্ষম হবেন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামকে কী করতে হবে? সে হাওয়া লাগার আগ পর্যন্ত তাঁদের দায়িত্ব কী? যাহেরী আলেমদের হাত পা যে কুরআন হাদীসের রশি দিয়ে বাঁধা! তাঁরা কী করবেন? গর্দান থেকে এ রশি খুলে রেখে দেবেন? বাতেনী পক্ষের তরজমানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ কী?

## যাহেরী ইলম হিসাবেই ফাতওয়া হবে

**পৃ: ৩২, অনু: ২ =** "ঐ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও অর্থ তারাই অনুধাবন করতে সক্ষম যারা ঐ বক্তার সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রবেশ করেছে। কেননা এটা বেহেশতী বা ঐশী ভাষা। যে ভাষা শুধু ফেরেশতাগণই অনুধাবন

করতে পারেন অথবা আল্লাহ পাকের ঐ সমস্ত প্রিয় বান্দাগণ যারা মানবীয় দুর্বলতার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছেন, অথবা যাদের সঠিক নির্ভুল কাশফ দান করা হয়েছে অথবা বেলায়েতে 'উরুজ দান করা হয়েছে শুধু তাঁরাই এ জাতীয় বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম"।

**-? গ্যালারি থেকে:** আমরা যতটুকু জেনেছি, বেহেশতী ও ঐশী ভাষা হচ্ছে কুরআনের ভাষা। এ ভাষায় কুফর থাকবে কেন? বিষয়টি কি এ রকম, আমরা যে ভাষাকে ঈমানের ভাষা বলি তা ফেরেশতাদের কাছে কুফরের ভাষা, আর আমরা যে ভাষাকে কুফরের ভাষা বলি তা ফেরেশতাদের কাছে ঈমানের ভাষা? তাই যাহেরী ইলম অর্থাৎ কুরআন হাদীসের ইলম অনুযায়ী যা কুফর তা ফেরেশতাদের নিকট ঈমান। কিন্তু বিষয়টি একটু জটিল হয়ে গেল না? কুরআন হাদীসের আলোকে যা কুফর ফেরেশতাগণ তার বিপরীত বুঝতে যাবেন কেন?

আর যে ভাষা জাসসাস, কাযী ইয়ায, ইবনুল জাওযী, খতীব বাগদাদী, ইবনে খালদূন, ইবনে তাইমিয়া, যাহাবী, ইবনে কাসীর, ইবনে হাজার, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মানাযের আহসান গীলানী রাহিমাহুমুল্লাহ সহ অসংখ্য সালাফে সালেহীন বুঝতে পারেননি সে ভাষা বোঝা আমাদের জন্য কতটুকু জরুরী? দুনিয়াতে বসে বেহেশতী আচরণ যেমন সত্তর হাজার স্ত্রী, শরাব, রেশম ইত্যাদি বৈধ না হলে বেহেশতী ভাষা কেন বৈধ হবে যা কুরআন হাদীসের যাহেরী ইলমে কুফর?

## বিচার আদালত ইলমের ভিত্তিতেই হবে

**পৃ: ৩৩, অনু: ৪ =** "শায়খ আবু ফারায রহ. -এর মাকতূবাতে এমন কিছু শব্দ ছিল, যা দ্বারা বাহ্যত কুফরী কালিমা মনে হত, সে কারণে তাঁকে উলামায়ে কিরাম কাফের আখ্যায়িত করে"। (আল্লাহর ওলীদের পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত)

**-? গ্যালারি থেকে:** দোষটা কি শেষ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের? কুফরী কালিমা ওয়ালার কোন সমস্যা নেই? কোন দোষ নেই? আখেরাতের দাড়িপাল্লা কি কুফরের বিরুদ্ধে হবে? না কি কুফরকে কুফর বলার বিরুদ্ধে হবে?

## যাহেরীকে বাতেন বুঝাতে হবে কেন?

**পৃ: ৩৪, অনু: ৩ =** "শায়খ ইবনে আবু জামরা রহ: যখন বললেন, আমি জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করি। তখন লোকজন তার বিরুদ্ধে একটি সমাগম করে। এ ঘটনার পর তিনি নিজ ঘর থেকে বের হতেন না। শুধু জুমার দিন ঘর থেকে বের হতেন। আমৃত্যু

তার অবস্থা এটাই ছিল”। (আল্লাহর ওলীদের পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত)

**-? গ্যালারি থেকে:** সাহাবী হওয়ার এ সহজ পদ্ধতি কেন সবাই ত্যাগ করল? মানুষ বড় বোকা! তরজমান কেন বলে দিচ্ছেন না, শত শত বছর পর জাগ্রত অবস্থায় দেখার পদ্ধতিটি কী? আর সে পদ্ধতি যদি আমাদের বুঝে আসবে না জাতীয় হয়, তাহলে এসব ঘটনা আমাদেরকে শোনানোর মানেটা কী?

## মুশতাবিহ ভাষার বিধান কী?

**পৃ: ৩৪, অনু: ৭ =** “ইমাম গাযালী রহ.-কে প্রত্যাখ্যানকারী এবং তার কিতাব পুড়ানোর ফাতওয়া দানকারীদের মধ্যে কাযী ইয়ায  এবং ইবনে রুশদ মালেকীও ছিলেন। ইমাম গাযালী রহ. যখন এ সংবাদ জ্ঞাত হলেন, তখন তিনি কাযী ইয়াযের উপর বদদোয়া করলেন। ফলে তিনি হঠাৎ করে হাম্মামখানার মধ্যে মারা গেলেন”।

**-? গ্যালারি থেকে:** কাযী ইয়ায যখন গাযালীর ভাষা বোঝেননি তখন আমার আপনার দোষ কী? কাযী ইয়াযকে অতিক্রম করে গাযালীর ভাষা বোঝার জন্য কেন আমাদেরকে প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে?

আর ইতিহাস বলে, গাযালী রহ. এর ইন্তেকাল হয়েছে ৫০৫ হিজরীতে, আর কাযী ইয়ায রহ. এর ইন্তেকাল হয়েছে ৫৪৪ হিজরীতে। কার বদদোয়ায় কে মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টি কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

গাযালী আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার উপর ক্ষমতার লোভ ও খেয়ানতের অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু সে কারণে গাযালী বদদোয়ার উপযুক্ত হল না, ইমাম আবু হানীফা রহ.কে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে সে কারণেও বদদোয়ার উপযুক্ত হল না। কিন্তু কাযী ইয়ায রহ. দলিলভিত্তিক একটি ফাতওয়া দেয়ার কারণে এভাবে বদদোয়া পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেল। বিষয়গুলো যেন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

গাযালীর ‘সিররুল আলামাইন’ কিতাবের ‘বাবু তারতীবিল খিলাফাতি ওয়াল মামলাকাহ’ অধ্যায়টি দেখুন।

গাযালীর বক্তব্য-

واجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فقال عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي

ومولى كل مولى، فهذا تسليم ورضى وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة، وحمل عمود الخلافة وعقود النبوة وخفقان الهوى في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار، وسقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لكم إشكال الأمر واذكر لكم من المستحق لها بعدي.

قال عمر رضي الله عنه دعوا الرجل فإنه ليهجر وقيل يهدر، فإذا بطل تعلقكم بتأويل النصوص فعدتم إلى الإجماع: وهذا منصوص (لعله: منقوض) أيضا فإن العباس وأولاده وعلياً وزوجته وأولاده لم يحضروا حلقة البيعة وخالفكم أصحاب السقيفة في متابعة الخزرجى ...... (سر العالمين وكشف ما في الدارين، من مجموعة رسائل الإمام الغزالي ص: ٤٨٣)

এমনিভাবে তার কিতাব 'আলমানখুল' এর كتاب الفتوى، الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض অধ্যায়টি দেখুন। আমরা সামান্য তুলে ধরলাম। আপনি শেষ পর্যন্ত দেখুন। বদদোয়ার মাপকাঠিগুলো মিলিয়ে দেখুন। ইনসাফের সাথে একটু বিচার করুন।

গাযালীর বক্তব্য-

وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا؛ لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس. وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول ويتبين ذلك باستثمار مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم. (ص: ٤٧١)

وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل وتقعيد المذاهب فكثر خبطه لذلك وكذلك يقع ابتداء الأمور، ولذلك استكنف (لعله: استنكف) أبو يوسف ومحمد من أتباعه في ثلثي مذهبه لما رأوا فيه من كثرة الخبط والتخليط والتورط في المناقضات. (ص: ٤٩٦)

وأما ابو حنيفة رحمه الله فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها فإنا نعلم ان جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى استحثاث على مكارم الاخلاق وزجر عن الفواحش والكبائر واباحة تغني عن الجرائر وتعين على امتثال الاوامر وهي بمجموعها تنقسم إلى تعبدات ومعاملات وعقوبات فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها، فأما

العبادات فأركانها الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة والقول في تفاصيله يطول وثمرة خبطه بين فيما عاد اليه اقل الصلاة عنده.... (ص: ٥٠٠)

وهذا مما يفهم كل غر غبي وكل بالغ صبي، فلو لا أشد الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه فضلا من أن يستد نظره وعقله، ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه إذا اتهموه برومه خرم الشرع. (المنخول ص: ٥٠٣ دار الفكر المعاصر، بيروت)

**কিন্তু কেন?**

**পৃ: ৩৭, অনু: ১ =** "ছুফিয়ায়ে কেরাম-ই আক্বীদায়ে তাওহীদের সব চেয়ে বেশি ধারক ও বাহক। কেননা অন্যদের নিকট বিষয়টি আকলী ও নকলী তথা যুক্তিগত ও বর্ণনাপ্রসূত। কিন্তু ছুফিয়াদের নিকট বিষয়টি আকলী ও নকলী হওয়ার সাথে সাথে কাশফী ও বদেহী অর্থাৎ উন্মোচিত ও স্বতঃসিদ্ধ-স্বভাবজাত"।

**-? গ্যালারি থেকে:** তার মানে কুরআন হাদীসের মাধ্যমে অর্জিত ইলম দুই নম্বর ইলম! শুধু শুধু এর পেছনে সবার জীবন শেষ হচ্ছে। ইলম নেয়ার দরকার ছিল লালন ফকিরের কাছ থেকে, যে হাল্লাজের মাযহাবের স্মরণকালের সবচাইতে বড় ভক্ত ছিল। আর বদেহী ইলম মানেই হচ্ছে, তারা ওহির মাধ্যমে ইলমগুলো সরাসরি পায়। ওহি ছাড়া কোন গতি নেই। কারণ কাশফ-ইলহাম তো ইলমই নয়। তা বদেহী আর নযরী হবে কোত্থেকে?

**দুর্বলতা কেন ফযীলত হল?**

**পৃ: ৩৭, অনু: ২ =** "ছুফিয়ায়ে কেরাম গালাবায়ে হাল (ভাবের প্রভাব, অচেতন অবস্থা)-র কারণে নিজের অনুভূতিকে যে ভাষায় বা শিরনামে প্রকাশ করতে চেয়েছেন অনেকেই তা অনুধাবন করতে ভুল করেছে অথবা ব্যর্থ হয়েছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ ভুল ও ব্যর্থতা কি কুরআন হাদীসের যাহেরী ইলমের দুর্বলতার কারণে? না কি কুরআন হাদীসের যথাযথ অনুসরণের কারণে? আর গালাবায়ে হাল মানে নরমাল না এ্যাবনরমাল তা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

**এ গালি কাকে দেয়া হচ্ছে?**

**পৃ: ৪১, অনু: ৬ =** "স্থুল জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের বক্তব্য বাহ্যত শরীয়তের নুছূছ তথা মূল সূত্রসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অনুকূলে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুরআন-হাদীস ও ফিকহের যে জ্ঞান এসেছে সে জ্ঞানের অধিকারীদের কথাইতো বলা হচ্ছে?! এভাবে কথা বললে, সূফীবাদকে ভিন্ন একটি ধর্ম না বলে কোন উপায় নেই।

### ইলমে দ্বীন কেন যথেষ্ট নয়?

**পৃ: ৪২, অনু: ৫ =** "হাল বা ভাবের হাতে পরাস্ত ব্যক্তির ছন্দময় কথা অথবা প্রেমোচ্ছল শিরোনাম বা উক্তির কারণে এমন কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ হয় যা দৃশ্যত: ইসলামী তাওহীদ পরিপন্থী বা তার বিপরীত হয়, তাহলে সে বক্তব্য বোঝার জন্য কোন বিজ্ঞ আরেফ বিল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত যে ছুফিয়াদের ভাষা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল"।

**-? গ্যালারি থেকে:** তাওহীদের পক্ষের লোকেরা কি তাওহীদের পরিপন্থী ভাষা বোঝা জরুরী? বা তাওহীদের পরিপন্থী ভাষাকে তাওহীদের পক্ষে আনার জন্য ভিন্ন কোন ইলম হাসেল করা জরুরী? কুরআন হাদীসের আলোকে যে উক্তি তাওহীদের পরিপন্থী সে উক্তিকে তাওহীদের উক্তি বানানোতো কুরআন হাদীসের অনুসারীদের কাজ নয়।

### তাহলে কুফরের সংজ্ঞা কী?

**পৃ: ৫০, অনু: ৪ =** "আমি উমর ইবনে ইয়াহইয়া মক্কী (আমর ইবনে উসমান হওয়া-ই শুদ্ধ) থেকে শুনেছি, তিনি হাল্লাজের উপর বদ-দু'আ করতেন এবং বলতেন, যদি আমার সুযোগ হয়, তাহলে নিজ হাতে তাকে হত্যা করব। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী কারণে? শায়খ তার উপর ক্ষিপ্ত হলেন। জবাবে শায়খ বললেন, আমি কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম, সে বলল, আমিও অনুরূপ সঙ্কলনে সামর্থ্য রাখি" ------------- (৫০) "উল্লেখিত পরিচ্ছেদের মধ্যে এ ঘটনা বর্ণনা করা এবং ইবনে মানছুরের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীকে শায়খের বদ-দু'আর ফল বলা এ কথাই প্রকাশ করে যে, ছুফী-সাধকদের মতে এ ঘটনায় ইবনে মানছুর থেকে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার কারণে তাকে কাফের হওয়া প্রমাণ করে"। --------------------- (৫৩) "রেওয়ায়াত বা বর্ণনা শুদ্ধ ও সঠিক অথবা রাবী বা বর্ণনাকারীদের আদেল বা ন্যায়পরায়ণ ধরে নিলেও ইবনে মানছুরের বক্তব্য يمكنني أن أؤلف مثله এর উদ্দেশ্য বা দাবি এটা ছিল না যে, আমি সর্বদিক থেকে কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন করতে সক্ষম; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে কুরআনের মধ্যে হেদায়াতের বিষয়বস্তু রয়েছে, আমার ক্বলবের উপরও সে জাতীয় হেদায়াতের বিষয়বস্তুর ইলহাম বা প্রবাহিত হয় যা আমি নিজ ভাষায়

বয়ান করতে পারি। এ অবস্থায় ইবনে মানছুরের বক্তব্যের মধ্যে مثله শব্দের অর্থ তেমনই হবে যেমন আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বর্ণিত একটি হাদীসের মধ্যে বর্ণিত مثله এর অর্থ করা হয়-

ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله

**-? গ্যালারি থেকে:** দুর্ভাগ্যবশত হাল্লাজের সঙ্গে যার এ কথা হয়েছে হাল্লাজের শায়খ সে আমর ইবনে ওসমান হাল্লাজের কথার এ মর্ম বুঝতে পরেননি! তাই তিনি তার এ কথাকে কুফর হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছেন। এগার শত বছর পর আমরা বুঝতে পারছি, হাল্লাজের এ কথার মধ্যে কুফর ছিল না। আর হাল্লাজ চাইলে কুরআনের অনুরূপ তৈরি করতে পারে, কিন্তু নবী তো আর তা তৈরি করতে পারেননি। নবীকে আল্লাহ অনুরূপ পরিমাণ ইলম দিয়েছেন। এ পার্থক্যটাও মনে রাখতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন, একটি সূরা বা একটি আয়াতও কেউ বানাতে পারবে না। কিন্তু হাল্লাজ অনুরূপ কুরআন তৈরি করতে পারবে বলেও তার মাঝে কুফরের কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

**কাদেরে মুতলাকও?!**

**পৃঃ ৬০, অনুঃ ২ =** “আমি প্রশ্ন করলাম, ছবর বা ধৈর্য্যের সংজ্ঞা কি? ইবনে মানছুর রহ. বললেন, ছবর হল এই যে, আমি যদি এ সমস্ত বেড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ইবনে খফীফ রহ. বলেন, এ কথা বলে ইবনে মানছুর বেড়ীসমূহের প্রতি নযর করে, সাথে সাথে সমস্ত বেড়ী ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু এত বড় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েও রাত দিন পদযুগলে বেড়ী লাগিয়ে রাখতেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তা পৃথক করতেন না। অতঃপর জেলখানার প্রাচীরের উপর নযর দিলেন, তাতে দেয়াল বিদীর্ণ হয়ে জেলখানা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং সাথে সাথে আমরা দজলা নদের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার পরও তিনি সবসময় জেলখানার অন্ধকুঠিতে থাকতেন। এরপর বললেন, এটাই হল ছবর বা ধৈর্য্য।

“আমি প্রশ্ন করলাম ‘ফক্বর’ কি জিনিস? তখন তিনি কতগুলো পাথরের উপর দৃষ্টি ফেললেন, সাথে সাথে পাথরগুলো স্বর্ণ রৌপ্যে পরিণত হয়ে গেল। অতঃপর বললেন, এটার নামই হল ‘ফক্বর’ দারিদ্র বা অভাব। এ জাতীয় স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকার পরও যেন আমি এক পয়সার জন্যও মোহতাজ হয়ে না পড়ি। যার দ্বারা বাতি জ্বালানোর তৈল খরিদ করব।

“আমি প্রশ্ন করলাম ‘ফতূত’-মহত্ব, বীরত্ব, ঔদার্য মহানুভবতা কি জিনিস? জবাবে বললেন তুমি আগামী কাল তা প্রত্যক্ষ করবে।

“ইবনে খফীফ রহ. বলেন, যখন দিন শেষে রাত আসল আমি তখন স্বপ্ন দেখলাম কেয়ামত আরম্ভ হয়ে গেছে, একজন ঘোষক ঘোষণা করছে, হুসাইন ইবনে মানছুর কোথায়? সুতরাং তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে হাজির করা হল এবং তাকে বলা হল, যে তোমাকে মুহাব্বত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শত্রুতা পোষণ করবে সে জাহান্নামে যাবে। হাল্লাজ বলল, না প্রভু। বরং শত্রু-মিত্র সকলকে ক্ষমা করে দিন। অতপর আমার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, এটার নাম-ই ফতূত বা মহানুভবতা ও বীরত্ব।

“উপকার

“যদি ইবনে মানছুর পাপিষ্ঠ, যাদুকর এবং ধর্মদ্রোহী হত, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েও কেন তিনি বন্দীখানায় বন্দী থাকতেন এবং সর্বক্ষণ ডাণ্ডাবেড়ী অবস্থায় থাকতেন? যাদুকর আর যিন্দীকদের ছবর ও ফক্বরের সাথে কি সম্পর্ক? যদি তাদের এ জাতীয় তাছাররুফ বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অর্জিত থাকত, তাহলে নির্ঘাত জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে এমন কোন স্থানে আত্মগোপন করতো যে, কেউ যেন তার সন্ধান না পায়”।

**-? গ্যালারি থেকে:** 'স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি'র আরবী ভার্সন হচ্ছে 'কাদেরে মুতলাক'। আর সে কাদেরে মুতলাকের কিছু নমুনাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে!

আল্লাহর এক বান্দা কুরআন হাদীসের বিচারে কুফরী করবে, আবার কুফরের শিকার সে বান্দা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী হবে। কুরআন হাদীসের আলোকে তার কুফরের বিচার করতে গেলে তার কাছে এমন অলৌকিক স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকবে যে শক্তি দিয়ে সে যখন তখন যা ইচ্ছা তাই ঘটিয়ে দিতে পারবে -এসবই এখানে বলা হচ্ছে এবং হাল্লাজের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

আসলে এটা কোন দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছে? আমরা কোন দুনিয়াতে আছি? এ দু'টি দুনিয়ার সমন্বয় কি আসলে সম্ভব? কুরআন হাদীসের বিচারে যে কুফরী করেছে বলে প্রমাণিত হবে, সে আবার অন্য এক বিচারে অসম্ভব রকমের আল্লাহর ওলি হবে। বিষয়গুলো নিয়ে আর ভাবতে পারছি না।

## ইলাহী এ শক্তি কেন তার জন্য মানতে হচ্ছে?

**পৃঃ ৬৩, অনু: ২** = "**৫. অপরের মনের কথা বলাঃ** তার কারামতের মধ্যে এটাও একটি যে, মানুষ যা কিছু পানাহার করত, বাড়ী ঘরে যেসব কাজ-কাম করত তা স্ববিস্তারে বলে দিতেন। এমনকি মনের অভ্যন্তরে যে জল্পনা-কল্পনা করা হত সেটাও প্রকাশ করে দিতেন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ গুণকে আরবীতে বলা হয় 'আলিমুল গায়ব'। একটি পক্ষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গুণটি ছিল বলে দাবি করার কারণে আমরা আজীবন তাদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে চলেছি। কতটুকু তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে চতুর্থ শতাব্দীর একজন মানুষের জন্য ঈমানবিরোধী, 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাবিরোধী এ বিষয়গুলো সাব্যস্ত করতে হচ্ছে? যে আকীদা আমরা আল্লাহর রাসূলের জন্য সাব্যস্ত করতে দিলাম না, আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য সাব্যস্ত করতে দিলাম না, শিয়াদের বিরোধিতা করে গেলাম আজীবন, কাদিয়ানী, বেরেলভীর বিরোধিতা করে গেলাম আজীবন -সে আকীদা আজ কার জন্য? কেন? এবং কতটুকু তথ্যের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করার জন্য জীবনের সব অর্জনকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম?

## মিফতাহুল গায়্ব কেন বান্দার হাতে?

**পৃঃ ৬৩, অনু: ৩** = "**৬. ভবিষ্যতের অবস্থা ব্যক্ত করাঃ** তাঁর কারামতসমূহের মধ্যে এটাও একটি- যা ইবনে খাফীফ রহ. বর্ণনা করেন, আমি জেলখানায় ইবনে মানছুরের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম করি। সে

সালামের উত্তর প্রদান করে প্রশ্ন করলেন, খলীফা আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন? জবাবে আমি বললাম, খলীফা বলেছেন আগামীকাল ইবনে মানছুরকে হত্যা করা হবে। এ কথা শুনে সে মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন আজ থেকে পনের দিন পর্যন্ত এভাবে যিন্দা থাকব এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এটাকে বলা হয় 'মাফাতীহুল গায়ব' এর অধিকারী। ঘটনাচক্রে তা হাল্লাজের ভাগে এসেছে! আমরা যারা কুরআন হাদীসকে বিশ্বাস করি তারা শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ, আমাদের এসবই যাহের ও স্থুল, যা কখনো বাতেন ও সূক্ষ্মর মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারে না। টিকে যে থাকতে পারে না তা আমাদের লোকেরাই বলে দিলেন। আমাদের আর কিছুই করার নেই। এমনিইতো আমাদের দোষের কোন অন্ত নেই।

## এটা ভারত থেকে শেখা

**পৃ: ৬৬, অনু: ৪ =** "শায়খে ত্বরীকত ইবনে নছর কাশুরী রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসক তার জন্য সেব ফল খেতে পরামর্শ দেন। বহু তালাশ করার পরও কোথাও সেব ফল পাওয়া গেল না। তখন হাল্লাজ শূন্যের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং সকলের সামনে সেব ফল রেখে দিলেন। উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। উপস্থিত লোকজন তাকে প্রশ্ন করল, তুমি ফল কোথা থেকে সংগ্রহ করেছ? জবাবে সে বলল, জান্নাত থেকে। উপস্থিত একজন প্রশ্ন করল জান্নাতের ফল তো পঁচা-গলা এবং পোকা মাকড় থেকে সুরক্ষাপ্রাপ্ত। আর এ ফলেল মধ্যে তো পোকা রয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, যেহেতু ফলটি দারে বাক্বা-চিরস্থায়ী জগৎ থেকে দারে ফানা- ক্ষয়শীল জগতে এসেছে, সে জন্য তার মধ্যে এ নশ্বর জগতের একটি দোষ এসে গেছে। উপস্থিত লোকজন তার এ জবাবকে তার কাজ থেকে বেশি বিস্ময়কর মনে করল"।

**-? গ্যালারি থেকে:** নবীর চাইতে নবীর উম্মত অনেক অগ্রসর (?)! দাবি করতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কারণ স্থুল জ্ঞানের কোন পর্দা নেই! তবে আমাদের সপ্তাহিক হাটবারের দিন যারা ম্যাজিক ও সাপের খেলা দেখাত এ কাণ্ডগুলো তাদের হাতে আমি অনেকবার দেখেছি। জবাই করা পাখি ওড়াতে দেখেছি। একটি টাকার নোটকে শত শত নোটে পরিণত হতে দেখেছি। চাকু দিয়ে জীবন্ত মানুষের এসপার ওসপার করতে দেখেছি। আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক দূরের গাছে আগুন লাগিয়ে দিতে দেখেছি। শরীর থেকে মাথা আলাদা করে আবার জোড়া দিতে দেখেছি।

ফিকহে হানাফীর প্রথম সারির মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফাসসির, হাল্লাজকে যে শতাব্দীতে হত্যা করা হয়েছে সে শতাব্দীর সর্বস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব, ইমাম জাসসাস রহ. (মৃ: ৩৭০ হিঃ) বলেছেন, হাল্লাজের অস্বাভাবিক বিষয়গুলো এ প্রকারের ম্যাজিকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন-

وَضَرْبٌ آخَرُ مِنْ السِّحْرِ: وَهُوَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ حَدِيثِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَطَاعَاتِهِمْ لَهُمْ بِالرُّقَى وَالْعَزَائِمِ. وَيَتَوَصَّلُونَ إِلَى مَا يُرِيدُونَ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِمَةِ أُمُورٍ وَمُوَاطَأَةِ قَوْمٍ قَدْ أَعَدُّوهُمْ لِذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ يَجْرِي أَمْرُ الْكُهَّانِ مِنْ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، **وَكَانَتْ أَكْثَرُ مَخَارِيقِ الْحَلَّاجِ مِنْ بَابِ الْمُوَاطَآتِ** وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَا يَحْتَمِلُ اسْتِقْصَاءَ ذَلِكَ لَذَكَرْت مِنْهَا مَا يُوقِفُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَخَارِيقِهِ وَمَخَارِيقِ أَمْثَالِهِ. (أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص المتوفى سنة ٣٧٠ من الهجرة ٦٦/١ طبعة قديمي كتب خانه مقابل آرام باغ كراتشي.)

জাসসাস রহ. এর যাদু ও ম্যাজিক বিষয়ক আলোচনাটি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আহকামুল কুরআন' থেকে পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন করে নেয়া চাই। এতে অনেক ফায়েদার কথা রয়েছে।

## কথা বিপরীত রকমের হয়ে গেল

**পৃ: ৭৩, অনু: ৪ =** "আরেকটি তাবীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এটাও হতে পারে- ঐ সময় মানছুরের যবান আল্লাহ পাকের কালামের তরজুমান ছিল। তার যবানের মাধ্যমে তদ্রূপ أنا الحق উচ্চারিত হয়েছিল যদ্রূপ শাজারায়ে মূসা থকে إني أنا الله رب العالمين স্বর ভেসে এসেছিল। আর এ কথা স্পষ্ট যে, বৃক্ষ নিজেকে জগত স্রষ্টা আল্লাহ বলেনি; বরং ঐ মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের কালামের তরজুমান ছিল। সেভাবে ইবনে মানছুরকে মনে করা যেতে পারে। আর হালের প্রভাব এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওয়ারেদাতের প্রবাহে বহুবার এমন হয় যে, আরেফ বিল্লাহ- এর যবানে আল্লাহ পাক কথা বলেন। যে ভাবকে কেবল সালেকীনে আছহাবে হাল তথা ভাবের জগতে মগ্ন খোদার পথের পথিকগণই অনুধাবন করতে সক্ষম।

"এ কথা স্বীকার করি যে, ইবনে মানছুরের যবান থেকে أنا الحق শব্দ নির্গত হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানি না যে, ইবনে মানছুর স্বপ্রনোদিত হয়ে أنا الحق বলেছেন; বরং কবির ভাষায়-

---------------------------------------"।

**-? গ্যালারি থেকে:** শেষ পর্যন্ত কবির ভাষা থেকেই খালেস তাওহীদের পরিচয় পাওয়া গেল। অথচ স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও স্থায়ীভাবে নিজেকে খোদা দাবি করার উল্লেখ আমরা ২৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতেই দেখেছি।

**পৃ: ৮৭, অনু: ১ =** "ছুফী-সাধকগণ কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের পূর্ণ অনুসারী হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের দাওয়াত-তাবলীগের পথ ও পন্থা সেটা নয় যেটা উলামায়ে যাহেরদের হয়ে থাকে। যে কারণে ছুফী সাধকদের ফয়েয শুধু মুসলমান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না, অমুসলিমরাও তাদের ভক্ত হয়। তাদেরকে ভালবাসে, যে কারণে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছুফী-সাধকগণ রূহানী ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসক, যদ্রূপ শারীরিক চিকিৎসকদের প্রতি প্রত্যেক ধরনের চিন্তা-চেতনার মানুষের আকর্ষণ হয় এবং তার উপর কেউ কোন প্রকারের আপত্তি করে না তদ্রূপ ছুফী সাধকদের সাথে সমস্ত দল বা ফেরকার লোকদের ভক্তি এবং আকর্ষণ হলে তার উপরও কারো আপত্তি করার কোন অধিকার নেই"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কারণ কুরআন হাদীসের তাফসীর তারা সাহাবা তাবেয়ীন থেকে গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করেন। কিন্তু ওলামায়ে যাহেরের কী করার আছে? নবী যে ওলামায়ে যাহেরের নবী। সাহাবীরাও ওলামায়ে যাহের।

আর সূফী-সাধকগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের অনুসারী হয় কি না তা সূফী-সাধকদের গুরুদের কাছ থেকেই জানতে হবে। ওলামায়ে যাহের তার কী জানে! সূফী-সাধকদের গুরুরা বলেছেন, তাঁরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের অনুসরণ করেন না। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের অনুসরণ করে দ্বীন ও ঈমানের পথে যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বিশ্বাস না হলে শায়খে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর 'ফুসূসুল হিকাম' কিতাবটি দেখুন।

**জান্নাতের এ তাফসীর কেন?**

**পৃ: ৯১, অনু: ৪ =** "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট থেকে তার জান-মাল জান্নাতের বিনিময় খরিদ করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রেম-ভালবাসার চেয়ে উন্নত জান্নাত কোনটি হবে? জান্নাত তো এ প্রেম-ভালবাসার কারণে-ই জান্নাত বনেছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** বাতেনী তাফসীর। ওলামায়ে যাহেরের হাওয়ালা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদীসভিত্তিক যাহেরী ইলম ওয়ালাদের কাছে জান্নাত জাহান্নামের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। সেটা এখানে চলবে না। এই তো?!

**পৃঃ ৯৫, অনুঃ ৫** = "এ কথাও জানা গেল যে, ইবনে মানছুর রহ. কোন গুনাহ বা পাপের কারণে পরীক্ষার মুখোমুখী হননি। বরং আল্লাহর রায ভাণ্ডারের একটি রায প্রকাশ করার কারণে তিনি পরীক্ষার মধ্যে পড়েন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবনে মানছুর সাহেবে আছরার ছিলেন। সাধারণ স্তরের ছুফী সাধক ছিলেন না; বরং অনেক বড় মাপের সাধক ছিলেন"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** এ জানাটাও রায ভাণ্ডারের মাধ্যমেই হয়েছে। কুরআন হাদীসের আলোকে এটা জানার কোন সুযোগ নেই। কুরআন হাদীসের কষ্টিপাথরে রাখলেই দেখা যাবে, হাল্লাজ সাহেব গুনাহ ও পাপ নয়; বরং সরাসরি কুফরের কারণে ইরতিদাদের শাস্তি ভোগ করেছে।

আর আল্লাহর রায ভাণ্ডারতো যাদুঘরে পাওয়া যায়, যেখান থেকে যাদুকররা তা নিয়ে এসে ফাঁস করে দেবে (?)!

## আরেকটি কুফর

**পৃঃ ১০৩, অনুঃ ২** = "দীনূরীতে এক ব্যক্তি আসে। যার নিকট একটি থলে ছিল। থলেটি দিবা-নিশি কখনই তার থেকে পৃথক হতে দিত না। জনগণ থলেটি তল্লাশী করল। তল্লাশী করার পর হাল্লাজের একটি পত্র তার মধ্যে পাওয়া গেল। যার শিরোনাম এমন ছিল- من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان পত্রটি রাহমানির রাহীমের পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তির নামে। পত্রটি বাগদাদে পাঠানো হলে হাল্লাজকে তলব করা হল এবং তাকে পত্রটি দেখানো হলে তিনি স্বীকার করলেন, হাঁ এটা আমার পত্র এবং আমিই লিখেছি। ----------------- (১০৪) "অতঃপর ইবনে মানছুর রহ. এ ঘটনার মধ্যে এ হাকীকতকে এ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন-

هل الكاتب إلا الله أنا واليد في آلة

আর ইবনে মানছুরের এ নফী বা না করাটা তদ্রূপ যদ্রূপ-

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

**-? গ্যালারি থেকেঃ** বাতেনী রাষ্ট্রের লোকদের ব্যাপারে কেন যে যাহেরী ইলম দিয়ে দলিল দেয়া হয় তা বোঝা বড় মুশকিল! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খানা খেয়ে বলতেন 'আল্লাহ খানা খেয়েছে, আল্লাহ নামায পড়েছে? কোন ধরনের পাঠকদেরকে বোঝানোর জন্য এসব আলোচনা করা হয়েছে বুঝে উঠতে পারছি না।

## কেন সন্দেহ করা ঠিক হবে না?

**পৃঃ ১০৮, অনুঃ ৫ =** "এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তো প্রত্যেক কালিমায়ে কুফরের বক্তাকে কুফরীর দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না। কেননা তার জবাব এই যে, যে ব্যক্তির কলম অথবা যবান থেকে কুফরী কালিমা বের হয় সে যদি কুফরীর দাবি বা অর্থকে নিজের জন্য কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয় সে ক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই; বরং তার উপর কাফের হওয়ার বিধান প্রয়োগ করা হবে। আর যদি সে কালিমায়ে কুফর- কুফরী শব্দকে কর্তব্যরূপে গ্রহণ না করে থাকে; বরং তা থেকে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রকাশ করে এবং তার কথার মধ্যে ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকে, অথবা সে নিজেই তার কথার ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করে সে অর্থ আভিধানিকভাবে অথবা রেওয়াজের বিবেচনায় অথবা পরিভাষাগতভাবে শব্দের মধ্যে সে অর্থের সুযোগ আছে, তখন তাকে কাফের বলা বৈধ হবে না। অথবা সে যদি নিজের নির্দোষের কথা নাও বলে, কিন্তু বাক্যের মধ্যে সঠিক-শুদ্ধ অর্থ নেয়ার সুযোগ থাকে তখনো তাকে কাফের বলা জায়েয হবে না। যদিও সে অর্থটি দূরবর্তী অর্থও হয়। বিশেষ করে যখন প্রবক্তার মধ্যে গ্রহণের নিদর্শন এবং সংশোধনের সম্ভাবনা বেশি থাকে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যাদের ভাষাই আমরা বুঝি না তাদের কথার এত ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? এক কথাই জবাবের জন্য যথেষ্ট, যারা নিজেদেরকে খোদা বলে দাবি করে তাদের ভাষা বোঝার মত যোগ্যতা কুরআন হাদীসের ইলম ওয়ালাদের কাছে নেই। ব্যস কথা শেষ।

আর করলে সন্দেহ করব কেন? নিশ্চয়তার সাথেই বলা সম্ভব যে, এভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইবলিস, ফেরাউন, নমরূদ এবং সর্বকালের সকল কাফেরকেই মুসলমান বানিয়ে ছাড়া যাবে। ব্যাখ্যার দেখেছেনটা কী? শুধু কাফের নয়; কাফেরের চৌদ্দ পুরুষসহ মুসলমান প্রমাণিত হতে বাধ্য হবে। শুধু এ উসূলগুলো সামনে রেখে শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর কিতাব অধ্যয়ন করলেই হবে।

**পৃঃ ১১৭, অনুঃ ২ =** "তাঁর দৃষ্টিতে ইবনে মানছুরের ত্রুটি এর চেয়ে বেশি নয় যে, সে সমস্ত ভেদতত্ত্ব এবং স্রষ্টার গোপন রহস্য অযোগ্য না আহালদের সামনে ফাঁস করতেন না, ইবনে মানছুর সেগুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন। যার কারণে তিনি সাধারণের কাছে বদনামের ভাগী হয়েছেন এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে গেছেন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** স্রষ্টার গোপন রহস্য নবীর জানার অধিকার নেই, সে অধিকার দেয়া হয়েছে হাল্লাজকে! আর তা বোঝার শক্তি দেয়া হয়েছে, যারা কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের পথ ছেড়ে ভেদ রহস্যের পথ ধরেছে। এই তো?

**পৃ: ১১৮, অনু: ১ =** "সম্ভবত শিবলী রহ. ইবনে মানছুরকে উপদেশ দিয়ে ছিলেন যে, তুমি 'মাগলূবুল হাল' অর্থাৎ ভাবের হাতে বিপর্যস্ত। এমন ব্যক্তির জন্য নিরাপদ পথ হল পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করা। জনগণের সাথে মেলামেশা করা অনুচিত। ভাবের প্রাধান্যতার কারণে মুখ ফসকে ভেদ রহস্যের কথা বের হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ তিলকে তাল বানিয়ে দেবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** ভেদ রহস্যের সব কথা কেন যে কুফরী ভাষায় প্রাকশ পায় তা বোঝাওতো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়! আর এখানে কোন কোন তিলকে তাল বানানো হয়েছে? সব দাবিতো হাল্লাজের পক্ষের লোকেরাই তাদের কিতাবে লিখে দিল। মৃত্যুর পরে আল্লাহর তাকবীনী জগত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে -এ তথ্যতো আমরা হাল্লাজের ভক্তদের কিতাবে পাচ্ছি।

**ফেরাউন কেন কাফের?**

**পৃ: ১২৪, অনু: ৩ =** "------------------- ফেরাউন 'আনাল হক' বলে লাঞ্ছিত হয়েছে, ইবনে মানছুর 'আনাল হক' বলে আল্লাহর প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। --------------- ফেরাউন 'আনাল হক' বলার কারণে তার উপর আল্লাহ তা'আলার লানত, সে চীর অভিশপ্ত হয়েছে (কেননা সে তার আমিত্ব প্রকাশের জন্য 'আনাল হক [আমি খোদা]-র দাবি করেছিল। আর ইবনে মানছুর-ও 'আনাল হক' বলেছিল কিন্তু তার উপর আল্লাহ পাকের রহমত। কেননা সে তার আমিত্ব বিলীন করে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি হারিয়ে সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর তাজাল্লীকে অনুভব করে 'আনাল হক' বলে ছিল) যে কারণে তার উপর আল্লাহর রহমত"।

**-? গ্যালারি থেকে:** আপনি বললেই হবে না কি? আপনার চেয়ে বড় ভেদ রহস্যের অধিকারী লোকেরাও ফেরাউনকে খালেস মুওয়াহহিদ বলে গেছে। বাতেনী রাষ্ট্রের লোকেরা ফেরাউনকে অভিশপ্ত বলার কোন অধিকার রাখে না। আমাদের মত স্থুল জ্ঞানের অধিকারীরাই কেবল তাকে কাফের ও অভিশপ্ত বলার অধিকার রাখে। শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর 'ফুসূসুল হিকাম' গ্রন্থ থেকে ফেরাউন সম্পর্কে তার মন্তব্য দেখুন-

فص حكمة علوية في كلمة موسوية: وكان قرة عين لفرعون للإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا، ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله وجعله آية على عنايته سبحانه لمن شاء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون،

فلو كان فرعون ممن يأس ما بادر إلى الإيمان، فكان موسى عليه السلام كما قالت إمرأة فرعون فيه إنه قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا، وكذلك وقع، فإن الله نفعهما به عليه السلام. (فصوص الحكم لمحي الدين ابن العربي الشيخ الأكبر ص: ٢٠١، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، تحقيق أبو العلا عفيفي)

এ সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. তাঁর 'ফায়যুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী' কিতাবে বলেন-

أقول: وقد تفرَّد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ببعض المسائل أيضًا، فإنه قد اعتبر إيمان فرعون وإن لم يكن توبة، فيعاقب بما فعل، لكنه لا يُخلَّد في النار عنده، ونَسَبَ بحر العلوم إلى الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى قدم بعض الأشياء. وظَنّي أن تلك النسبة صحيحة. (فيض الباري للعلامة أنور شاه الكشميري، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث ٢٤٦/١)

শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর 'ফুসূসুল হিকাম' থেকে আরেকটি উদ্ধৃতিও দেখুন-

فقالوا في مكرهم: "وقالوا لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً" قال: فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه، ويجهله من يجهله."

-ফুসূসুল হিকাম পৃ: ৭২, তারীখুল ইসলাম যাহাবী, ৬৩৮ হিজরীর ঘটনাবলির বিবরণে ইবনুল আরাবীর জীবনী প্রসঙ্গে

এসব দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

**অর্থাৎ ঘটনাটি সত্য**

**পৃ: ১৪২, অনু: ৩** = "একদা তার সামনে হাল্লাজের একটি কিতাব পড়া হচ্ছিল যার মধ্যে এ বিষয়টিও ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি হজ পালনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং সে আর্থিক সামর্থ্য রাখে না, তাহলে সে নিজ ঘরের মধ্যে একটি চতুর্কোণ কামরা ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবে এবং সে ঘরটি পরিষ্কার ---------------- অতপর হজের সময় যে ঘর তদ্রূপ তওয়াফ করবে

যদ্রূপ খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করা হয় ------------- এ কর্ম তার জন্য হজ্জের স্থলাভিষিক্ত হবে। --------------- (১৪৯) এখন একটা প্রশ্ন থাকে যে, নিজের ঘরের কামরা বায়তুল্লাহর মত তাওয়াফ করা কিভাবে বৈধ হবে? ------ জবাব : বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ঘরকে বায়তুল্লাহর সমমর্যাদা মনে করা তো হারাম। কিন্তু বায়তুল্লাহর সাথে তুলনা করা হারাম না, সুতরাং ইবনে আব্বাস থেকে বসরার মধ্যে তা'রীফ বা আরাফাতের সাদৃশ্য অবলম্বন করার কথা বর্ণিত আছে। ---------------- এ ব্যাপারে বড়জোর বলা যেতে পারে যে, এটা ইবনে মানছুরের গবেষণাপ্রসূত একটি ভুল ছিল। যার সাথে কুফর এবং তাকফীরের কোন যোগসূত্র নেই। -------- বড়জোর সেটাকে বেদআত এবং গুনাহের কাজ বলা যেতে পারে। তবে সেটাও সেক্ষেত্রে যখন তাওয়াফ দ্বারা শরঈ তাওয়াফ উদ্দেশ্য করা হবে। যদি শরঈ তাওয়াফ উদ্দেশ্য না হয়, শুধু দৃশ্যতঃ তাওয়াফের নিয়ত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বেদআতও হবে না, গুনাহও হবে না। তার দলীল হযরত জাবের রা. -এর বর্ণিত হাদীস-

فطاف حول أعظمه ثلاثا

"---------------------------------------------------------------

**-? গ্যালারি থেকে:** তার মানে খাদ্য স্তুপের চার পাশে তাওয়াফ করা গেলে কাবার পরিবর্তে হাল্লাজের বাতলানো পদ্ধতিতে তাওয়াফ করা যাবে না কেন? সুতরাং ড্যান্স দেয়াকেও صلاة বলা যাবে। কারণ শব্দের অর্থেরই তো কারিশমা। জাবের র. এর হাদীস দিয়ে যে দলিল দেয়া হয়েছে তা বোঝার জন্যও কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এর জন্যও বাতেনী ইলম চাই।

হাল্লাজ কি শাব্দিক অর্থের তাওয়াফের কথা বলেছিল? শাব্দিক অর্থের হজ্জের কথা বলেছিল? যদি তা না হয় তাহলে শাব্দিক অর্থের তাওয়াফ দিয়ে তার পক্ষে দলিল দেয়া হচ্ছে কেন?

### এ কুফর দলিলের কোন প্রকার?

**(১৫০) "কা'বা ছাড়া অন্য বস্তু তাওয়াফের বিধান এবং বায়জীদ বোস্তামীর ঘটনাঃ**

ক্ষেত্রের সাদৃশ্যের কারণে হযরত বায়েজীদ বুস্তামীর ঘটনা মসনবী শরীফ থেকে নকল করা হচ্ছে। এক বুজুর্গ তার হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হয়ে বললেন, তুমি সাত বার আমার তাওয়াফ কর এবং এ প্রদক্ষিণ কা'বা ঘরের প্রদক্ষিণ করার চেয়ে অনেক ভাল হবে।

“------------ শের --------------------- শের--------------------
------ শের ---------------------- শের ------------------------ শের
------------------------- শের ------------------------------- শের --
---------------------------------- শের ------------------------------
---- শের ------------------------- শের -----------------------------
--------- শের ------------------------- শের -----------------------
--

**“হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর পক্ষ থেকে ঘটনাটির ব্যাখ্যা ঃ**

“-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

“বেদআতীদের ‘মাজার প্রদক্ষিণ’ করার বৈধতার উপর দলিল উপস্থাপন এবং তার জবাব”।

**-? গ্যালারি থেকে:** বোঝাই যাচ্ছে যে, ব্যাখ্যা করে আল্লাহকে বান্দা এবং বান্দাকে আল্লাহ বানানোর সকল ব্যবস্থাই আছে। শুধু প্রয়োজন কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানবিবর্জিত ভেদ রহস্যের জ্ঞানের।

## আরেকটি কুফর

**পৃঃ ১৬৭, অনুঃ ১** = "তখন হাল্লাজ কন্যা আমাকে বলল- তার সম্মুখে সিজদা কর। আমি বললাম, আল্লাহ ছাড়া কাউকে কি সিজদা করা যায়? আমার এ আপত্তি হাল্লাজ শুনে ফেললেন। তখন তিনি বললেন-

نعم إله في السماء وإله في الأرض لا إله إلا الله وحده

অর্থ ঃ হাঁ, ঊর্ধ্ব জগতেও উপাস্য রয়েছে পৃথিবীতেও উপাস্য রয়েছে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এখানে যদি لا إله إلا الله না থাকত, তাহলে এটা বাস্তবে কালিমায়ে কুফর ছিল, কিন্তু শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যটিকেও তাওহীদের অর্থে ব্যবহার করতে বাধ্য করছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ ব্যাখ্যা কিন্তু হাল্লাজ শুনে ফেলেছে এবং তার কারণে ব্যাখ্যাকারীর উপর মনে কষ্টও নিয়েছে। বাতেনী জগতের দিকে তাকালে এমনটাই মনে হয়।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে আগের ঘটনাকে শুদ্ধ করা হবে? না কি আগের স্পষ্ট ঘটনার আলোকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা করা হবে? কোনটার জোর বেশি, দেখা দরকার। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তরজমা যদি স্বাভাবিকভাবেই করা হয় তাহলে হাল্লাজকে সেজদা করার মাসআলার কী সমাধান হবে?

**পৃঃ ১৭০, অনুঃ ২** = "আওলিয়াদের কারামতের ব্যাপারে এ জাতীয় বহু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, তাদের দেহ কখনো বৃদ্ধি পায় এবং কখনো তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যখন তারা যাদুবিদ্যায় হাল্লাজের মত পারঙ্গম হয় এবং আল্লাহর স্বাভাবিক নেযামের বাইরে কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞান বিবর্জিত পন্থায় ওলী হওয়ার চেষ্টা করে।

## স্ববিরোধী দাবি না করলে ভালো হয়

**পৃঃ ১৭৭, অনুঃ ৪** = "উজির হামেদ ইবনে আব্বাস তার কিছু কিতাব ও গ্রন্থাবলীর মধ্যে এসব মযমূন এবং বিষয়বস্তু পেয়েছেন যে, যদি কোন মানুষ ধারাবাহিকভাবে তিন দিন তিন রাত রোযা পালন করে এবং মাঝখানে রোযা ভঙ্গ বা ইফতার না করে, চতুর্থ দিন কিছু উদ্ভিদের পাতা দ্বারা ইফতার করে, তাহলে তার রমযানের রোযার আর প্রয়োজন হবে না। আর যদি কেউ রাতের প্রথম পহর থেকে শেষ প্রহরের মধ্যে দু'রাকাত নামায পড়ে, তাহলে তাকে রাতে আর কোন নামায পড়ার প্রয়োজন হবে না। যে কোন দিন কেউ যদি নিজ মালিকানার সমস্ত বস্তু দান করে দেয়, তাহলে এ দান তার জন্য আজীবনের জন্য যাকাতের পরিপূরক হয়ে যাবে। সারা জীবন আর যাকাত দিতে সে বাধ্য

নয়। আর যদি একটি কামরা বানিয়ে কয়েকটি রোযা রেখে ঐ কামরার চতুর পার্শ্বে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করে, তাহলে তাকে আর হজ্ব করার প্রয়োজন হবে না। এ আমলই তার জন্য হজ্বের পরিপূরক হয়ে যাবে। আর যদি কুরাইশ বংশের কবরস্থানে শহীদানের কবর যিয়ারত করে এবং সে স্থানে দশ দিন অবস্থান করে নামায ও দোয়ারত থাকে এবং ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখে, ইফতারের সময় সামান্য যবের রুটির সাথে নির্ভেজাল নুন মিশ্রিত করে আহার করে, অন্য কিছু আহার না করে, তাহলে জীবনভর আর কোন ইবাদত করতে হবে না। এ বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর উজির হামেদ ইবনে আব্বাস উলামা ফুকাহা এবং কাযীদেরকে একত্রিত করলেন। অতঃপর হাল্লাজকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এ কিতাবটি চেন? তিনি জবাবে বললেন, হাঁ চিনি, এটা হাসান বসরীর সঙ্কলিত 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থ। উজির হামেদ প্রশ্ন করল, তুমি কি এ কিতাবের বিষয় বস্তুর সাথে ঐক্যমত পোষণ কর? জবাবে তিনি বললেন, কেন মানব না, এটা তো এমনই এক গ্রন্থ যার আলোকে আমি আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান পালন করি। কাযী আবু উমার বললেন, এটা তো সম্পূর্ণ ইসলামী বিধানের বিপরীত এবং পরিপন্থী। অতপর কাযী আবু উমার তার সাথে আরো কিছু আলাপ আলোচনা করলেন। শেষ তক তার যবান থেকে হাল্লাজ সম্পর্কে يا حلال الدم অর্থাৎ হত্যাযোগ্য- শব্দ নির্গত হল। উপস্থিত মুফতীগণও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন এবং তার হত্যার বৈধতার ফাতওয়া দিয়ে দিলেন। আর তাকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হল।

---

যা দ্বারা বুঝে আসে যে, ইবনে মানছুরকে কিতাবের বিষয়বস্তু শোনানো হয়নি, শুধু কিতাবের সুরত আকৃতি দেখিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি এ কিতাব মান কি মান না? হাল্লাজ তার মধ্যে থাকা ঐ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা যা ইসলামের দুশমনরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার সাথে সংযোজিত করেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানতেন না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কারণ, লেখকের ভাষ্যমতে চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকের ইসলামী খেলাফতের সকল মুফতী, ফকীহ ও বিচারপতিরা ছিল بليد شيطان أخرس ও أحمق। যার কারণে কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আসামীর বক্তব্য না শুনেই তাকে হত্যা করার ফাতওয়া দিয়ে দিয়েছেন।

অথচ লেখক তাঁর এ বইয়েরই ১৪২ পৃষ্ঠা থেকে এ মর্মে বিবরণ তুলে ধরেছেন যে, কিতাবটি হাল্লাজের সামনে পড়ে শোনানো হয়েছে। শোনানোর পর হাল্লাজের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর হয়েছে। তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় খেলাফতের সঙ্গে যোগযোগ করা হয়েছে। এর মাঝে

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর এখন বলছেন, হাল্লাজ জানেই না সে কিতাবে কী ছিল? বিষয়টিকে আমরা কীভাবে নেব?

### মুরিদদেরকে গালি দিয়ে লাভ হবে না

**পৃ: ১৮১, অনু: ১** = "অতএব প্রকৃত পক্ষে হত্যাযোগ্য এ সমস্ত নির্বোধ মুরিদ ভক্তরাই ছিল। যারা ইবনে মানছুরের একরারে আবদিয়্যাত-দাস হওয়ার স্বীকার করার পরও তাকে খোদা বলত এবং জনগণকে তার খোদায়ীত্বকে মানতে ও বিশ্বাসী বানাতে চাইত"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যে তার খোদায়ী দাবি থেকে ফিরে আসতে স্পষ্ট অস্বীকার করেছে তার একরারে আবদিয়্যাতের অর্থ কী? ভক্ত মুরিদরাই কেন দোষী হয়ে গেল? তার খোদায়ী দাবি থেকে ফিরে না আসার ব্যাপারে তার স্পষ্ট বক্তব্য দেখুন, মানছুর হাল্লাজ চরিত পৃ: ২৬৫

### আলমে বরযখেও কাদেরে মুতলাক?!

**পৃ: ১৯৩, অনু: ২** = "তার ভক্তরা নিজেদের মনকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, চল্লিশ দিন পর তিনি জীবিত হয়ে ফিরে আসবেন। ঘটনাক্রমে ঐ বছর দজলা নদীর পানি স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বেড়ে যায়। তখন তার মুরীদগণ বলতে লাগল, ইবনে মানছুর রহ.-এর কারামতের কারণে এমনটি হয়েছে। কেননা তার পোড়ানো ভষ্ম নদীর পানিতে ফেলা হয়েছিল।

তার কতিপয় ভক্তবৃন্দ দাবী করে যে, তারা ইবনে মানছুর রহ.-কে হত্যা করার পর নাহরূয়ানের পথে গাধার উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছে। তারা ইবনে মানছুরকে জীবিত দেখে আনন্দিত হয়। তখন তিনি বলেন, তোমরাও ঐ সমস্ত বলদ নির্বোধদের ন্যায় মনে করেছিলে। আমিই নিহত ও প্রহরীত হয়েছি, অথচ সেটা সঠিক ছিল না; বরং প্রহার এবং হত্যার ক্রিয়া কেবলমাত্র আমার দেহের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। তার কোন ক্রিয়া আমার আত্মার উপর হয়নি। আমার আত্মা পূর্বের ন্যায় জীবন্ত এবং উজ্জীবিত দ্বীপ্তিমান।

উপকারিতা

যদি বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে ইবনে মানছুর রহ. -এর এ বক্তব্য বর্ণিত না হত, যে আমি ত্রিশ দিন পরে প্রত্যাবর্তন করব, তাহলে ঐ সমস্ত কল্পনা পূজারীদের কথা প্রত্যাখ্যান করা হত। কিন্তু এখন তার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার দিকটা এক হিসেবে অগ্রগণ্য মনে হয়। সম্ভবত: আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা

সত্যে পরিণত করার নিমিত্তে তাঁর শাহাদাতের দিনেই আলমে বারযাখে তাছাররুফের [স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের] অনুমতি দান করেছিলেন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** একে কাদেরে মুতলাক, আবার তাও আলমে বরযখে! সত্যিই কুরআন হাদীস ফিকহের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদের জন্য এ ভেদ রহস্য বোঝা সম্ভব নয়। তাই মুরতাদ ও যিন্দীক ফাতওয়া না দিয়ে তাদের কোন উপায় নেই। এ শক্তি আল্লাহ দিয়েছিলেন বলেও এ কুফর থেকে বাঁচার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ এভাবে কাউকে এ শক্তি দেন না বলে ঘোষণা করেছেন। কাউকে দেননি, দেবেনও না।

আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাল্লাজের এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে যে, সে মৃত্যুর আগে বলে গেছে, মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর সে ফিরে অসবে। যেহেতু সনদ বিশুদ্ধ তাই মৃত্যুর আগেই হাল্লাজ বলতে পারছে, মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর তার কী হবে? যেহেতু সনদ বিশুদ্ধ তাই হাল্লাজ মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর ফিরে আসতেও পারছে। জানি না, এ সনদ যে কত ভয়ঙ্কর বিশুদ্ধ! যার কারণে ঈমান নাশক আকীদাও এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।

## এ মূর্খরা কারা জানেন?

**পৃ: ২১৬, অনু: ৮ =** "জনৈক ছাহেবে হাল বুযর্গ একটি পুস্তিকার মধ্যে যার নাম কালিমাতুল হক [গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, لا إله إلا الله এর ব্যাখ্যা এটাই, যা ইবনে মানছুর বলেছেন। আর লা-ইলাহার দাওয়াত ব্যাপক হওয়ার কারণে সেটা আর রায বা ভেদ থাকেনি। মূর্খরা এর অর্থ বিকৃত করে তাকে অপরিচিত ভীতিকর অস্পৃস্য বানিয়ে রেখেছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ মূর্খের তালিকায় নবী থেকে শুরু করে সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সর্বকালের মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, মুফতী মুফাসসির সবাই আছেন। কারণ তারা হাল্লাজের ব্যাখ্যার মত ব্যাখ্যা করেননি। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা!

## এ কষ্টের কোন প্রয়োজন ছিল না

**পৃ: ২১৬, অনু: ৯ =** একটি দূরবর্তী অর্থ এও হতে পারে যে, حق [হক্ব]-এর অর্থ الثابت الواقع [স্থির, প্রতিষ্ঠিত]। আর এ অর্থের বিবেচনায় সোফাসতায়ীদের ভ্রান্তমতবাদের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান উদ্দেশ্য। কেননা তারা বস্তুর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। অতএব এ বক্তব্য কালাম শাস্ত্রের মূলনীতিতে حقائق الأشياء ثابتة -এর সমার্থক হবে। তখন أنا الحق এর মধ্যে যে حق শব্দ

রয়েছে, তার অর্থ নিম্নের আয়াতের মধ্যে যে حق শব্দ রয়েছে তারই অনুরূপ হবে। আয়াতটি এই- الوزن يومئذ الحق [হাশরের দিন বান্দার আমলের ওযন করাটা হক, অর্থাৎ الواقع الثابت [বাস্তব সম্মত এবং স্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত শত্রুতা পোষণ করার কারণে ইবনে মানছুরের ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হয়েছে, গ্রহণ করা হয়নি"।

**-? গ্যালারি থেকে:** হাল্লাজ নিজে এ অর্থ করেনি। প্রসিদ্ধ অর্থটিই সে করেছে। অতএব শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া দুই হাজার কিলোমিটার দূরের এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কী? এর দ্বারা কি কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীরা বিষয়টি বুঝে ফেলবে? আর ভেদ রহস্যের লোকেরাতো বলার আগেই বুঝে ফেলে, চোখ বন্ধ করলেই সব দেখা যায়। তাদের জন্য এসব ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন?!

## ... তাই বলতে হবে আমিই খোদা!

**পৃ: ২১৮, অনু: ৩ =** "সাধারণ মানুষ যেটা ধারণা করে যে, আমি আল্লাহর দাস বলার মধ্যে নম্রতা, তাদের কথার মধ্যে প্রকারান্তরে দু'টি অস্তিত্বের স্বীকৃতি বিদ্যমান। একটা নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা আরেকটি স্রষ্টার অস্তিত্বের ঘোষণা। কিন্তু যে أنا الحق বলে, সে নিজেকে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। নিজেকে অস্তিত্বহীন মনে করে সে বলে أنا الحق অর্থাৎ আমার কোন অস্তিত্ব নেই, সবই তিনি। আল্লাহ ছাড়া কারো অস্তিত্ব নেই। আমি সর্বতোভাবে আদমে মহয-অনস্তিত্ব। আমি কিছুই না, এ বাক্যের মধ্যে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান। যেটার মর্ম কথা সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানে এটাকেই কুফর বলা হয়। একটু আগে 'হক'কে না হকের দিকে নেয়ার এত চেষ্টা করা হল। এখন সে 'হক'ই ফযীলতপূর্ণ হয়ে গেল! কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞান দিয়ে বিষয়গুলো বোঝা সত্যিই বড় কঠিন। তাই কুফর না বলে কোন উপায় নেই।

## আবার তওবার প্রয়োজন হলো কেন?!

**পৃ: ২২৮, অনু: ৬ =** "এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, সে সুস্পষ্ট শব্দে কেন তওবা করলেন না। যেমন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী রহ. সচেতন অবস্থায় سبحاني ما أعظم شأني বক্তব্য থেকে দোষমুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করতেন। মূলত অবচেতন অবস্থায় মানুষ শরীয়তের বিধান মুক্ত থাকে। --------------

- তবে হযরত বায়জীদ রহ. পূর্ণ সচেতন হয়ে যেতেন। যে কারণে তিনি পরিচ্ছন্ন শব্দে তাওবা করতেন। আর ইবনে মানছুর তখনো অবচেতনের ঘোরে ছিলেন, পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। যে কারণে খোদার নিকট তাওবার প্রত্যয়ে ইশারা-ই যথেষ্ট"।

**-? গ্যালারি থেকে:** একজন ভেদ রহস্যের অধিকারী কাদেরে মুতলাক, যিনি মৃত্যুর পর আল্লাহর পরিচালনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, আলিমুল গায়ব যিনি নিজের মৃত্যুর তারিখ জানেন, মৃত্যুর পরে কী কী ঘটবে সব জানেন এমন একজন খাঁটি মুওয়াহহিদকে (?) শেষ পর্যন্ত অচেতন ও স্থায়ী অচেতন বলে মামলায় বেকসুর খালাসীর যে চেষ্টা চলছে তা কেন? এটা কি তার সঙ্গে বেয়াদবী নয়?!

তাছাড়া তওবা করবে কেন? এত ফযীলতপূর্ণ কালিমা থেকে তওবা করা মানেতো ফযীলত হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বা ঈমান (?) থেকে কুফরে (?) প্রবেশ করা। কথাগুলো একেবারে বেশি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কুরআন হাদীসের অনুসারী স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদেরকে এতভাবে না ঘুরিয়ে একভাবে বললে ভালো হত।

**পৃ: ২৩৩, অনু: ৩** = "---------------------------- এ বিবেচনায় ছন্দের ব্যাখ্যা হবে- আল্লাহ তাআলার উপর তার সৃষ্টি দ্বারা দলীল উপস্থাপন বৈধ নয়"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কুরআন হাদীসে অবশ্য আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি দিয়ে আল্লাহর উপর দলিল দেয়া হয়েছে এবং তা দেখে দেখেই আল্লাহকে চিনতে বলা হয়েছে। যাই হোক এসব তো হচ্ছে কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের বিষয়! ছন্দওয়ালারাতো আর এসব স্থূল জ্ঞানকে বিশ্বাস করে না। কুরআন হাদীসে হাজার বার তা থাকলেও আমরা এখানে তা কোন কাজে লাগাতে পারব না। আর স্বপ্ন, কাশফ ও মুরাকাবার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন কিছু সাব্যস্ত করার না শক্তি আছে, আর না শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। তাই শরীয়তের গণ্ডির বাইরে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত দেয়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা।

**আমরাও অবাক!**

**পৃ: ২৬০, অনু: ২** = "আমি এ কথা চিন্তা করে আশ্চর্য হই যে, একটি বৃক্ষ থেকে إِنِّي أنا الله শব্দ বের হওয়াটাকে উলামাগণ বৈধ ও সম্ভব মনে করে এবং সে ক্ষেত্রে বৃক্ষকে অপারগ এবং বাধ্য মনে করা হয়। তাদের মতে এটা কেন বৈধ না যে, হুসাইন ইবনে মানছুর থেকে أنا الحق এর স্বর-শব্দ বের হবে এবং সে ক্ষেত্রে তার কোন ইচ্ছাই থাকবে না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এত আশ্চর্য হওয়ার দরকার নেই। এতটুকু জানা থাকলেই হবে যে, হাল্লাজ হচ্ছে মানুষ, আর গাছ হচ্ছে গাছ। গাছ উলঙ্গ থাকলে সমস্যা নেই, মানুষ উলঙ্গ থাকলে সমস্যা আছে। গাছ তার সন্তানের সঙ্গমে ফল দিতে পারে, মানুষ তা পারে না। গাছের সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক নয়।

দলিলভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী কোন মন্তব্য করতে আগ্রহবোধ করছি না।

**আনালহক আবার প্রত্যাখ্যাত হলো কেন?**

**পৃঃ ২৬২, অনুঃ ৪** = "হুসাইন ইবনে মানছুর হাল্লাজ জীবনভর ইবাদত-বন্দেগী, চেষ্টা-সাধনা, শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। তার থেকে একমাত্র 'আনাল হক' বলা ছাড়া প্রত্যাখ্যানযোগ্য আর কোন কথা-কাজ প্রকাশ পয়নি। শায়খ আত্তার রহ. -এর মতে সে কথার মধ্যেও শরীয়ত বিরোধী কিছুই ছিল না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এ কিতাবেইতো কত দেখলাম! শায়খ আত্তারকে টেনে আনতে হল কেন? ঈমানের সাতাত্তর শাখার কোন শাখার সিদ্ধান্ত দেয়ার সময়তো কখনো শায়খ আত্তারের উদ্ধৃতি দেখা যায়নি। কুরআন হাদীস ফিকহের কোন আলোচনায়তো কখনো শায়খ আত্তারকে দেখা যায়নি। আজকে এ দলিলবিহীন এ উদ্ধৃতি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল কেন?

**পৃঃ ২৬৪, অনুঃ ১** = "হযরত ইমাম শিবলী রহ. বলেন, হুসাইন ইবনে মানছুর রহ. -কে যখন শুলির উপর বসানো হল, তখন ইবলীস তার সামনে হাজির হল এবং তাকে বলল-

এক 'আনা' তোমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে, আর এক 'আনা' আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তুমি أنا الحق বলেছ, আর আমি বলেছি أنا خير, আমার কপালে লা'নত-অভিশম্পাত জুটেছে, আর তোমার কপালে জুটেছে 'মাক'আদে ছিদক' -এর মর্যাদাপূর্ণ আসন। এ ব্যবধান ও পার্থক্যের কারণ কী?

জবাবে হাল্লাজ রহ. বললেন, তুমি তোমার আমিত্ব ও মহত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে أنا خير বলেছিলে, আর আমি أنا الحق বলেছিলাম আমিত্ব মুক্ত হয়ে বা আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কুরআন হাদীস ফিকহের স্থূল জ্ঞানের আলোকে এ ঘটনাকে দলিলের কোন প্রকারে নেয়া যেতে পারে। আর বাতেনী ভেদ রহস্যের অধীকারীরাতো ইবলিসকে কাফের বলতে রাজি নয়। তারা কেন এখানে ইবলিসকে হেস্তনেস্ত করছে?

### তওবা করা হয়নি

**পৃঃ ২৬৫, অনুঃ ৫** = "একদা আবুল আব্বাস ইবনে আতা রহ. ইবনে মানছুর রহ. -এর নিকট পয়গাম পাঠান যে, ওহে শায়খ! তুমি যে কথা বলে ফেলেছ তা থেকে তওবা কর। হতে পারে তুমি জেল খানা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। জবাবে ইবনে মানছুর বলেন, যে এ কথা বলেছে তাকেই বল- সে যেন তওবা করে নেয়"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** অর্থাৎ হুঁশের সাথে প্রকাশ্যে খোদায়ীর যে দাবি হাল্লাজ করেছিল তার উপরই সে অটল ছিল এবং ফিরে আসার প্রস্তাব পাওয়ার পরও ফিরে আসেনি। এ কথাটা সবার মনে থাকতে হবে।

### যেমন ৫০ তেমন ১০০০

**পৃঃ ২৬৭, অনুঃ ৩** = "হুসাইন ইবনে মাছুরের বয়স যখন পঞ্চাশ হল, তখন তিনি বলেন-

এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী আমি হইনি; বরং প্রত্যেক মাযহাবের মধ্যে যেটা অধিকতর কঠিন হত, আমি সেটাকেই গ্রহণ করতাম। কেননা বিরোধমুক্ত হওয়ার মধ্যে সতর্কতা। এ জাতীয় তাকলীদ ত্যাগ করাটা ঐক্যমতে নিন্দনীয় নয়। তাকলীদ ত্যাগ যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, সহজতরটি গ্রহণ করব; তা হবে নিন্দনীয়। এখন তো আমার বয়স পঞ্চশ পূর্ণ হয়েছে, **আমি এক হাজার বছরের নামায পড়ে ফেলেছি এবং প্রতি নামায গোসল করে পড়েছি [অযুর উপর যথেষ্ট মনে করিনি]।**

**-? গ্যালারি থেকেঃ** পঞ্চাশ বছরে এক হাজার বছরের নামায এবং প্রত্যেক নামায গোসল করে পড়া এবং অযুকে যথেষ্ট মনে না করা এটাই কি হাল্লাজের শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ?! যা ২৬২ পৃষ্ঠায় বলা হল।

আর পঞ্চাশ বছরে এক হাজার বছরের নামায পড়ার পদ্ধতি কী? এটা ফরয নামায না নফল নামায? এক হাজার বছরের ফরয নামায পঞ্চাশ বছরে পড়াতো এনালগ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায প্রতি রাতে সর্বোচ্চ আট থেকে বার রাকাত পড়তেন। এক হাজার বছরের হিসাব কীভাবে মিলালে সব দিক রক্ষা পাবে ভাবা দরকার। শরীয়ত ও সুন্নাত তরিকার খেলাফ যেন না হয়।

### এক করার চেষ্টাই খামোখা

**পৃঃ ২৭৪, অনুঃ ৩** = "মুসাফের মুকীমের সমস্যার সমাধান-ই ভিন্ন। পাগল এবং বেহুঁশের সমাধানও ভিন্ন ভিন্ন। সজ্ঞান ও চালাক চতুরের সমস্যার সমাধানও ভিন্ন। এর উপর ভিত্তি করে বিচার করা উচিত যে যাহেরে শরীয়ত-

এর সমস্যাবলীর সমাধান ভিন্ন। তরীকতের সমস্যার সমাধানও ভিন্ন এবং হাকীকাতের সমস্যার সামাধানও ভিন্ন। কালিমা তৈয়্যবার অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। এটা শরঈ মাসআলা। আর এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা হল তরীকাতের মাসআলা। আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই এটা হল হাকীকাতের মাসআলা।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ ভিন্নতা কত শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে? কুরআন হাদীসের স্থুল অনুসারীদের এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত? তারা কোন পক্ষে থাকা উচিত?

## প্রকৃত খোদাই (?) বটেন!

**পৃ: ২৯২, অনু: ৩ =** "যখন তাকে হত্যা করার জন্য বের করা হল, তখন তিনি একজন দারওয়ানকে ডেকে বললেন, যখন আমাকে পোড়ানো হবে, তখন দজলা নদের পানি বৃদ্ধি পাবে। এমন কি বাগদাদ নগরী প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হবে। তুমি যখন এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে, তখন আমার জ্বালানোর ছাই থেকে সামান্য ভষ্ম দজলা নদের পানির মধ্যে ফেলে দিবে। ফলে নদের পানি শান্ত হয়ে যাবে। কার্যত তাকে যখন শূলীবিদ্ধ করে মারা হল, এবং তার দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল, তখন দজলা নদে ঝড় উঠল এবং নদের পানি বেড়ে বাগদাদ নগরী তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হল, তখন খলীফা জনগণকে বলল, তোমরা কি এ ব্যাপারে হাল্লাজ থেকে কিছু শুনেছ? দারওয়ান বলল, হাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! শুনেছি। সে এ কথা বলেছিল, খলীফা বললেন জলদি তার বলা মত কাজ কর। সুতরাং তার দেহের পোড়ানো ভষ্ম নদের পানির মধ্যে ফেলা হল। যার প্রতিটি অংশ থেকে পানির উপর الله নামের নকশা অঙ্কিত দেখা গেল এবং নদের পানিও শান্ত হয়ে গেল"।

**-? গ্যালারি থেকে:** নবীর উম্মত নবীকে অতিক্রম করে চলেছে। কারণ তারা নবীর পথ না ধরে বেলায়েতের পথ ধরেছে। আর ভেদ রহস্যের অধিকারীদের মতে নবুয়তের পথের চাইতে বেলায়েতের পথ অনেক উর্ধ্বে। তাই তারা সে পথই ধরেছে।

**পৃ: ২৯২, অনু: ৫ =** "যখন হুসাইন ইবনে মানছুর রহ. -কে শুলীবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে বাইরে আনা হল, তখন হাল্লাজ রহ. তার এক মুরীদকে ডাকলেন এবং বললেন, যখন আমার পোড়া ভষ্ম দজলা নদে ফেলা হবে, তখন নদের পানি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে। ফলে বাগদাদ নগরী ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা হবে। তখন তুমি আমার খেরকা নদের পানির মধ্যে ফেলে দিবে। এ আমলের কারণে নদের পানি শান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যখন হাল্লাজ রহ. -কে শুলীবিদ্ধ করে তার দেহ জ্বালানো হল এবং সে ছাই নদের পানির

মধ্যে ফেলা হল, আকস্মাৎ দজলা নদীতে প্লাবন আসল এবং ছাই -এর প্রতি কনা থেকে أنا الحق -এর হৈ চৈ -এর রব উঠল। নদের পানি এত বেশি বৃদ্ধি পেল যে, বাগদাদ নগরী প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। তখন সেই মুরীদ অন্তিম অসিয়ত মোতাবেক হুসাইন ইবনে মানছুর রহ. -এর খেরকা দজলা নদে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে নদ শান্ত হয়ে গেল এবং أنا الحق -এর শোরগোলও থেমে গেল"।

**-? গ্যালারি থেকে:** ভেদ রহস্যের বিষয়। কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীরা তা বুঝতে যাওয়া বোকামী। আর তাদেরকে তা বোঝাতে যাওয়াটা আরো বড় বোকামী। তাও আবার স্থূল জ্ঞানের উদ্ধৃতি দিয়েই।

### কু-ধারণা পোষণকারীদের তালিকা দরকার

**পৃ: ২৯৩, অনু: ৩ =** "এর চেয়ে অতিরিক্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেটা শুধু তারীখে কাযবীনী এবং তাযকিরাতুল আওলিয়ার মধ্যে। অন্য কোন ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এ আলোচনা দেখা যায় না। মনে হয় অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ঘটনার বর্ণনা সংক্ষেপ করেছে। কেননা তারা ইবনে মানছুর রহ. -এর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করতেন। ইমাম কাযবীনী রহ. হাল্লাজের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করতেন বলে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ কু-ধারণা পোষণকারীদের তালিকা দীর্ঘ! অনেক দীর্ঘ!! ইমাম যাহাবী রহ. ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সে দীর্ঘ তালিকার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেছেন-

الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة * ما روى ولله الحمد شيأ من العلم وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق أباح العلماء دمه فقتل سنة تسع وخمسين وثلاث مائة انتهى * وهذه الترجمة مجملة وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه وأكثرهم على أنه زنديق جوال ...... ولا أرى يتعصب للحلاج إلامن قال بقول الذي ذكر أنه عين الجمع فهذا هو قول أهل الوحدة المطلقة ولهذا ترى ابن عربي صاحب الفصوص يعظمه ويقع في الجنيد والله الموفق

-দেখুন, লিসানুল মীযান, আলহুসাইন ইবনু মানসূর আলহাল্লাজ

### আসসাদিকুল মাসদূক কার সিফাত?!

**পৃ: ২৯৩, অনু: ৩ =** "এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, এটা শুধু তাঁর কারামাতই ছিল না; বরং এ ঘটনার মধ্যে ইবনে মানছুর রহ.-এর ছাদেক মাছদূক

এবং মুহাক্কেক হওয়ারও দলীল রয়েছে। খোদার পানাহ! তিনি যদি বাতেল হতেন এবং ভ্রান্ত হতেন তাহলে নিজ দুশমনদের প্রতি কেন দয়া করবেন! বরং নিজেই তাদের ডুবে মরার কামনা করতেন। আর যদি সামর্থ থাকত, নিজের তাছাররুফ বা সাধীন ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর চেয়ে বড় কোন এবং কঠিন মসীবত বাগদাদবাসীদের উপর পতিত করতেন। কিন্তু তিনি তো আরেফে ছাদেক-সত্য আরেফ বিল্লাহ, ন্যায়-নীতিবান হকপন্থী ছিলেন”।

**-? গ্যালারি থেকে:** তার মানে, বান্দা তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে পারার জন্য সে ওলী হওয়া জরুরী নয়। কোন গোমরাহ ও যিন্দীক হলেও সম্ভব। পার্থক্য এতটুকু যে ওলী হলে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ভাল ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে, আর যিন্দীক হলে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। ওলী হলে শত্রুদেরকেও রক্ষা করবে, আর যিন্দীক হলে শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবে। সর্বাবস্থায় মারা যাওয়ার আগে পরে সবসময়ই এ শক্তি তার থাকবে। তার মানে কাদেরে মুতলাক হওয়ার জন্য ওলী হওয়াও জরুরী নয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!

**আপাতত এই পর্যন্ত**

‘মানছুর হাল্লাজ চরিত’ বই থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা আপাতত এখানে শেষ করা হল। আমার আবদার থাকবে, আমার উল্লেখ করা উদ্ধৃতিগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় মূল বইটি পড়ে নিলেই যথাযথ উপলব্ধি করা সহজ হবে।

**শুধু হাল্লাজের ভাষা বুঝলেই হবে না আমাদের মনের কথাও বুঝতে হবে**

বইটির ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটি কথা বলতে চাই, বইটিতে যে আঙ্গিকে হাল্লাজের প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সে আঙ্গিকে দেওয়ানবাগী, কুতুববাগী, রাজারবাগী, চন্দ্রপাড়া, আটরশী, মাইজভাণ্ডারী, ল্যাংটা বাবা ও হন্টন বাবাদের কোন্ কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করা যাবে না? সচেতন পাঠক একটু মিলিয়ে দেখুন।

এ বইয়ের উদ্ধৃতিগুলো ও বক্তব্যগুলো দেখে আমার বার বারই সন্দেহ হয়, কোন দুষ্ট চক্র বইটি লিখে আমাদের আকাবিরের নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে কি না? যথাযথ কোন তথ্য উপাত্ত ছাড়া তা জোর করে দাবিও করতে পারছি না। আবার মেনেও নিতে পারছি না। যদি আমার এ সন্দেহটি সত্য হতো তাহলে কতইনা ভালো হতো!

আবার মনে জাগে, হয়তো কিতাবটি আমাদের আকাবিরের জীবনের ঐ অংশের যে অংশ থেকে তাঁরা রুজু করেছেন। যেমনটি আরো বহু ক্ষেত্রেই

হয়েছে। কিন্তু আমরা নাদান উত্তরসূরীরা তাঁদের সে জীবনের রহিত অংশটিকে নিয়েই ব্যবসার বাজার গরম করে চলেছি। একেক জন একেকভবে।

আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, এ কিতাব লেখার সময় হাল্লাজ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তাঁদের হাতের নাগালে ছিল না। যারফলে কোন কোন উদ্ধৃতিকে অনেক মাধ্যমে গ্রহণ করতেও দেখা গেছে এবং মূল কিতাবের সঙ্গে এখন মিলাতে গিয়ে দেখা গেছে, বহু মাধ্যমে উদ্ধৃতিগুলো গ্রহণ করার কারণে তাতে অনেক বেশি হেরফের হয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও বিপরীত তথ্য বের হয়ে এসেছে।

যাইহোক ব্যবসার খাতিরে ব্যবসায়ীরা বইটির প্রচার প্রসার করে চলেছে। কিন্তু এত স্পর্শকাতর ও ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো সম্বলিত বইটি পড়তে তালিবুল ইলমদেরকে নিষেধ করা হয়নি। বইটির মাঝে মুনকার কিছু আছে বলে কারো মনে হয়নি। এ বইয়ের কোন বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করতে হবে বলে মনে হয়নি। বইয়ের উর্দূ বয়স প্রায় শত বছর এবং বাংলা বয়স অল্প হলেও একেবারে কম নয়। এ বইটি যত হাতে পৌঁছে গেছে তার শত ভাগের এক ভাগ হাতেও আমাদের এ ক্ষুদ্র আর্জি পৌঁছা সম্ভব নয়। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা।

### খতমে তারাবীর হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয

ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্তের বিপরীতে বইটি লেখা হয়েছে। খতমে তারাবীহর টাকা নেয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে যত উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে সকল উদ্ধৃতি হচ্ছে মুতলাক হাদিয়া সম্পর্কিত উদ্ধৃতি। এ কথা ভাবার প্রয়োজন হয়নি যে, 'তারাবীর হাদীয়া' বলা হলে ফিকহের পরিভাষায় একে বলা হয় 'উজরত'। মুতলাক হাদিয়া বললে এর নাম হয় 'হাদিয়া'। এমতাবস্থায় 'উজরতে'র দলিল উল্লেখ না করে 'হাদিয়া'র দলিল উল্লেখ করে 'উজরত' বা তারাবীর হাদিয়া প্রমাণ করা হয়েছে।

এমন কাজ অনেকেই করে। ইনিও করেছেন। একজন মানুষের এতটুকু বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় ও আগ্রহ আমাদের নেই। আমার পেরেশানী ও প্রশ্ন হচ্ছে অন্য জায়গায়।

### তাকরীযই যখন উদ্ধৃতি

দাবির পক্ষে কোন উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে মুত্তাফাক আলাইহি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে বইটি লেখা হয়েছে সেটিকে বাজারজাত করা হয়েছে বড়দের তাকরীয নিয়ে। কারণ, বড়রাই বলেছেন, বড়দের তাকরীয যেসব কিতাবে

নেই সেসব কিতাব পড়বে না। তাই লেখক সম্প্রদায় এখন তথ্য উপাত্তের দিকে নযর না দিয়ে নযর দেয়ার চেষ্টা করছে তাকরীয সংগ্রহ করার দিকে। বড়রাও তাকরীয দিয়ে চলেছেন। এখানেও আমাদের দেখার ও শেখার অনেক কিছু আছে।

বইটির উপর বড়দের যে বিশাল কাফেলা তাকরীয দিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা নিম্নরূপ। বইটিতে বড়দের পরিচয় যেভাবে দেয়া হয়েছে আমি হুবহু সেভাবেই তুলে ধরছি।

"দেশ-বিদেশের মুফতীয়ানে কেরামের সত্যায়িত

১. ইমামুন নাহু ওয়াল ফেক্বাহ মুফতী জারওয়ালী খান দা. বা.
প্রতিষ্ঠাতা: জামিয়া আরাবিয়া আহসানুল উলূম, করাচি, পাকিস্তান।

২. ফকীহুজ্জামান আল্লামা মুফতী নূর আহমদ দা. বা.
প্রধান মুফতী: দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩. শায়েখ আব্দুল মোমিন ইমাম বাড়ি দা. বা.
খলীফা: সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.

৪. আল্লামা মুফতী ফজলুল হক দা. বা.
সভাপতি: ফতোয়া বোর্ড ইত্তেফাকুল উলামা বৃহত্তর মোমেনশাহী।

৫. আল্লামা মুফতী নূরুল আমীন দা. বা.
প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস মদীনাতুল উলূম রায়ের মহল, খুলনা।

৬. মুফতী মুবারকুল্লাহ দা. বা.
মহাপরিচালক ও প্রধান মুফতী জামিয়া ইউনুছিয়া বি.বাড়ীয়া।

৭. মুফতী ড. মফিজ উদ্দীন সাহেব দা. বা.
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি।

৮. আল্লামা মুফতী ইমরান মাযহারী দা. বা.
খতিব, লালবাগ শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা।

৯. মুফতী শহীদুল্লাহ দা. বা.
প্রধান মুফতী জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া বি.বাড়ীয়া।

১০. মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম দা. বা.
নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, পীর সাহেব চরমোনাই।

১১. মুফতী শফীকুর রহমান দা. বা.
জামিয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজীর বাজার, সিলেট।

১২. হযরত মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী দা. বা.
মহাসচিব, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড।

১৩. আল্লামা মকবুল হুসাইন দা. বা.

শায়খুল হাদীস ও কার্যকারী মুহতামিম জামিয়া করিমিয়া আরাবিয়া রামপুরা, ঢাকা।

১৪. মুফতী ইউসুফ সাদেক হক্কানী দা. বা.

সাবেক মুহাদ্দিস জামিয়া আশরাফিয়া কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

১৫. মুফতী আব্দুল কাইয়ুম খাঁন দা. বা.

মহাপরিচালক জামিয়া আরাবিয়া নূরুল উলুম কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

**কিন্তু**

বইটি না পড়ার পরামর্শ দেয়ারতো প্রশ্নই আসে না, বরং তাকরীযের মাধ্যমে তা সর্ব সমাদৃত হয়েছে। স্বাভাবিক মূলনীতি হিসাবে পড়ার বৈধতা পেয়েছে। আকাবিরের তাকরীয আছে। পড়তে বাধা থাকার কোন কারণ নেই। কারণ তথ্য উপাত্ততো আর এখন কোন বিষয় রয়নি। তালিবুল ইলমরা পড়ছে, শিখছে এবং কিতাবের উদ্ধৃতি দেখার পরিবর্তে তাকরীয দেখে দেখে আমল করার জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

**এক লক্ষ ফাতওয়া**

বই আকারে ছেপেছে। উসূলে ইফতা, উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর সব কিছুকে জবাই করে বইটি তৈরি করা হয়েছে। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনকে দাফন করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন হয়নি।

আজো পর্যন্ত এর ইলমী সমস্যাগুলো তালিবুল ইলমদের সামনে তুলে ধরার সময় হয়নি। কিন্তু দেশের আকাবিরের প্রথম সারির দস্তখত সম্বলিত ফাতওয়া ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। বছর দুই বছর পার হয়ে চলেছে। এর মাঝে এমন কোন প্রকার মুনকার বিষয় চোখে পড়েনি, যা থেকে তালিবুল ইলম ও মুসলমানদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন আছে।

মূলনীতির আলোকে তালিবুল ইলমরা তা পড়ছে, পড়বে এবং আমল করে যাবে। কারণ শুধু তাকরীয নয় বড় বড় এবং আরো বড়দের তাতে স্বাক্ষর আছে।

**ভেদে মারেফত**

**নিজের হুকুমে মৃতকে জিন্দা করা, আল্লাহর আন্দায নেই বলা, আল্লাহর সাথে জোর খাটানো, সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া -এ সবের কোথাও কোন সমস্যা (?) নেই!**

পৃঃ ১৫, অনু: ১ = "হযরত শামছুত তাবরিজী (র)-এর নকল: প্রাণের বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে আপনার খেদমতে শামছুত তাবরিজী (র)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি- মছনবী-এ রূমীর ভিতর বর্ণিত আছে, একদা হযরত তাবরিজীর পীর সাহেব কেবলা, তাহাকে বলিলেনঃ বাবা, রোম শহরে একটি সুন্দর পাত্র আছে উহাকে তুমি গরম করিতে পার? তিনি উত্তর করিলেন, হুজুরের দোয়া থাকিলে আল্লাহর ফজলে পারিব। পীরের আদেশ নিয়া তিনি তখনই রোম শহরের দিকে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে ঝুপড়ির ভিতরে এক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়া কাঁদিতে দেখিলেন। হুজুর বৃদ্ধকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, হুজুর, এই পৃথিবীতে আমার খোঁজ-খবর নেওয়ার মত আর কেহ নাই। একটি পুত্র ছিল, সে আমার যথেষ্ট খেদমত করিত। তাহার এন্তেকালের পর সে একটি নাতি রাখিয়া যায়, ঐ ১২ বৎসর বয়স্ক নাতি একটি গাভী পালিয়া আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত। সেই নাতির লাশ এখন সম্মুখে দেখিতেছেন। এখন উপায় না দেখিয়া কাঁদিতেছি। হুজুর বলিলেন, এই ঘটনা কি সত্য? বৃদ্ধ উত্তর কারিলেন, সত্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। তখন হুজুর বলিলেন- **হে ছেলে, তুমি আমার হুকুমে দাঁড়াও!** * (১) তখনই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, আমার দাদু কোথায়? দাদা স্নেহভরে কোলে জড়াইয়া বলিল, দাদা তুমি মরিয়াছিলে, এখন কিরূপে জীবিত হইলে? নাতি বলিল, আল্লাহর ওলী আমাকে জেন্দা করিয়াছেন। এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরে খাঁটি মুসলমান বাদশাহর কাছে এই খবর পৌঁছান হইল। বাদশাহ কুতুব সাহেবকে দরবারে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, **হুজুর, আপনি কি বলিয়া বৃদ্ধের নাতিকে জেন্দা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে আমি বলিয়াছি, হে ছেলে, আমার আদেশে জীবিত হইয়া যাও।**

বাদশাহ বলিলেন, আফসোস যদি আল্লাহর আদেশে জেন্দা হইতে বলিতেন। **কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মা'বুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব- তাঁহার আন্দায নাই?** * (২) এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকী ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন করিয়া কোনরূপ জিন্দেগী গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল। **তাই আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক রূহ্ নিয়া আসিয়াছি।** * (৩) বাদশাহ বলিলেন, আপনি শরীয়ত মানেন কিনা? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, শরীয়ত না মানিলে ভীষণ কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শাফায়াত কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। আমি শরীআত সম্পূর্ণভাবে মানি। বাদশাহ বলিলেন, আপনি শেরেক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া

খসাইয়া ফেলিতে হইবে। **আল্লাহর কুতুব কথা শুনা মাত্র দুই হাতের আঙ্গুলি দ্বারা পায়ের নীচ থেকে আরম্ভ করিয়া গায়ের সমস্ত চামড়া খসাইয়া বাদশাহ্‌র সম্মুখে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন।** জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহর জেকেরে মশগুল হইয়া গেলেন। ভোরবেলা সূর্যের তাপ চর্মহীন শরীরে লাগামাত্র কষ্ট পাইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য! **আমি শরীঅত মানিয়াছি, কাজেই তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। ইহা বলা মাত্র ঐ দেশের জন্য সূর্য অন্ধকার হইয়া গেল।** দেশের ভিতর একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, বাদশাহ অস্থির হইয়া ঐ হুজুরকে তালাশ করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর এক জঙ্গলে গিয়া তাঁহার সক্ষাৎ পাইলেন এবং আরজ করিলেন হুজুর, শরীঅত জারী করিতে গিয়া আমরা কি অন্যায় করিলাম, যাহার জন্য আমাদের এই মুছিবত আনিয়া দিয়াছেন? হুজুর তখন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সূর্য তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিও না, কিন্তু দেশবাসীকে কষ্ট দেও কেন? ইহা বলামাত্র সূর্য আলোকিত হইয়া গেল। আল্লাহ পাক তাঁহার ওলীর শরীর ভালো করিয়া দিলেন। এখন হুজুর রোম শহরের দিকে রওয়ানা করিলেন। সেখানে গিয়া এক স্বর্ণকারের ঘরে বসিলেন। ঐ সময় মাওলানা রূমী ঘোড়ায় সাওয়ার হইয়া হুজুরের সম্মুখ দিয়া রওয়ানা করিলেন, বহু শাগরিদ তাহার পিছনে আসিতেছিল।

হুজুর জলদি করিয়া মাওলানা সাহেবের ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র ঘোড়া থামিয়া গেল, হুজুর মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি মাওলানা রূমী? উত্তর করিলেন, হাঁ হুজুর। প্রশ্ন করিলেন, বলুন তো এলেম কাহাকে বলে? উত্তর করিলেন, যাহা দ্বারা শরীয়তের বিধান নামায, রোজা ইত্যাদির নিয়মাবলী জানা যায়। হুজুর বলিলেন, ইহা ত সবাই জানে। প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার কাছে শুনুন-

علیکہ ترانا بستاند + جہل زاں علم بہ بود بسیار

অর্থাৎ "যেই এলেম তোমাকে তোমা হইতে পৃথক করিতে না পারে সেই এলেম শিক্ষা করার চেয়ে জাহেল থাকা ভালো।" হুজুর ইহা বলার সঙ্গে কলবি তাওয়াজ্জুহ মাওলানা সাহেবের কলবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাওলানা সাহেব তখন ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আরজ করিলেন, হুজুর আমাকে মুরীদ করুন। হুজুর তাহাকে মুরীদ করিলেন। মাওলানা সাহেব তখনই জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহ পাকের ইবাদত করিতে থাকেন। পরে দেশে ফিরিয়া আসেন অজদের হালতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি প্রায় সাত হাজার বয়াৎ আল্লাহর তরফ হইতে এখতিয়ার করিয়াছিলেন। মাওলানা রূমী নিজে বলেন-

خود بخود مولانا روم ہر گزنہ شد * تا غلام شمس التبریزی نہ شد

অর্থাৎ "আমি মাওলানা রূমী যতক্ষণ পর্যন্ত শামছুত তাবরিজীর হাতে হাত না দিয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ছিলাম না।" আল্লাহ পাককেও চিনতে পারি নাই। প্রিয় মোমেনগণ, খুব চিন্তা করিয়া দেখুন, মাওলানা রূমীর মত ব্যক্তি যদি মুরিদ হওয়া ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহব্বত হাছেল করিতে না পারিয়া থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কি? **টীকা ঃ** (১) (২) (৩) এ ধরনের কথা বলা আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য পরিষ্কার কুফরী গণ্য হইবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের দেওয়ানা বান্দাগণ এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়াছেন- আল্লাহ পাকের আশেকদের এ ধরনের উক্তি এশকের জোর বশতঃ ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ পাকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তাহা পীড়াদায়ক হয় না বরং তাহাতে আরো মহব্বতের জোয়াড় উঠে"। -ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** মানুষ মৃতকে জীবিত করতে পারছে! আল্লাহর উপর নারাজ হয়ে নিজের হুকুমে কার্যপরিচালনা করে চলেছে!! আল্লাহর আন্দায নেই (আল্লাহ হেফাযত করুন) এ কথার ঘোষণাও দিয়ে চলেছে!!! আল্লাহর দরবার হতে জোরপূর্বক মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে আসা হচ্ছে!!!! সূর্যের আলোকে নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে!!!!! শরীয়তের সিদ্ধান্তের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে হাতের ইশারায় গায়ের সব চামড়া খুলে টেবিলে রেখে দিয়ে চলেছে!!!!!! কিন্তু ঈমানের কোন সমস্যা হচ্ছে না! বরং ঈমানের জন্য একজন আলেমকে এ ব্যক্তির কাছেই যেতে হচ্ছে। বরং এ ব্যক্তির কাছে না গেলে তার জন্য ইলম হাসেল করার চাইতে মূর্খ থাকা বেশি উত্তম।

আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আমাদের সাদা দিলের একজন তালিবুল ইলম চৌদ্দ বছর/ষোল বছর কুরআন হাদীস ও ফিকহের ইলম হাসিল করে এখন সে কী করবে? তার জন্য আমাদের পরামর্শ কী? তাতবীকতো সম্ভব নয়। প্রাধান্য দিতে গেলে আজীবন দেখেছি বাতেনই প্রাধান্য পেয়েছে। এমতাবস্থায় একজন তালিবুল ইলম, একজন আলেম, একজন সাধারণ মুসলমানকে আমরা কোন পথ ধরার পরামর্শ দিচ্ছি। লালন ফকীর, শাহ এনায়েতপুরী, শাহ চন্দ্রপাড়া, দেওয়নবাগী, আটরশী, রাজারবাগী, মাইজভাণ্ডারী, সুরেশ্বরীসহ সকল বাতেনী সম্রাটদের অপরাধটা কী? তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার।

**আল্লাহ কি বিনা দলিলে এক?**

পৃঃ ৩১, অনুঃ ৪ = "হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন (র)–-এর একটি নকলঃ বন্ধুগণ! মাওলানা রূমী (র)-এর বর্ণিত নিম্নলিখিত একটি নকল সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী নামে এক ব্যক্তি বড় আলেম ছিলেন। একদা তাহার মনে মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনঃপূত কামেল পীর পাইতেছিলেন না। পরে বহুদূরে এক পীর সাহেবের সন্ধান পাইয়া তাহার দরবারে হাজির হইলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া খাঁটি পীর বলিয়া তাহার নিকট পছন্দ হইল। মাওলানা সাহেব খাছ সময়ে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইয়া মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হুজুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার নাম ফখরুদ্দীন রাজী। পীর সাহেব বলিলেন, আপনি কি ইমাম ফখরুদ্দীন? যাহার সমকক্ষ কোন আলেম বর্তমানে নাই। তিনি বলিলেন, জি হাঁ, আমিই সে অধম। পীর সাহেব বলিলেন- "বাবা! এক কাজ করুন, এক বৎসর যাবত কিতাব দেখা বন্ধ করিয়া দেন, তাহাতে যতটুকু জায়গা খালি হইবে, ঐখানে কিছু এলেমে মারেফত রাখিতে চেষ্টা করিব। অতঃপর মাওলানা সাহেব জঙ্গলের ভিতরে গিয়া কয়েকটি পুরাতন মসজিদে বসিয়া কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পীরের আদেশ মতে কোন কিতাব দেখিলেন না। এক বৎসর পরে পীর সাহেবের দরবারে হাজীর হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনার আদেশ অনুযায়ী কোন কিতাব দেখি নাই। হুজুর বলিলেন, তবে এত দীর্ঘদিন কি করিয়াছেন। বলিলেন, হুজুর কিছু লিখিয়াছি। হুজুর বলিলেন- কি লিখিয়াছেন, আমাকে দেখান। হুজুরের কথামত সেই লেখা হুজুরের সম্মুখে লওয়া হইল উহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "বাবা! এত বড় তাফসীর কিতাব না দেখিয়া লিখিয়াছেন, ইহাতে আপনার এলেম আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আপনাকে আমি মুরীদ করিতে পারিব না, আপনাকে আমি দোয়া করি। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা সাহেব যেই কিতাব লিখিয়াছেন, তাহার নাম তাফসীরে কবীর, যাহার মূল্য এখন দুই তিন হাজার টাকার কম নহে। ইহা মাওলানা সাহেবের গভীর এলেমের পরিচায়ক। মাওলানা সাহেব এই কথা শুনিয়া দুঃখিত মন নিয়া রওয়ানা করিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, **মৃত্যুর সময় যখন শয়তান ঈমান লুটিবার জন্য আসিবে, তখন পীর ছাড়া উপায় নাই, পীর সাহেব তো আমাকে মুরীদ করিলেন না- এখন আমার উপায় কি?** এ কথা ভাবিয়া তিনি শয়তানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য এক হাজার দলিল যোগার করিলেন এই বিষয়ের উপর যে, আল্লাহ এক। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইমাম সাহেব, আল্লাহ কয়জন? ইমাম সাহেব বলিলেন, একজন।

শয়তান বলিল, না, বরং দুইজন-জমীনে একজন এবং আসমানে একজন। ইমাম সাহেব বলিলেন-

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

"আসমান - জমীনে দুই আল্লাহ হইলে সব কিছুতে ঝগড়া বাঁধিয়া সমস্ত কিছু বিনষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ দুইজনের মধ্যে তর্ক বিনিময় হইতে থাকে। অবশেষে মাওলানা সাহেবের এক এক করিয়া এক হাজার দলিল শেষ হইয়া গেল। এখন ইমাম সাহেব এমন বিপদে পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া শয়তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঈমান হারানোর সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সময় ঐ পীর সাহেব বদনা হাতে নিয়া ওজু করিতেছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পাইলেন। অতঃপর পীর সাহেব ইমাম সাহেবের বাড়ির দিকে কিছু পানি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, তুমি শয়তানকে বালিয়া দাও, বিনা দলিলে আল্লাহ পাক এক, তিনি এক হইবার জন্য কোন দলিলের দরকার হয় না। কয়েক মাসের রাস্তা দূর হইতে আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ আওয়াজ ইমাম সাহেবের কর্ণে পৌঁছিবামাত্র ইমাম সাহেব বালিলেন, শয়তান এখান থেকে ভাগ এবং জানিয়া রাখ, বিনা দলিলে আল্লাহ এক। শয়তান এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেল, তোমার ভাগ্য ভালো যে, একদিন কামেল পীরের কাছে গিয়া দোয়া নিয়াছিলা, নচেৎ তোমাকে বেঈমান করিয়া আমার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়া যাইতাম। আল্লাহ পাকের রহমতে ইমাম সাহেব পীরের দোয়ার বরকতে কালেমা তাইয়্যেবা পড়িয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন। প্রিয় মোমেনগণ! এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পীরে কামেল ছাড়া ঈমান নিয়ে যাওয়া কতটুকু সম্ভব! পীর বিহনে শুধু এলমে জাহের শিক্ষা করিয়া ঈমান নিয়া যাওয়া যে অসম্ভব- ইহার উপরই মাওলানা রূমী (রঃ) এই মেছাল দিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

گر باستدلال کار دیں بودے

فخر رازی راز دار دیں بودے

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** উম্মতের কারামাত নবীর মুজিযা ও সাহাবায়ে কেরামের কারামাতকে অতিক্রম করে চলেছে! শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল আল্লাহ এক হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নেই, তাই বিনা দলিলেই আল্লাহ এক হওয়াকে মানতে হচ্ছে। কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীরা কুরআন হাদীসে যেসব দলিল পেয়েছে সেসব দলিল কোন কাজেই আসার নয়। তাহলে আল্লাহ দলিলগুলো কেন উল্লেখ করেছে?

এসব ঘটনা প্রচারের উদ্দেশ্য কী? এসব দ্বারা কি হাদীসের স্পষ্ট এ দাবিকে খণ্ডন করা হচ্ছে না যে, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফকীহ আলেম এক হাজার আবেদ সূফীর চাইতে বেশি শক্তিশালী? হাদীসে এসেছে-

عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. (التاريخ الكبير للبخاري، الرقم: ١٠٤٦)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. (سنن الترمذي، باب في فضل الفقه على العبادة ٢٨٢٢)

عن أبي أمامة الباهلي قال: "ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : رجلان أحدهما : عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السموات والارض حتى النملة في حجرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا حديث حسن غريب صحيح. (سنن الترمذي الرقم: ٢٨٢٦)

মাওলানা রূমীর সিদ্ধান্তই কি শেষ সিদ্ধান্ত যে, দ্বীন দলিলের ভিত্তিতে চলবে না। যদি তাই হয় তাহলে ইলম ও ওলামার এ নাট্যমঞ্চের বৈধতা কী? আর যদি তা না হয়, তাহলে তা উপস্থাপন করে আমরা কী বলতে এবং কী করতে চাই? বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।

মৃত্যুর সময় পীর ছাড়া উপায় নেই -এর অর্থ কী? এমন কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় যা ঘটনার সঙ্গে খাপ খাবে না। ফখরুদ্দীন রাযী তো কুরআন হাদীসের ইলম শিখেই আলেম হয়েছেন। এরপর কেন তাঁর মৃত্যুর সময় পীর ছাড়া কোন উপায় নেই তা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

দেড় কোটি মুরিদের পীর প্রমাণ করে দিয়েছেন, দলিল ও জযবা মুখোমুখী হলে জযবা প্রাধান্য পাবে। তাহলে দলিল কি শুধুই কিছু মানুষের চাকরির খাতিরে টিকিয়ে রাখতে হবে?! আমাদের তালিবুল ইলমদেরকে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলে দিতে হবে। তাদেরকে চৌরাস্তায় বছরের পর বছর দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না।

**রাজত্ব দেয়ার শক্তিও বান্দার হাতে?!**

পৃ: ৪৪, অনু: ২ = "ইমাম বাকী বিল্লাহ (রহ.) সমস্ত রাত্রি জিকির করিতেন। একদিন ভোরে ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য হুজরা থেকে বাহির হইয়া রুটির দোকানে গেলেন। রুটিওয়ালা বলিলেন, হুজুর রুটি প্রস্তুত নাই। হুজুর তখন নানাবাইর দোকানে গেলেন এবং রুটি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। নানাভাই বলিলেন হুজুর তশরীফ রাখুন, গরম রুটি আছে। হুজুর সেইখানে বসিয়া মন পুরিয়া রুটি খাইলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, নানাভাই! তুমি আমার কাছে কি চাও? উত্তরে নানাভাই বলিলেন, হুজুর! আমি যাহা চাইব তাহাই কি দিবেন? হুজুর বলিলেন, হাঁ। নানাভাই এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। হুজুর বলিলেন, তুমি যদি আমার কাছে দুনিয়ার বাদশাহী চাও, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাহাই দিব। যদি স্বর্ণ চাও তবে তাহার খনি দেখাইয়া দিব। তুমি যাহা চাও, ইনশাআল্লাহ তাহাই দিব।

নানাভাই আরজ করিলেন, হুজুর আমি আখেরাত চাই, আমাকে আপনার মত বানাইয়া দিতে হইবে। হুজুর বলিলেন, ইহা অসম্ভব, তুমি দুনিয়ার যাহাই চাও তাহাই দিব। কিন্তু নানাভাই ছাড়িলেন না এবং বলিলেন হুজুর! দুনিয়ার যাহা কিছু দিবেন, তাহা শেষ হইয়া যাইবে, মৃত্যুর সময় কিছুই সঙ্গে যাইবে না। আমাকে আপনার মত বানাইতে হইবে। হুজুর বলিলেন, বাবা! উহা সহ্য করিতে পারিবে না, হয়ত মরিয়াও যাইতে পার। নানাভাই বলিলেন হুজুর! আপনার মত হইয়া মরিতে পারিলেও সার্থক হইবে। হুজুর তখন নিজের ওয়াদার কথা ভাবিয়া নানাভাইকে তাহার সঙ্গে চলিতে আদেশ করিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া নানাভাইকে বলিলেন, অজু করে দুই রাকাত নামায পড় এবং আমার সঙ্গে হুজরায় আস।

ভোরবেলা নানাভাইসহ ইমাম সাহেব হুজরায় ঢুকিবার কালে লোকদেরকে বলিলেন, আমাকে কেহ ডাকিবা না, কপাট খুলিবা না। ভোরে দাখেল হইয়া দুপুরের পূর্বে যখন নানাভাই একই কপাট দিয়া বাহির হইলেন, তখন লোকে দেখিয়া হয়রান হইয়া গেল। কারণ, হুজুর নানাভাইকে এমন ফয়েজ দিলেন, যাহার ফলে নানাভাইর জাহিরী ছুরতও পরিবর্তন হইয়া ইমাম বাকী বিল্লা (রহ.) ছুরাত হইয়া গিয়াছে। কে ইমাম এবং কে নানাভাই, চেহারা দ্বারা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। ইহাকে ফয়জে ইত্তেহাদী বলা হয়। একই সঙ্গে এত নূরের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাই দুই এক দিন পরে এন্তেকাল করেন"।

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** একজন মানুষ চাইলে কাউকে বাদশাহী দান করতে পারে, চাইলে স্বর্ণের খনির সন্ধান দিতে পারে, দুনিয়ার যা চাইবে তাই দিতে পারে, চাইলে এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির মত বানিয়ে ফেলতে পারে -এর সাথে কি এ আয়াতের قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ কোন বৈপরিত্য নেই?

ফয়য দ্বারা যদি একজনের চেহারা আরেক জনের চেহারার মত হয়ে যায় তাহলে এ ফয়যের ব্যাখ্যা চাই। বলতে হবে ফয়য কাকে বলে? এমনিভাবে কোন মানুষের যে নূরের চাপে কোন ব্যক্তি মারা যায় সে নূরেরও ব্যাখ্যা দিতে হবে। বলতে হবে এ নূর কাকে বলে?

কেউ যদি মনে করে, প্রত্যেক কুফরী দাবির আগে পরে 'আল্লাহর ইচ্ছায়' যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব এটা আর কুফরী হওয়া সম্ভব নয় -এমন কেউ মনে করে থাকলে এ মনে করা সঠিক নয়। কারণ, কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহর ইচ্ছায় কাফেরকে জান্নাতে নিতে পারি, বা মৃতকে জীবিত করতে পারি, বা আমার মৃত্যুর স্থান কাল জানি -এভাবে বললেও এ বক্তার ঈমান বাঁচানো সম্ভব হবে না। কারণ, এসব পারার বিপরীত ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে এসে গেছে। এর বিপরীত দাবিই কুফর।

## বান্দার كن فيكون এর মাকাম

পৃঃ ৪৫, অনুঃ ৩ = "কোন কোন মুরীদ পীরের কাছে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, হুজুর! পরবর্তী ছবক দেন না কেন? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আল্লাহ পাকের নামের মধ্যে নূর ভরা রহিয়াছে। যাহারা পীরে কামেল, তাহারা আপন মুরীদকে আস্তে আস্তে সবক দিয়া উপযুক্ত বানাইতে থাকেন। আমার মোর্শেদ পীরে কামেল হযরত ক্বারী সাহেব হুজুরের দরবারে এক বৃদ্ধ উপস্থিত হইয়া মুরীদ হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, হুজুর! আমাকে যাহা দেওয়ার একবারেই দিবেন, বার বার আসিতে পারিব না। উত্তরে হুজুর বলিলেন, বাবা! তাহা সহ্য করিতে পারিবা না। কিন্তু বৃদ্ধ হুজুরের নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বার বার বলিল- হুজুর একত্রেই দিতে হইবে, আমি সহ্য করিতে পারিব। এই কথায় হুজুর বিরক্ত হইয়া তাহার ছিনার প্রতি আঙ্গুলির ইশারা করিয়া বলিলেন, এতই পার? এই কথা বলামাত্র ঐ ব্যক্তি চিখ মারিয়া জমিনে পড়িয়া আছাড় খাইতে লাগিল। বহু সময় পর হুশ ফিরিয়া আসিলে কাঁদিতে লাগিলেন। হুজুর তখন দোয়া করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিদায় দিলেন"।

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** এই সবক কি ওহীর মত কোন বিষয়? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এর সুস্পষ্ট পরিচয় দরকার। যদি মনে হয় কুরআন হাদীসের স্থূল জ্ঞানের দ্বারা তা বোঝা সম্ভব নয়, তাহলে আবদার থাকবে এ স্থূল জ্ঞানীদের সামনে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন না করা হোক।

## স্থূলজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করতে হবে?

পৃ: ৬৬, অনু: ১ = "হযরত ফরিদউদ্দীন আলাউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আলাউদ্দীন! এই এক বৎসর যাবত তুমি কি খাইয়াছ? উত্তর করিলেন, আল্লাহ পাকের জিকির খাইয়াছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন খাওয়া দাওয়া করনাই? তোমাকে বাবুর্চিখানার ম্যানেজার বানাইয়াছি, তবুও তুমি কিছু খাইতে পার নাই কেন? আলাউদ্দীন (রঃ) উত্তর করিলেন, মামুজান! আপনি আমাকে লোকদের খাদিম দিয়া খাওয়াইতে বলিয়াছেন, কিন্তু আমাকে খাইতে অনুমতি দেন নাই। তিনি বলিলেন, খাওয়ার জন্য যদি অনুমতি ভিন্নভাবে দেওয়া দরকার মনে করিয়া থাক, তবে তুমি কেন পুনঃ অনুমতি নেও নাই। আলাউদ্দীন উত্তর করিলেন, আমি এখানে আসিয়াছি আল্লাহ পাকের প্রেম হাছেল করিতে, তাই দুনিয়ার খাওয়ার নিমিত্ত অনুমতি নিতে যাওয়া বেয়াদবী মনে করি"।

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** নবীর ক্ষুদা পেত, উম্মতের ক্ষুদা পায় না। নবী উম্মতকে ইফতার না করে একাধারে দুই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন তাদের দুর্বলতার কারণে। উম্মত একাধারে একবছর উপবাস করতে পারছে! সাহাবী দু'দিন না খেয়ে বেহুশ হয়ে যেতেন, কয়েক শতাব্দী পরের উম্মত এক বছর না খেয়ে দিব্বি চলছে! নবী এক দিন ক্ষুদার্ত হয়ে পাথর বাঁধতে বাধ্য হয়েছেন, উম্মত এক বছর স্বেচ্ছায় না খেয়ে স্বাভাবিক রয়েছে!

## বান্দার তাজাল্লী আল্লাহর তাজাল্লীকে অতিক্রম করছে

পৃ: ৬৬, অনু: ২ = "আলাউদ্দীন সাবের (রঃ) বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভিন্ন গৃহে একা একা মোরাকাবায় থাকিতেন। রাত্রে ঐ বধুকে তাহার গৃহে দেওয়া হইত, প্রাতে বধু চলিয়া আসিতেন। তাহাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কোন ভাব পাওয়া যাইত না।

একদিন প্রাতে আর বধু আসে না, তাই মাতা সাহেবানী ঐ গৃহের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- বাবা আলাউদ্দীন! বধূ মা কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন, আমি বধু চিনি না, তবে আজ শেষ রাত্রে আমার কাছে একজন মেয়েলোকের মত অনুভব হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখানে কি চাও? সে উত্তর করিল- আমি আপনার মাশুক। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে এমন একটি গরম উথলিয়া উঠিল, যাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। আমি বেহাল অবস্থায় বলিলাম, মাবুদ বিনে আমার কোন মাশুক নাই। এই সময় আমার মুখ হইতে এমন একটি ভীষণ চিৎকার বাহির হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অতঃপর আর ঐ মেয়েলোকটিকে দেখিতে পাই নাই। ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহর নূরে কোহেতূর পাহাড় জ্বলিয়া গেল মানুষ কেন জ্বলিবে না?

...................................................

"فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ২

**-? গ্যালারি থেকে:** আল্লাহর নূরে সেখানে পাহাড় জ্বলেছিল, মূসা জ্বলেনি। মানুষের নূরে মানুষ জ্বলতে শুরু করেছে। পাহাড়তো নস্যি!

আয়াতটি উল্লেখ করার মানে কী? তার মানে পাহাড়ের উপর আল্লাহর যে তাজাল্লী বর্ষিত হয়েছে, স্ত্রীর উপর আলাউদ্দীন সাবেরের সে তাজাল্লী বর্ষিত হয়েছে। ভেদ-রহস্যের জগত। হতেও পারে। তবে কুরআন হাদীসের স্থুল জ্ঞানে এর কোন সম্ভাবনা নেই, তাই এ বিশ্বাসেরও কোন বৈধতা নেই।

## আর্তনাদ

ভেদে মারেফত নামক বইটিতে এতগুলো কুফুরী কথা ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী বিষয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দাদার এই বইয়ের ব্যাপারে নাতির মন্তব্য হল- তাতে কোন ভুল নেই। অবশ্য তার দৃষ্টিতে ভুল ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। কেননা তার মতে দলিল ও জযবা মুখোমুখি হলে জযবা গালেব হয় আর দলিল হয় মাগলূব।

বড়দের লেখা, বড়দের তাকরীযে ভরা, বড়দের নিয়ম অনুযায়ী চলছে। তাই তালিবুল ইলমদের পড়তে কোন বাধা নেই। তাই এ বিষয়ে সতর্ক করারতো প্রশ্নই আসে না। উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এমনটিই দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে।

## জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দর্জা

## জিহাদ চলছে

বইয়ের নাম 'জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দর্জা' একটু নিচে লেখা আছে 'মুজাহিদ কমিটির নিয়মাবলী' বইয়ের প্রথম শিরনাম 'মুজাহিদীন ও হালাকায়ে জেকেরের ফজিলত', ৬ পৃষ্ঠায় আছে 'তাই আমি খাছ দেলে নিয়ত করিয়াছি যে, বেহেস্তে পৌঁছার উসিলা হিসাবে মুসলমানদের কেন্দ্রগুলিতে একটি মুজাহিদ দল গঠন করিয়া হালকায়ে জেকেরের বন্দোবস্ত করিয়া দিব'। ৮ পৃষ্ঠার শিরনাম হচ্ছে 'মুজাহিদগণের কাজ কি কি এবং কোন্ বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষা দিতে হইবে।' এ শিরনামে লেখা আছে '..... হামেসা টুপি মাথায় রাখিবেন এবং কল্লিদার জামা ব্যবহার করিবেন .....'। ৯ পৃষ্ঠায় আছে 'মোটকথা ছাওয়াবের কাজে ও গুনাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা এইরূপ চলিতে পারিবেন, তাহারাই পূর্ণ মুজাহিদ বলিয়া খোদার নিকট গণ্য হইবেন। ইনশাআল্লাহ।' ১০ পৃষ্ঠার শিরনাম 'কমাণ্ডারের কর্তব্য' এ শিরোনামে লেখা আছে 'দায়ী ইলাল্লাহ বা কমাণ্ডার- যাহারা লোকদিগকে আল্লাহ পাকের দিকে ডাকিবার জন্য ওয়াদা করিয়াছে। আপনারা আছর নামাজ বাদ আপনাদের এলাকার মধ্যে যত পুরুষ আছে, তাহাদিগকে ডাকিবেন এবং খুব অনুরোধ করিবেন যে, যাহাতে তাহারা হালকায়ে জেকেরে হাজির হয় চুঙ্গা ফুকাইয়া বলিবেন .......'।

-ঐতিহাসিক চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ. -এর রচনাবলী ৩

**-? গ্যালারি থেকে:** অস্ত্র বিহীন এই জিহাদ, মুজাহিদ, আমীরুল মুজাহিদীন এবং শহীদ হওয়া আর কতকাল চলতে থাকবে? আর অস্ত্র বিহীন জিহাদের জোয়ারে অস্ত্রের জিহাদ কতকাল পালিয়ে বেড়াতে থাকবে? সীরাতের জিহাদগুলো থেকে যদি তরবারি, ঢাল, রক্ত, হত্যা, রশি দিয়ে বাঁধা, বর্শা, নেযা, খঞ্জর, মিনজানিক, তীর, ধনুক ইত্যাদি শব্দগুলোকে মুছে ফেলা যেত তাহলে অস্ত্র বিহীন মুজাহিদ ও আমীরুল মুজাহিদীনের জন্য অনেক সুবিধা হত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দাদার কথা থেকেতো বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ হল যিকির করা, মাথায় টুপি রাখা, কল্লিদার জামা পরা, সওয়াবের কাজ ও গুনাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নাতির কথা হচ্ছে, "সশস্ত্র বিপ্লব বর্তমানে অসম্ভব, তাই বর্তমানে নির্বাচনই হচ্ছে জিহাদ। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য **সাধনা** করলে হবে মুজাহিদ"। দাদা যে উদ্দেশ্যে মুজাহিদ কমিটি গঠন করেছিলেন নাতি কি সেটির উপর আছে? নাকি দাদার সময়ের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মাঝে অনেক ব্যবধান?

মূলত, জিহাদের পরিচয় যখন আমরা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদি থেকে গ্রহণ করছি না, তখন বনী ইসরাঈলের মত ময়দানে তীহে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। অবশ্য এগুলোতো হচ্ছে আমাদের মত কুরআনের-হাদীসের স্থূল জ্ঞানের অধিকারীদের মন্তব্য। বাতেনী রাষ্ট্রের অধিপতি ও জযবার ফেরিওয়ালাদের সামনে কি এসব কথা টিকে?

## উদ্ধৃতি এই পর্যন্ত

## আর্তনাদ

'ভেদে মারেফত' ও 'জেহাদে ইসলাম' থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা আপাতত এখানেই শেষ করা হল। আশা করি নমুনাস্বরূপ এতটুকু যথেষ্ট হবে।

যুগের পর যুগ এ বই ঘরে ঘরে আছে। তালিবুল ইলমদের হাতে আছে। নতুন আঙ্গিকে ছেপে ছেপে আসছে। তালিবুল ইলমরা এর উদ্ধৃতি দিয়ে ভুল কথা ও ভুল বিশ্বাস প্রচার করে চলেছে। ইলমী ও দ্বীনী কোন দায়িত্ববোধ জেগে ওঠেনি। তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন হয়নি। ডেকে এনে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি যে, এ বইটিতে কী পড়েছ? এর মাঝে কোন মুনকার বিষয় চোখে ধরা পড়েনি?

## ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা

**পৃঃ ১২, অনুঃ ১** = "আমাদের কাছে আমাদের দেশই সর্বাধিক প্রিয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলিম। সুতরাং ইসলাম ধর্ম আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম। এটাও স্বভাবগত বিষয়। আমাদের দেশ আয়তনে ছোট হলেও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। আর সম্প্রীতির দেশ হিসেবে এদেশের সুখ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যে দেশের সবাই মুসলমান সে দেশের চাইতেও এ দেশ প্রিয়। যে দেশে আল্লাহর দুশমনদের ঠাঁই নেই সে দেশের চাইতেও প্রিয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান হওয়ার কারণে ইসলাম ধর্ম সব চাইতে প্রিয় ধর্ম। আনুপাতিক হারে যে ধর্মের অনুসারী কম সে ধর্ম কম প্রিয়। আল্লাহর দোস্ত-দুশমনের পরস্পর সম্প্রীতির কারণে প্রিয়।

মুসলমানদের কাছে কোন একটি দেশ প্রিয় হওয়ার কারণ এগুলো। তাও আবার একজন কর্ণধারদেরও কর্ণধারের কাছে। যিনি সব কর্ণধারদের কান ধরে ঘোরান।

**পৃঃ ১২, অনুঃ ২** = "আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী-মিনিস্টার, সাংসদ এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সকলে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে থাকেন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যারা ধর্মকে গণভবন, বঙ্গভবন ও সংসদ ভবন থেকে বের করে দিয়ে ঘরের কোনে অবস্থিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে তাঁরাইতো 'মহামান্য' হওয়ার কথা! তাই না? তারা এবং তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাইতো ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে বক্তব্য দেয়ার কথা।

কারণ তারা দেখেছে, ইসলামকে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার থেকে বিদায় করে দেয়ার পরও ইসলামের কর্ণধারের যবানে 'মহামান্য' শব্দের উচ্চারণ থেকে মধু ঝরে, মুখ রসে ভরে যায়। এরপরও ইসলামের শত্রুদের কাছে ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম হবে না?

**পৃঃ ১৪, অনুঃ ২** = "আমাদের দেশের একটি সংবিধান আছে। সকলকেই এই সংবিধান মেনে চলতে হয়। এই সংবিধানের আলোকে সরকার, বিরোধীদল ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজ করে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যে সংবিধান চারটি কুফরী ইজমের উপর রচিত। মুসলমানরাও তা মানতে হয়। কর্ণধারগণ বুক ফুলিয়ে সে কথা বলে চলেছেন। ঈমানের কোন সমস্যা হচ্ছে না।

**পৃঃ ১৫, অনুঃ ৪** = "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় অনুশীলন কেবল ব্যক্তিভিত্তিক নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস দমনের জন্য ধর্মীয় অনুশীলনের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তার চাহিদার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তাই তার চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া ও বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে তরিৎ ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** ব্যবস্থাটা কাকে গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে? যে রাজা নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী দেশ চালায় না; বরং সে ধর্মের রীতিনীতির বিপরীত

দেশ চালায় সে রাজা কোন ধর্মের লোক? আর রাজার চাহিদার বিবেচনাই কি মূল ফরয না কি আরো ফরয আছে? রাজাদের ইচ্ছাপূরণই কি আমাদের কর্ণধারদের অভিষ্ট লক্ষ্য?

রাজা নিজে ঘোষণা দিলেন ধর্ম যার যার অর্থাৎ ধর্ম ব্যক্তিভিত্তিক একটি বিষয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কর্ণধার বুঝতে পেরেছেন, রাজা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করেন না। কর্ণধারের এ কথা শুনে আমরাতো ধোঁকা খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু রাজাও ধোঁকা খাবেন কি না? সেটা রাজার সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

**পৃ: ১৬, অনু: ২** = "শিক্ষা সিলেবাসে ইসলামবিরোধী কোন কিছু আছে কি না, তা দেখার সময় এসেছে। যদি কিছু থাকে তাহলে অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। শিক্ষাসিলেবাসে ইসলামের সাথে সংঘাতমূলক বিষয়াদি থাকলে তা বাদ দিতে হবে, যাতে মুসলিম যুবকদের অন্তরে আঘাত না লাগে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শিক্ষা সিলেবাস বিশেষ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে না; বরং সকল ধর্মের আকীদা বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে, বৈধ-অবৈধকে রক্ষা করে তৈরি হবে -আমাদের কর্ণধারগণ এ আশা কেন করছেন? আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য? না কি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য?

সিলেবাসের মধ্যে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে সম্মানিত করা হবে না কি অপমান করা হবে? সম্মানিত করলে এক জায়গায় আঘাত লাগবে, আর অপমান করলে আরেক জায়গায় আঘাত লাগবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কর্ণধারগণ ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের অনুসারীদের কাছে যেসব আবদার করে চলেছেন সেসব আবদার রক্ষা করা এবং এসব অসংলগ্ন কথা শোনার ধৈর্য তারা কতক্ষণ পর্যন্ত দেখাতে পারবে?

হয়তো পারবেও? কারণ এক কৌশলেতো আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায় না।

শিক্ষা সিলেবাসে ইসলামবিরোধী কিছু আছে কি না তা বহু আগে দেখা হয়ে গেছে। মাননীয় ও কর্ণধারগণ যেভাবে বক্তব্য দিয়ে চলেছেন, মুসলিম যুবকদের অন্তরে আঘাত লাগার মত আর জায়গা থাকবে না। যদিও কোথাও আঘাত লাগছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে তারা তা নিয়ন্ত্রণ করবে। কারণ সে আঘাতকে লালন করতে গেলে তারা সন্ত্রাসের (?) জালে জড়িয়ে পড়তে পারে।

**পৃ: ১৭, অনু: ১** = "আমাদের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ এই গুলশান মসজিদে জুমার নামায আদায়ের জন্য এসেছেন। আমি আশা করছি, তিনি এ সমস্ত বাক্য ব্যবহারের ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে

ধরবেন। আমার ধারণা হল, আসলে সরকার বলতে চায়- আমরা যেন সতর্ক থাকি, যাতে মসজিদে সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করে অঘটন ঘটাতে না পারে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এই 'মাননীয়' সম্ভবত সেই 'মাননীয়' যিনি ১/১২/২০১৬ খৃস্টাব্দে সর্বধর্মীয় প্রার্থনা সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। যে সভায় প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা আপন আপন মাবুদের কাছ থেকে নিজেদের সকল আর্জি আদায় করিয়ে নিয়েছিলেন। প্রধান অতিথি হিসাবে এ মাননীয় সকল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। মুসলমানদের কর্ণধারদের কাছেতো এমন ব্যক্তিই 'মাননীয়' হওয়ার বেশি উপযুক্ত (?)। তিনিই জুমার নামাযের উপযুক্ত মুসল্লী এবং সঠিক বক্তব্যের উপযুক্ত ব্যক্তি (?)।

খবরটি দেখুন, দৈনিক নয়াদিগন্ত ২/১২/২০১৬ পৃঃ ৪, কলাম ২, শিরনাম: হাক্কানী আঞ্জুমানের উদ্যোগে সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভা

**পৃঃ ২০, অনু: ২** = "বর্তমানে এ দেশে কওমি মাদরাসা সম্পর্কে নানা কিছু রটানো হচ্ছে, আর সরকারী, বেসরকারী অনেক লোক না বুঝে এসব মাদরাসার প্রতি ভুল ধারণার শিকার হচ্ছে। বস্তুত এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান কামাল সাহেব মাদরাসাগুলোতে যেয়ে যেয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন যে, এ সমস্ত মাদরাসার ছাত্ররা যারা আট-নয় বছর পড়াশোনা করে হাফেজ, কারী, মাওলানা ও মুফতী হচ্ছে তাদের পক্ষে বোমাবাজি, জঙ্গীবাদী করা সম্ভব নয়"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কারণ এ সব কিছু অস্ত্রের আওতায় পড়ে। আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা অনন্তকালের জন্য হারাম (?)। অস্ত্র ব্যবহারের বৈধতা শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য। এমতাবস্থায় সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভার প্রধান অতিথির বাহবাহ ছাড়া আমাদের আর কী সম্বল আছে? একজন ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের গুরু মহাশয়ের আনুকূল্য ছাড়া আমাদের আর আছে কী?

**পৃঃ ২১, অনু: ২** = "এক সফরে আমি কাতার গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানকার শতভাগ ইমামের মধ্যে বাংলাদেশি হাফেজ ইমামদের সংখ্যাই ৮০ ভাগ। এই ইমামরা বছরের বিভিন্ন সময় বিদেশ হতে তিন হাজার কোটি টাকার অধিক দেশে পাঠিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখছে। বস্তুত এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সরকারকে অবগত হতে হবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এই ইমামদেরকে মাদরাসায় না পড়িয়ে অথবা মাদরাসার ঘন্টার ফাঁকে ফাঁকে কোদাল আর টুকরির প্রশিক্ষণ দিলে পাঁচ

হাজার কোটি টাকার মত আসত। এতে সরকারের দৃষ্টি আরেকটু দ্রুত নিজেদের দিকে ফেরানো যেত। টাকা, দেশ আর শাসকবর্গের সুদৃষ্টি ছাড়া অমাদের আর আছে কী?

**পৃ: ৬৬, অনু: ২ =** "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মনে আঘাত দিতেন না। আমি আশা করবো ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন, তারা কারো মনে আঘাত দিয়ে কথা বলবেন না। দয়া মায়া ও সিজদার মাধ্যমে কেঁদে আমার নবীকে বিশ্বনবী বানাতে হবে। অমুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে দীনের পাথে নিয়ে আসতে হবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** অতএব কুরআন, হাদীস, সিরাত ফিকহের যে পাতাগুলোতে অমুসলিমদেরকে আঘাত করার উল্লেখ রয়েছে সেগুলোকে ছিড়ে ফেলতে হবে (?)। সব ভুলে যেতে হবে। নতুন এক ইসলামের শুভ উদ্বোধন করতে হবে (?)। এগুলো হচ্ছে প্রজন্মের জন্য সবক।

**পৃ: ২১, অনু: ৫ =** "মুসলমানদের মাঝে যারা এখনো না বুঝে গোনাহ বা কুফরি কাজে লিপ্ত আছে, তাদেরকেও বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানি প্রবাহিত হয়েছিল উম্মতের জন্য। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বছর সময় পেয়েছিলেন। দুবছর পর যখন তিনি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন তখন লক্ষাধিক কাফের একসঙ্গে মুসলমান হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমরা একসঙ্গে এতগুলো লোক কেন ইসলাম গ্রহণ করলে? উত্তরে তারা বলেছিল, হযরত আবু বকর, হযরত উমর প্রমুখ ব্যক্তিরা আমাদের সাথী ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মানুষ যে তার সুহবতে এসে এ লোকগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। আজ যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এসেছেন তাই তার নিপুণ আখলাক ও সুন্দর চরিত্র দেখে আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। নবীর আখলাক, দয়া-মায়া, উদারতা ও ক্ষমা এমনই ছিল যে, রক্তাক্ত হওয়ার পরেও তিনি কাফেরদের জন্য বদদোয়া না করে হেদায়াতের দোয়া করেছিলেন আল্লাহর দরবারে। আমরা কেন তা বুঝি না। আমাদের কাজ হলো আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। রাসূলকে রাজি করলে আল্লাহ রাজি হন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** তার মানে, মুসলমানদের হাতে আল্লাহর দুশমনদের শরীর থেকে কখনো রক্ত প্রবাহিত হয়নি?! তাদেরকে বদদোয়া করেননি? মিথ্যুক!

**পৃ: ২২, অনু: ২ =** "তৃতীয়ত সারাদেশের মুসলিম অমুসলিমদেরকে ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা, যাতে দুনিয়ার জীবনের পর তাদের কবরের

জীবন শান্তিময় হয়। বস্তুত এ জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা অপরিহার্য”।

**-? গ্যালারি থেকে:** অমুসলিমদেরকে ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখার পদ্ধতি কী? আর যদি মুসলমান বানিয়ে জড়িয়ে রাখা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তারা অমুসলিম কীভাবে? অমুসলিমদের কবরের জীবন শান্তিময় করার পদ্ধতি কী?

**পৃ: ২৩, অনু: ২ =** “এ মাদরাসা হতে এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি টাইটেল পাশ, পাঁচ হাজারের মত হাফেজ, মুফতি, মুহাদ্দিস হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা কোন দিনও রাজনীতি ও বোমাবাজি কী জিনিস তা বোঝেই না”।

**-? গ্যালারি থেকে:** একজন মুসলমানের জন্য এর চাইতে বড় আর কোন ফযীলত হতেই পারে না (?)।

কারণ, রাজনীতি করলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা (?) আছে, যার কথা শুনলেই এ কর্ণধার ভয়ে কেঁপে ওঠেন। বোমাবাজি বা অস্ত্রচালনা শিখলে আল্লাহর দুশমন ও তাদের দালালদের কষ্ট হবে। আর আল্লাহর দুশমনদের কষ্ট হলেই এ কর্ণধারের খুব কষ্ট হয়।

শরীয়তের পক্ষ থেকে অর্পিত ‘আসসিয়াসাতুল ইসলামিয়্যাহ’ ও وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠) এর বিধানকে অস্বীকার করে একজন মানুষ মুসলমান হয় কীভাবে?

রাজনীতি এখন নোংরা হয়ে গেছে, ইসলামী রাজনীতি এখন ভুল পথে চলছে, অস্ত্রের এখন ভুল ব্যবহার হয় -এসব খোঁড়া অজুহাতে কি আর মনের খাবাসাতকে ঢেকে রাখা যাবে?

**পৃ: ২৩, অনু: ৪ =** “হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা চারটি। যথা-(১) আলেম হওয়া, (২) ছাত্র হওয়া। (৩) আলেম ও ছাত্রকে মহব্বত করা, (৪) সাহায্যকারী হওয়া- এ চারের বাহিরে কেউ জান্নাতে যেতে পারে না। এর বাহিরে যারা যাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে”।

**-? গ্যালারি থেকে:** হাদীসটির উদ্ধৃতি কি মুহতারামের জানা আছে? এর বর্ণনাগত অবস্থা কি কখনো দেখার সুযোগ হয়েছে?

**পৃ: ২৪, অনু: ৩ =** “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান কামাল সাহেব সুন্দর কথা বলেছেন, তিনি সারাদেশে কওমি মাদরাসাগুলোতে ঘুরে একজন

ছাত্রকেও পাননি যে, বোমাবাজী ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মন্ত্রী সাহেবের কথা থেকে বুঝে আসে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের চরিত্র খারাপ নয়"।

**-? গ্যালারি থেকে:** হাঁ, মন্ত্রী সাহেবের সনদ ছাড়া এখন আমাদের অস্তিত্বই যে বৃথা। কিন্তু মন্ত্রী সাহেব কি আসলে আমাদের এসব তেলে সন্তুষ্ট হয়েছেন? না কি আরো খাঁটি হওয়া লাগবে? ইবলিস কাউকে ভালো বলার পর, তার ভালোর পক্ষে আর অন্য কোন সনদ লাগে না।

**পৃ: ২৪, অনু: ৪** = "এ সমস্ত মাদরাসার ছাত্রদের ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগ নেই। তারা আজ কওমি মাদরাসার ছাত্রদেরকে কারাগারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইমামতির দায়িত্ব দিচ্ছে। আমার এক সাথী আমেরিকার এক জেলখানাতে ইমামতির চাকরি করেন। সরকার তাকে মাসে ২৫ হাজার ডলার দিয়ে থাকে। সাথীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি জেলখানায় কী করেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এদেশের সরকার কওমি আলেম-ওলামাদেরকে সুচরিত্রবান মনে করেন। এ কারণে জেলের অপরাধীদের চরিত্র ঠিক করার জন্যই সরকার আমাকে সেখানে নিয়োগ দিয়েছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** পঁচিশ হাজার ডলারের এ ইমাম সাহেব আমেরিকার জেলের অপরাধীদের চরিত্র ঠিক করে কুফর থেকে ঈমানের দিকে আনেন না কি ঈমান থেকে কুফরের দিকে নিয়ে যান? বুশ ও ট্রাম্প কী কাজের জন্য এ ইমামের পেছনে পঁচিশ হাজার ডলার ব্যয় করেন? আর বুশ ও ট্রাম্পের পছন্দের কওমী আলেম ওলামা কারা হওয়ার কথা? খুশি হওয়ার আগে মনে হয় একটু ভাবতে হবে।

**পৃ: ২৫, অনু: ১** = "এদেশের কওমি মাদরাসাগুলোকে বুঝতে সরকারের দীর্ঘ ৫০ বছর সময় লেগেছে। তারা আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, এ মাদরাসাগুলো কোন রাজনীতি করে না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** বোঝা মুশকিল, কর্ণধারগণ ধোঁকা খাচ্ছেন? না কি ধোঁকা দিচ্ছেন?

**পৃ: ২৫, অনু: ৩** = "সরকারের কাছে আমার আবেদন থাকবে, দেশে কারা অশান্তির সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করুন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ দাবি ও আবেদন করার মত লোকের কোন অভাব নেই। যে দাবিটি কেউ করে না সে দাবিটি করার মত ইচ্ছা ও হিম্মত সঞ্চয় করা দরকার। হাতড়ে দেখা দরকার, ঈমান কী অবস্থায় আছে?

**পৃ: ২৬, অনু: ১** = "আজ আমরা মুসলমানদের যে দেশটি দেখেছি আয়-উন্নতির উচ্চশিখরে, সে দেশটিই আজ নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দুর্বহ অবস্থায় কাল গুনছে। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা পাকিস্তানকে শেষ

হতে দেখেছি। লিবিয়াকেও ভুগর্ভে দাফন হতে দেখেছি। দেখেছি ইরাককে বিশ্বমানচিত্র থেকে ধূলিসাৎ হতে। ঠিক সেভাবেই যখন বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ যখন আয়-উন্নতির জোয়ারে ভাসছে। আল্লাহর দয়ায় যখন আমরা বিশ্বমানচিত্রে একটা শক্ত অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। দেশের এমন একটি মুহূর্তে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহকে রাজি-খুশি করিয়ে তার দেয়া নবীর পথ অনুসরণ করে সামনে বাড়ছি। তখন বিভিন্ন দিক থেকে নানাধরণের ষড়যন্ত্র আসছে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** বক্তব্যটা কিছুটা সাধারণ সম্পাদকের বক্তৃতার মত হয়ে গেল। না কি কেউ কাট করে এনে বসিয়ে দিয়েছে?! যাই হোক সমস্যা নেই।

তবে বাড়তি সংযোজনটা দেখার মত! চারটি কুফরী মূলনীতির উপর রচিত সংবিধানের আলোকে চলেও একটি দেশের মুসলমানরা আল্লাহকে রাজি খুশি করিয়ে তার দেয়া নবীর পথ অনুসরণ করে সামনে বাড়ছে। এটা সত্যি সপ্তাশ্চর্যের বাইরের হবে। চর্মচক্ষু দিয়ে তা অনুধাবন সম্ভব নয়। অথবা এ বক্তা অনেক ভয়ঙ্কর! আমাদের নাগালের অনেক বাইরে।

**পৃ: ২৯, অনু: ২ =** "কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। সাধারণ একটি ছোট প্রাণী পিঁপড়াকেও যেখানে কষ্ট দিতে ইসলাম নিষেধ করেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষকে কীভাবে কষ্ট দিবে। ছোট থেকে ছোট একটি প্রাণীকে কষ্ট দেয়া যে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, নিষিদ্ধ করেছে। সেখানে যে মানুষের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মানুষকে কীভাবে কষ্ট দেবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** মুখোশ পরে যারা নাস্তিকদের পক্ষে কথা বলে কথাটা তাদের কথার মত হয়ে গেল। ভুল বলেছি, মত নয় তাদের কথাটাই এখানে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। আট রশির দরবারেও এরূপ কথা দেখেছি। বুঝে আসছে না আমাদের কর্ণধারদের আলোচনাগুলো মুসলিম অমুসলিমের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের দিকে চলে গেল কেন?

সমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আমাদের কর্ণধারগণ ভুলে গেছেন যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলূক মানুষের বিশাল থেকেও বড় একটি অংশের জন্যই পরকালে জাহান্নাম তৈরি করা হয়েছে এ শ্রেষ্ঠ মাখলূককে কষ্ট দেয়ার জন্য। কারণ পৃথিবীতে তারা তাদের খালেকের সঙ্গে দুশমনি করে চলেছে। কোন ছোট পিঁপড়া, গাছের পাতা, গাছের ডাল, কুকুর, বিড়াল, পাখি ইত্যাদির জন্য জাহান্নাম তৈরি করা হয়নি। এরা তাদের খালেকের অবাধ্যতা করে না। অতএব আল্লাহ তাআলা পরকালে যাদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা

রেখেছেন তাদেরকে দুনিয়াতেও হালকা পাতলা চড় থাপ্পড় মারার ব্যবস্থা রেখেছেন। কর্ণধারগণ এসব আয়াত ভুলে গেলে চলে না-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦)

سورة البقرة.

**পৃ: ৩০, অনু: ৪ =** "কিন্তু আমার মনে হয়, এদেশে প্রকৃত নাস্তিক কেউ নাই। কারণ দেখা যায়- যে লোকটা আল্লাহকে নিয়ে মন্তব্য করে, রাসূলকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে, ইসলাম নিয়ে কটুক্তি করে সেই আবার মরার আগে অসিয়ত করে যায়- অমুক হুজুরকে দিয়ে আমার জানাযা পড়াতে। কোরআন খতম দিয়ে দোয়া করাতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন কথা হলো, সে যদি প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকই হবে, সে যদি পরকালকে বিশ্বাস নাই করবে তাহলে এমন অসিয়ত করার কি অর্থ? আমি বলি যে, এরা প্রকৃত নাস্তিক না, বরং এরা রাজনৈতিক নাস্তিক। রাজনৈতিক স্বার্থে এরা নাস্তিক"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে আবার জানাযার নামায পড়ার জন্য ওসিয়তও করে যায় তাহলে কর্ণধারদের কিতাবে তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা লেখা আছে? আমরা ছোটরা যেসব কিতাব পড়েছি সেসব কিতাবে তো লেখা আছে, মসজিদে হারাম নির্মানকারীরাও কাফের ছিল, আর বর্তমান কালের স্বঘোষিত নাস্তিকরাও সুরঞ্জিত সেন গুপ্তদের জন্য পরকালের শান্তি কামনা করছে।

আর প্রকৃত নাস্তিক এবং রাজনৈতিক ও স্বার্থের নাস্তিকের মাঝে পার্থক্যটা কি এরকম যে, যারা স্বার্থহীনভাবে এখলাসের সাথে নাস্তিকতা করবে তারা প্রকৃত নাস্তিক। আর যারা দুনিয়ার ভোগবিলাসের জন্য, মা-বোন-মেয়ের সঙ্গে কুকুর বিড়াল গাধার মত ফ্রি...... করার জন্য, পৃথিবীর বুকে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাস্তিকতা করবে তারা হচ্ছে স্বার্থের নাস্তিক ও রাজনৈতিক নাস্তিক?

আচ্ছা, যারা প্রকৃত নাস্তিক নয়; বরং স্বার্থের নাস্তিক বা রাজনৈতিক নাস্তিক শরীয়তের পরিভাষায় তাকে কী বলা হবে? নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, মুলহিদ, যিন্দিক, খাঁটি মুসলমান, মুনাফিক, গাউস, কুতুব কী বলা হবে?

**পৃ: ৩১, অনু: ২ =** "বুঝা গেল, এরা বাস্তবিক নাস্তিক নয়, এটা একটি প্রত্যক্ষ চক্রান্ত। ইসলামের আদর্শকে নিচু করা এবং মুসলিম মানসে আঘাত দেয়াই তাদের কাজ"।

**-? গ্যালারি থেকে:** যারা ইসলামের আদর্শকে নিচু করার জন্য নাস্তিকতা করে তারা বাস্তবিক নাস্তিক নয়। তাহলে তারা কী? তাদের জন্য উপযুক্ত শব্দ কী?

**পৃ: ৩১, অনু: ২ =** "মুসলিম মানসে আঘাত দিয়ে তাদেরকে মানসিক হীনম্মন্যতায় রাখাই তাদের মূল মাকসাদ। আমাদের উচিত হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের জন্য হেদায়েতের প্রার্থনা করা। আর সম্ভব হলে শালীন ভাষায় তাদের কথার উচিত জবাব দেয়া, নতুবা চুপ থাকা"।

**-? গ্যালারি থেকে:** অবাস্তবিক স্বার্থপর নাস্তিকদের ব্যাপারে এ ফাতওয়া কি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইস্তিম্বাত (?) করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧). سورة الأحزاب.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠). سورة النساء

**পৃ: ৩২ ও ৩৩, অনু: ১ =** "ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ............... সাধারণত উম্মতে মুহাম্মদীর মৌলিক দায়িত্ব চারটি: এক, যারা ইসলাম কবুল করেনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। দুই, যারা ইসলাম কবুল করে সৌভাগ্যশীল হয়েছে তাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শ শিক্ষা দেয়া এবং অন্যদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তিন, শিক্ষা মোতাবেক অনুশীলন করা এবং করানো। চার, যারা ইসলামী আমল-আখলাকের প্রতি উদাসীন তাদের সজাগ করা এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামী অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা"।

**-? গ্যালারি থেকে:** দাওয়াত, তালীম ও তাযকীর হল। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো মৌলিক হয়ে গেল কেন? না কি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জন্য এগুলো মৌলিক? দাওয়াত কে কাকে কোন বিষয়ে দেবে -এ বিষয়টি কি স্পষ্ট করা হয়েছে? ঈমানের সাতাত্তর শাখার প্রত্যেকটিই কি এ চারের মাধ্যমে আদায় করার

একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে? আর এখানে দুইয়ের মধ্যে চার রয়েছে, না কি চারের মধ্যে দুই রয়েছে? পাঠক একটু ভালোভাবে তাকালে ভালো হবে।

**পৃ: ৪৬, অনু: ২** = "যেখানে হকের দাওয়াত দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানকার লোকদেরকে সরাসরি দাওয়াত না দেয়া; বরং দোয়া করতে থাকা"।

**-? গ্যালারি থেকে:** হিতে বিপরীতটা কী? এর উদাহরণ কী? **হতে পরে:** হকের দাওয়াত দিলে 'তাব্বান লাকা ইয়া মুহাম্মদ' এর প্রবক্তার অনুসারীরা বলবে, খতীব সাহেব মিম্বর থেকে নেমে জান, রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার জন্য কি আমরা এখানে এসেছি? **হতে পারে:** উত্তপ্ত বালুর উপর না শুইয়ে উত্তপ্ত পিচঢালা রাস্তার উপর শুয়ে দেবে। **হতে পারে:** মসজিদে হারামে যেতে বাধা না দিলেও মহল্লার মসজিদে নামায পড়তে যেতে দেবে না। **হতে পারে:** নিজের স্ত্রী সন্তানের উপর সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার চাইতে হালকা কোন আঘাত এসে পড়বে বা তার আশঙ্কা দেখা দেবে। **হতে পারে:** শি'বে আবু তালেবের চাইতে ভালো কোন কামরায় বন্দি করে রাখবে। হতে পারে: পোলাও কোরমার পরিবর্তে গাছের পাতা না খেয়ে মাছ, ডাল ও ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে হবে। **হতে পারে:** ভাই-ভাই, বাপ-ছেলে, স্বমী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ তৈরি না হয়ে একটু মনমালিন্য হবে। **হতে পারে:** সংসারগুলোতে হক বাতিলের বিরোধের আগুন জ্বলে উঠবে। হতে পারে: ইলমের ফরয দায়িত্ব আদায়ের প্রচলিত ধারাগুলো বন্ধ হয়ে নতুন ধারা চালু হবে। **হতে পাতে:** হত্যা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হবে। **হতে পারে:** রাতের অন্ধকারে নিজের বসত-ভিটা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে।

এগুলোই তো হিতে বিপরীত। হিতে বিপরীত আর কী কী কর্ণধারদের মনে আছে, আর কী কী পাঠকের মনে আছে জানি না। মনে রাখতে হবে 'হিত' এবং 'হিতের বিপরীত' কুরআন হাদীস ও ফিকহের মানদণ্ডেই নির্ধারণ করতে হবে।

আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে, এসব হিতের বিপরীত **'ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা মাত্র'**। এ প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে। করতেই হবে।

আর না হয় ত্যাগ ও কুরবানীর কথা না বলে সে শ্লোগানে শরীক হয়ে যান 'শিক্ষা চাই শান্তি চাই নিরাপদে বাঁচতে চাই'। শান্তি, বিলাসিতা ও নিরাপদে বেঁচে থাকাই যখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তখন এত দামি দামি কথা বলে পরিবেশ নষ্ট করার দরকার কি?

**পৃ: ৬২, অনু: ২ =** "এই কল্যাণবার্তা যারা গ্রাহ্য করেনি, সেই কাফেরদের জন্যও তাঁর হৃদয় ছিল উর্বর। যেখানে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কথা, সেখানেও তিনি ধৈর্যের প্রাচীর হয়েছিলেন। যারা তাঁর দাঁত ভেঙে দিয়েছিল, তাঁর জন্যও তিনি সেজদায় পড়ে কাঁদেন। এতই দরদী সে নবী"।

**-? গ্যালারি থেকে:** পাল্টা দাঁত ভাঙ্গার সকল ব্যবস্থা রেখেই কেঁদেছেন, দোয়া করেছেন। দোয়া এভাবে করেছেন-

٤٠٩٠ – حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ.** (صحيح البخاري.)

– عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب في القنوت أنه كان يقول أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم **وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.** (مصنف عبد الرزاق.)

**উর্বরতা ছিল এরকম-**

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ **وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣) من سورة التوبة.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ **وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً** وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣) من سورة التوبة.

**বলাবাহুল্য, এসবই ছিল মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। অজ্ঞ মূর্খ মানুষদেরকে সত্য বোঝানোর জন্যই তরবারী, রক্তপাত, রশির বাঁধন, গোলাম বানানো, যিম্মী বানানো। কিন্তু উম্মত এবং উম্মতের কর্ণধাররা যদি এগুলোকে সন্ত্রাস নাম দেয় তাহলে আল্লাহর খলীফাদের হাতে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন সুযোগ থাকে না।**

**পৃ: ৬২, অনু: ৬ =** "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলে পারতেন, যারা তাঁর দাঁত ভেঙে দিয়েছিল তাদের মূলোৎপাটন করতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। এর দ্বারা তিনি উম্মতকে বুঝানোর প্রয়াস চালিয়েছেন, হে মুসলমান, দেখে নাও কিভাবে সমাজে থাকতে হয়? কি করে ভ্রাতৃত্ববন্ধন জুড়ে রাখতে হয়- এ পরামর্শটুকু নাও। তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, 'তোমার ভাইকে সাহায্য করবে হোক সে জালেম বা মাজলুম'।

এ পরামর্শ মেনে নিলে মানুষকে আর উশৃংখল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ এ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হে দুনিয়ার অধিবাসী, তোমরা একে অপরকে ভাই মনে করবে, আপন ভাই মনে করবে। আর ভাইয়ের সাহায্যের নিমিত্তে তোমাদের অন্তর উর্বর রাখবে। এ হাদীসটি রাসূল শুধু মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেননি। দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি তাঁর এই নির্দেশ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** রসূল তাদের মূলোৎপাটন করেছেন। সে কারণেই জাযীরাতুল আরব শিরক কুফর মুক্ত হয়েছে। বাকি, মূলোৎপাটন করতে খুব বেশি রক্ত ঝরাতে হয়নি। রক্ত যতটুকু ঝরানো হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর সেজন্যই জিহাদের বিধান। ইতিহাস পড়া না থাকলে পড়ে নিতে হবে। আর পড়া থাকলে মিথ্যা বলা ছাড়তে হবে।

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা রাসূল শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই বলেছেন। এর বাইরে যাদের ভাই বানানোর অপচেষ্টা চলছে এসব মিথ্যা কথা। এর কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। মূর্খ ভক্ত মুরিদদেরকে এসব কথা গিলানো যাবে, কিন্তু ঈমান বাঁচানো যাবে না। এত সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে, তার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে ঈমান বাঁচানো সম্ভব নয়-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩).

سورة الفتح.

**পৃ: ৬৩, অনু: ৫ =** "উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই বলতে চাইছেন- তোমরা একে অপরের আপনভাই বনে যাও। চাই মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম! অমুসলিমরাও আমার উম্মত। তাদের সাথে বৈরী আচরণের কারণে কোন ধরনের উশৃংখলতা হলে এর প্রভাব

মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে। অমুসলিম প্রতিবেশির বাড়িতে আগুন লাগলে আপনার বাড়িতেও আগুন লাগার আশংকা আছে- এটাই বাস্তবতা। তাই সম্প্রীতির জন্য মুসলিম-অমুসলিম সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকা চাই"।

**-? গ্যালারি থেকে:** অমুসলিমদের জন্য বিধান হচ্ছে, কর নিয়ে যিম্মী বানানো, জিহাদের মাধ্যমে হত্যা, অথবা গোলাম বাঁদী বানানো। কর্ণধারদের কাছে যদি এগুলোকে বৈরী আচরণ মনে হয় তাহলে মুসলমানদের কী করার আছে!

আর মুসলিম-অমুসলিমের যৌথ প্রচেষ্টায় যে সমাজ তৈরি হবে সে সমাজ তো কুরআন হাদীস থেকে নেয়া যাবে না। কারণ, অমুসলিম তো কুরআন হাদীস থেকে সমাজ গড়ার নীতি গ্রহণ করবে না। আর মুসলিম কুরআন হাদীস থেকে না নিয়ে কীভাবে সমাজ গড়বে? তাহলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মানে কী? কথাগুলো শুধু কানে কানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে অথবা 'মুতাহাররেক বেলা এরাদা' ভক্ত মুরিদদেরকে বললে পানি এতদূর গড়াতো না।

**পৃ: ৬৪, অনু: ১ =** "আমাদের দেশে সব ধর্মের লোক আছে। তারা যেন বুঝে, মুসলমানদের স্বভাববৈশিষ্ট্য কতটা মধুর। তারা নিরাপদ থাকবে যেমনটি শিশু তাদের মায়ের কোলে নিরাপদ থাকে। কোন নির্যাতন-নিপীড়ন থাকবে না। যা থাকবে এর নাম সম্প্রীতি-দরদ। মুসলমানের এই আচরণ দেখে তারা আকৃষ্ট হবে। এটি ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগের অনন্য পন্থা। মৌখিক দাওয়াতের চেয়ে সবসময় চারিত্রিক দাওয়াত বেশি কার্যকরী। সম্প্রীতি, ক্ষমা-উদারতা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানুষের মন যত সহজে জয় করা যায়, যুক্তি ও চাপ সৃষ্টি করে তার ধারেকাছেও যাওয়া সম্ভব হয় না"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ নতুন শরীয়তের জন্য অবশ্যই নতুন নবী এবং নতুন কিতাব লাগবে। কুরআনে কারীম এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের আনিত শরীয়তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কোন কাফেরকে মায়ের আদরে বড় করা যাবে না, অস্ত্রের ব্যবহারকে বাদ দেয়া যাবে না, আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে দরদ দেখানো যাবে না, তাদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা যাবে না। এতো সুস্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধ গিয়ে ঈমানকে বাঁচানো যাবে না-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢). سورة المجادلة.

**পৃ: ৬৫, অনু: ১** = "এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি পরামর্শ দিচ্ছেন, তোমরা এক ভাই আরেক ভাইয়ের সহায়ক হবে। এ তো গেল ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি রাসূলের সুকৌশলী পরামর্শ"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এটি একটি পরিষ্কার মিথ্যা কথা। কুরআন, হাদীস, সীরাত, ফিকহ বলছে এটি একটি পরিষ্কার মিথ্যা কথা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অপবাদ।

**পৃ: ৬৮, অনু: ৪** = "সংবিধানে কেউ কি বলেছিল বিসমিল্লাহকে যুক্ত করতে, না কোন আন্দোলন হয়েছিল? আপনারা বিপুলতর সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুসলমানদের দেশের ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বনিয়েছেন। আপনারাই সংবিধান রচনা করেছেন। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আদর্শকে উপজীব্য করে শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত করেছেন। তেমনি ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেহেতু আপনারাই সংবিধান রচনা করেছেন, সেহেতু ইসলামকে সংবিধানে এনে এখন আবার ধোয়া-মোছা করে ইসলামশূন্য সংবিধান করতে চাওয়া সারাবিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দেয়া নয় কি? কেন এ আঘাত? মুসলিম প্রধান দেশের সংবিধানকে ইসলামশূন্য করার জন্য হস্তক্ষেপ করাই তো এ জাতির লজ্জা ও কলঙ্ক। এটা মেনে নেয়ার মত বিষয় নয়। আমি আশা করি না, এ সরকার এমন কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে"।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ খেলার নাম হচ্ছে কানামাছি ভোঁ ভোঁ। একটি শতভাগ কুফরী সংবিধানের উপর বিসমিল্লাহ থাকলে এটি হবে ইসলাম নির্ভর সংবিধান। আর একটি শতভাগ কুফরী সংবিধানের উপর বিসমিল্লাহ না থাকলে এটি হয়ে যাবে ইসলামশূন্য সংবিধান। অর্থাৎ তোমরা আমার চোখটা বেঁধে দাও, তাহলে আমি আর তোমাদেরকে দেখতে পারব না এবং বলতে পারব, আমি দেখি না।

৯০ ভাগ মুসলমানের সংবিধান আইন আদালত শত ভাগ অনৈসলামিক তরিকা চলার দ্বারা জাতির লজ্জার সমস্যা হয় না, কলঙ্ক হয় না, আঘাত লাগে না এবং শতভাগ কুফরী আইনকে আইন হিসাবে মেনে নেয়া যায়। শুধুমাত্র এ কুফরী আইনের উপর বিসমিল্লাহ লেখা না থাকলে এটা আর মেনে নেয়া যায় না! আজব পৃথিবী! আজব দেশ!! আজব মানুষ!!! আজব মুসলমান!!!! আজব তাদের কর্ণধার এবং কর্ণধারদের কর্ণধার!!!!!

**পৃ: ৬৯, অনু: ১** = "প্রচলিত জ্বালাও পোড়াও ও উশৃংখল আন্দোলনে বিশ্বাসী নই তবে দীনের ক্ষতি হয় এমন কোন সিদ্ধান্তে নীরব থাকতে পারি না। আজ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের প্রতি ঈমানদারদের প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি। তারা আকুল

আবেদন করছেন, রাষ্ট্র ও সংবিধানে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার যেন আর ক্ষুন্ন না হয়”।

**-? গ্যালারি থেকে:** কারণ, নীরব থাকলে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

যার কাছে এবং যাদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে তারা মুসলমান? না কি অমুসলমান? যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে ইসলামের অধিকার রক্ষা করার জন্য তার কাছে আবেদন করতে হবে কেন? ইসলামের অধিকার রক্ষা না করলে এ শাসক মুসলমানই থাকবে না। কেউ আবেদন করুক বা না করুক। আর যদি তারা অমুসলমান হয়ে থাকে তাহলে একজন অমুসলিমের কাছে ইসলামের অধিকার রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন করার মানেটা কী?

**পৃঃ ৭০, অনুঃ ২ =** “শতকরা ৯২% মুসলমানের দেশে যেকোন বাহানায় সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন, **বর্তমান শাসকদলের মধ্যে এমন লোকও আছেন**। তারা জনগণের মতামত না নিয়েই সংবিধানে ‘সমাজতন্ত্র’ স্থাপন করেছেন যার মূল সংজ্ঞায় নাস্তিকতা রয়েছে। কার্লমার্কস তার ‘দ্যা ক্যাপিটাল’ বইয়ে লিখেছেন, এদেইজম ইজ দ্যা আনসেপারেবল পার্ট অব মার্কসিজম। অর্থাৎ নাস্তিকতা সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের সংবিধানে এ নাস্তিকতা ঢুকানো রয়েছে। তারা সংবিধানে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা স্থাপন করেছে। যার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে **যার চেতনার সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই**। (অক্স ডিকশনারী ও এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা দ্রষ্টব্য)

এছাড়াও সংবিধানে **বহু বিষয় এমন রয়েছে যার সাথে ইসলামী ভাবধারার মোটেও মিল নেই**। যুগে যুগে **কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার মানুষ** সুকৌশলে সংবিধান রচনা, সংশোধন ও পুনর্মূল্যায়নের কাজ **নিজেদের যিম্মায় নিয়ে** শতকরা ৯২% মানুষের বিশ্বাস ও চেতনার সাথে মারাত্মক অবিচার করেছে। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও জীবনবোধের সাথেও তারা অন্যায় আচরণ করেছেন**। তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী **জননেত্রী শেখ হাসিনার ধর্মপ্রিয় নীতি-দর্শনের সাথেও অসংলগ্ন আচরণ করেছেন**। সংবিধানের শুরু থেকে তারা ‘বিসমিল্লাহ’ তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী ভেবে আবার রেখে দিয়েছেন”।

**-? গ্যালারি থেকে:** একজন মুসলমানের জন্য ধোঁকা খাওয়া এবং ধোঁকা দেয়া দু’টিই নিষেধ। ধোঁকাখোর এবং ধোঁকাবাজ দু’জনই খারাপ। এবার কথাটা খুলে বলি-

**এক.** সংবিধানে স্থাপিত কোন অনুচ্ছেদ বাতিল করার জন্য এমনিভাবে তাতে কোন কিছু স্থাপন করার জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট লাগে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশের ভোট লাগে। এমতাবস্থায় সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দেয়ার কারণে আমাদের ধোঁকাখোর বা ধোঁকাবাজ কর্ণধারের সন্দেহ জেগেছে যে, বর্তমান শাসকবর্গের মাঝে এমন লোকও আছে যারা এর দ্বারা আনন্দিত হয়েছে। দুঃখজনক খবর হচ্ছে, এর কারণে শাসকবর্গের কেউ নারাজ হওয়ার খবর আমরা এখনো পাইনি।

**দুই.** আমাদের ধোঁকাখোর বা ধোঁকবাজ এত সচেতন যে, তিনি সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা জানেন এবং এ কথাও  জানেন যে, সমাজতন্ত্র মানেই নাস্তিকতা। কিন্তু তিনি এ কথা জানেন না যে, সংবিধানের মৌলিক চারটি উপাদানের একটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। আবার তিনি এটাও জানেন না যে, রাজা এবং রাজার সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের ভোট ছাড়া একটি বিষয় সংবিধানের মূল উপাদানের স্থান দখল করতে পারে না। কিন্ত সচেতন কর্ণধার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কিছু দুষ্ট লোক চুরি করে সমাজতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আমরা ধোঁকা খেয়ে খুব আরাম বোধ করছি!

**তিন.** আমাদের এ কর্ণধার ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাও জানেন। কিন্তু তিনি জনেন না, ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার কোন সম্পর্ক নেই বিষয়টি এরকম নয়; বরং ধর্মীয় চেতনাকে পিষে ফেলার সব ব্যবস্থা তাতে রয়েছে। আর তিনি এটাও জানেন না যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এ দেশের সংবিধানের চার খুঁটির এক খুঁটি। আবার তিনি এটাও জানেন না যে, কোন দুষ্ট লোক চাইলেই সংবিধানের একটি খুঁটি তৈরি করে ফেলতে পারে না। এর জন্য রাজার অনুমতি লাগে। সংখ্যগরিষ্ঠের ভোট লাগে।

**চার.** কর্ণধার বলছেন, সংবিধানের বহু বিষয়ের সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার মিল নেই। ভাবে মনে হচ্ছে কর্ণধার এ কথা জানেনই না যে, ইসলামকে দরজার বাইরে রেখে সংবিধান তৈরা করা হয়েছে। তাই তিনি ইসলামের সঙ্গে সংবিধানের মিল-অমিল খোঁজার বাহানা করে চলেছেন। ভক্ত মুরিদরা আবেগে এসে গেছে, কর্ণধার সংবিধানও বোঝেন!।

**পাঁচ.** সংবিধান তৈরি করে দেশের নির্বাহী শক্তি। কর্ণধারদের কর্ণধার বলছেন, যুগে যুগে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তার মানুষ সংবিধানের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। হাতে নিয়েও কুফরী শেরেকী কিছু করেনি। সামান্য অবিচার করেছে মাত্র। কর্ণধারের ধারণা, তিনি যেই প্রকৃতির চালাক (?), ঠিক সংবিধান তৈরিকারীরা সেই প্রকৃতিরই চালাক (?), আবার দেশের ওলামা তালাবারাও ঠিক সেই প্রকৃতিরই চালাক (?)।

**ছয়.** কর্ণধার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে বসে বসে আয়েশ আর বিলাসিতায় মত্ত ছিলেন, এর মধ্যে কিছু দুষ্ট লোক সংবিধানের মধ্যে ইসলাম বিরোধী নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মদেমত্ত অবস্থায় জালিমরা তার স্বাক্ষরটাও নিয়ে নিয়েছে। এতে করে ইসলামের বিরুদ্ধে যা করা হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয় না হলেও বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও জীবনবোধের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, সেটাই এখানে বড় পেরেশানীর বিষয়। বলতে চাচ্ছেন, বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতা এসব কিছুই চাইতেন না। এসবই কিছু বিচ্ছিন্ন দুষ্ট লোকের কাজ।

**সাত.** একই অবস্থা মানসকন্যার ক্ষেত্রেও। দুষ্ট লোকেরা ইসলামের যাই করেছে করেছে, কিন্তু জঘন্য অপরাধ করেছে তারা শেখ হাসীনার ধর্মীয় আবেগের উপর আঘাত করে। দুষ্ট লোকেরা সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মত জঘন্য রকমের ধর্মবিরোধী মূলনীতি স্থাপন করার কারণে প্রধানমন্ত্রী ঠিকমত ইসলামের উপর চলতে পারছেন না। তার ধর্মীয় অনুভূতি খুব আহত অবস্থায় আছে (?)।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কর্ণধারের এ কথাগুলো বিশ্বাস করার মত লোকের অভাব নেই! তাছাড়া শ্রোতার কোয়ালিটি দেখেও অনেক সময় বক্তার বলার হিম্মত বেড়ে যায়।

**পৃঃ ৭৩, অনুঃ ২ =** “সংবিধান প্রণয়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞ লোকেরা দুনিয়ার এত বিপরীত বিষয় কেন, কী উদ্দেশ্যে ৯২% মুসলমানদের অধিবাস বাংলাদেশের সংবিধানে ঢুকালেন, আবার খুঁজে খুঁজে একটু একটু করে ধাপে ধাপে ইসলাম, ঈমান, আল্লাহর নাম ও মুসলমানী চিহ্নগুলো ৯২% ভাগ মুসলমানের সংবিধান থেকে বের করে তারা ফেলে দিচ্ছেন, এ বিষয়টি বোঝা খুবই দুষ্কর। তাদের মনের গোপনঅভিসন্ধি আল্লাহই ভালো জানেন। এ দেশের আলেম উলামা পীর মাশায়েখ ও সর্বস্তরের ঈমানদার মুসলমানরা বড়ই শঙ্কা ও হতাশায় ভুগছেন। তারা বঙ্গবন্ধু কন্যার দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্তর থেকে দুআ করছেন, যেন তাঁর শাসনামলে মুসলমানদের স্বাধীন দেশের সংবিধান থেকে ইসলামের নামটুকুও মুছে না যায়। মুসলমানদের বিপুল অস্তিত্বের সাংবিধানিক শেষ চিহ্নটুকুও যেন নিঃশেষ বিলোপ না পায়। যেন এ দেশটি সাংবিধানিকভাবে ইসলামশূন্য না হয়ে যায়। যেন বিপুলতার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় অধিকার আরও আচ্ছারকম খর্ব ও ক্ষুন্ন না হতে পারে। রাষ্ট্রে, সরকার, প্রশাসন ও বিচারবিভাগে সুমতিশীল সুবিবেচক যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি ১৫ কোটি অসহায় মুসলমানের এই আকুতি

যেন সময়মতো পৌঁছে যায়। ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসা প্রতিটি মানুষের আল্লাহ সহায় হোন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** দুষ্ট লোকেরা ইসলামবিবর্জিত সংবিধান কেন তৈরি করেছে তা তারা রেডিও, টিভি, পত্রিকা, সামাজিক গণমাধ্যম, বক্তৃতা, বিবৃতি, সাক্ষাৎকারে বলেই চলেছে, প্রচার করেই চলেছে -এরপরও এটা নাকি তাদের 'মনের গোপন অভিসন্ধি'! পঞ্চাশ-ষাট বছর বৈধ বাবার সঙ্গে জীবন কাটানোর পর যদি কেউ বলে, বাপের নাম কি তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাহলে তার অবস্থা কী? অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর যদি উত্তর হয়, আল্লাহই ভালো জানেন তাহলে বিষয়টি কেমন হবে?

কর্ণধার কেন বোঝার চেষ্টা করছেন না, যে বঙ্গবন্ধু কন্যার ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিকে তোয়াক্কা না করে যে দুষ্ট লোকেরা সংবিধানে ইসলামবিরোধী নীতি স্থাপন করেছে, সে দুষ্ট লোকদের মোকাবেলায় সে বঙ্গবন্ধু কন্যা কী করবেন? তাঁর কিছুই করার নেই। বিশ্ববন্ধু কন্যার দ্বারাও তো কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু উপযুক্ত বক্তব্য দিয়ে বেতনটা পাওয়া যাবে। আর বই বিক্রয় করে মূল্যটা পাওয়া যাবে। এছাড়া আর কিছুই হওয়ার নেই।

না কি কর্ণধার তাঁর আগে বলে আসা কথাটি এখানে এসে ভুলে গেছেন! হতেও পারে। ব্ল্যাকহর্স খেলে বা স্পিড খেলে সবই সম্ভব। নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়ে গাধা-খচ্চরের খোলসে ঢুকে পড়াও সম্ভব।

আমার আরেকটা আশঙ্কা। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যাকে ইসলামী আবেগের মেকাপ করতে গিয়ে তাদের অসহায়, অচেতন ও অপ্রকৃতিস্থ চেহারা ফুটে উঠছে কি না -এ বিষয়টির প্রতি মেকাপম্যানের সতর্ক দৃষ্টি রাখার দরকার ছিল। নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, সর্বস্তরের ঈমানদার এবং পনের কোটি মুসলমানকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের নেত্রীর পায়ের কাছে এভাবে ঠেলে দেয়ার বিচার একদিন হবে ইনশাআল্লাহ। ঈমান না থাকলেও কমপক্ষে পোষাকের কারণে হলেও সামান্য লজ্জা করা জরুরী ছিল। এতটুকু লজ্জা না থাকলে মানুষ মানুষের কাতারে দাঁড়ায় কীভাবে?

এ কর্ণধার আগের পৃষ্ঠার কথা পরের পৃষ্ঠায় এসে ভুলে যায়। না হয় কুফরী মূলনীতির উপর নির্ভরশীল একটি সংবিধানকে এতবার মুসলমানদের সংবিধান বলে বলে মুখে ফেনা তুলতো না। নিজের স্বীকার করা কথার বিপরীত কথা এক দুই পৃষ্ঠা পরেই বলত না। কমপক্ষে পাঠক আগের কথাটি ভুলে যাওয়ার অপেক্ষা করত। কিন্তু তা হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩)

**পৃঃ ৯১, অনুঃ ২-৩ =** "সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বহাল রেখে প্রকৃত কল্যাণকামী ও পরীক্ষিত মুরব্বীদের সাথে পরামর্শ করে চলতে হবে।

সাময়িক ভুল বা বাড়াবাড়ির ফলে নিজেদের মূল সাধনা, দাওয়াত, তালীম, তারবিয়্যাত ও ইসলাহে মুআশারাতের কাজ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা চাই। উলামায়ে কেরাম ও তাদের বহুমুখী দীনি কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকলেই ইসলাম ও মুসলমানের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে। আল্লাহ ও রাসূল নির্দেশিত পন্থায় দীনের কাজ অব্যাহত রাখাই আমাদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের ভয় ও বিপদমুক্ত পরিবেশে কোরআন ও সুন্নাহর খেদমত অব্যাহত রাখার তাওফিক দান করুন"।

**-? গ্যালারি থেকে:** সমাজতো শতভাগ নষ্ট। আর সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির দেশ হিসাবে সব ধর্মের লোকও আছে। এখানে কর্ণধাররা আল্লাহর বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে? তাহলে তারা তাদের ঈমানকে কী করবে? কোথায় জমা রেখে যাবে?

মূল সাধনাগুলো এমন কোন বিশেষ গুণে মূল সাধনার মকাম পেল। আর ঈমানের সাতাত্তর শাখা মূল সাধনা থেকে বের হয়ে গেল কেন?

**পৃঃ ৯৮, অনুঃ ২ =** "ফ্রান্সের পত্রিকায় আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্মান করা হলো, প্রতিবাদে সারা পৃথিবীই জেগে উঠল; কিন্তু আমরা এখনো ঘুমে। মনে হয়, নবীর রেখে যাওয়া ইসলাম এ দেশে এতিম হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে এখন যেন কেউ নেই এ দেশে। মুসলিম সরকার হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা। ওই দেশের সরকারের ওপর এমন কাজ বন্ধে উদ্যোগী হতে চাপ প্রয়োগ করা"।

**-? গ্যালারি থেকে:** ফ্রান্সের দূতকে তলব করলে বোঝা যাবে আমরা সজাগ আছি। ফ্রান্সের সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করলে বোঝা যাবে নবীর রেখে যাওয়া ইসলাম এতিম হয়নি। এইতো?

প্রথম কথা হচ্ছে, চাপ উপর থেকে নিচের দিকে হবে? না কি নিচ থেকে উপরের দিকে হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ মুহূর্তে করণীয় কী তা নবীর কিতাবে না দেখে, কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান গ্রহণ না করে কর্ণধাররা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাধানের দিকে এগুলে নবীর রেখে যাওয়া ইসলাম এতিম হয়ে গেছে মনে হবে না?

**পৃঃ ৯৯, অনুঃ ১** = "দেশের অস্থিরতা নিরসনে খতমে বুখারীঃ দেশ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে? আমি জানি না, হয়তো কেউ জানে না। সারাদেশের মানুষ আজ উৎকণ্ঠিত, ভীত-সন্ত্রস্ত। ক্ষমতার মসনদ নিয়ে রাঘব বোয়ালদের হীন স্বার্থের বলি হচ্ছে সাধারণ নিরীহ জনগণ। আমি এসবের লোক না। রাজনীতি নিয়ে কখনোই আমি কিছু বলি না। বলাটাও আমার অনুচিত বলে মনে হয়। কারণ, খামোখা কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে লাভটা কী? কোন লাভ নেই। একটা দেশ থেকে যখন ন্যায়নীতি, সুবিচার পাওয়ার সম্ভাব্যতা কমে যেতে থাকে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। নীতিবান লোকেরাও নীতিহীন কাজে মেতে ওঠে। অনিয়মের রাজ্যে মানুষ তখন অনিয়মকেই নিয়ম বানিয়ে ফেলে।

দেশের চরম অস্থিরতা নিরসনে অনেক পদক্ষেপই তো নেয়া হলো। এবার ইসলামী নীতি মেনে নেয়া হোক। মাদরাসা, মসজিদ থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সব জায়গায় খতমে বুখারীর ব্যবস্থা চালু করা হোক"।

**-? গ্যালারি থেকে:** অলাভজনক সেই কথার ফোয়ারাতেই আমরা শেষ পর্যন্ত ভাসছি। নচেৎ শতভাগ অনৈসলামি আইনে পরিচালিত একটি দেশের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে বুখারী খতমের মত একটি নবআবিষ্কৃত সুন্নতবিবর্জিত আমল করার জন্য কেন পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। بليد أحمق ও شيطان أخرس ভক্ত মুরিদ পাওয়াও আসলে একটা ভাগ্যের ব্যাপার! না হয় এখনো এমন কথা বলা যাচ্ছে, আবার তা ছাপাও যাচ্ছে, পড়ে পড়ে সুবহানাল্লাহ বলার মত লোকও পাওয়া যাচ্ছে!

রাষ্ট্রের অস্থিরতা দূরের জন্য ওষুধ দেয়া হয়েছে ইসলামী নীতি। আর ইসলামী নীতি হচ্ছে, পার্লামেন্ট পর্যন্ত সব জায়গা বুখারী খতম করা। এ সব জায়গার তালিকায় আর কী কী আছে?

একটা তো হলো পার্লামেন্ট। যেখানে চারটি কুফরী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হাজার হাজার আইন তৈরি হয়। একটা আছে বঙ্গভবন। যেখানকার অধিপতি এ কুফরী আইনগুলোর উপর স্বাক্ষর করে অনুমোদন দেন। একটি আছে গণভবন। যেখানকার অধিপতি সকল কুফরী আইনের সকল পর্ব সুসম্পন্ন করে শেষ অনুমোদনটি করেন। একটি আছে দেশের বিচারালয়গুলো। যেখানে এ কুফরী আইনগুলোর প্রয়োগ হয়। একটি আছে পুলিশ হেড কোয়ার্টার। যেখান থেকে এ কুফরী আইনগুলোকে প্রহরা দেয়া হয় এবং এর বিপরীত কেউ করতে গেলে তার দফারফা করে দেয়া হয়। একটি আছে সেনানিবাস। যেখানে কুফরী সংবিধান রক্ষা করার জন্য অস্ত্রসজ্জিত করে লক্ষ লক্ষ জোয়ানদেরকে প্রস্তুত রাখা হয়। এভাবে এ কুফরী আইনের মাধ্যমে লাইসেন্স পাওয়া শত হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে প্রতিদিন হাজার

কোটিবার আল্লাহর সঙ্গে দুশমনির অনুশীলন করা হয় -দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেই কি খতমে বুখারী হওয়া দরকার?

নবীর ইসলামকে এতিম বানানোর জন্য এর চাইতে সুন্দর কৌশল আর হতে পারে না। প্রিয় পাঠক! একটু ইনসাফ করুন! একটু বিচার করুন!

**পৃঃ ১০৩, অনুঃ ২ =** "ইসলামের বিধান হলো, গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই করার সময় চাকু ধার দিতে হবে প্রাণীর চোখের আড়ালে। যাতে প্রাণী তা দেখে এবং তার আওয়াজ শুনে অন্তরে কষ্ট না পায়। ইসলাম যেখানে জানোয়ারকে কষ্ট দিয়ে জবাই করা হারাম করেছে সেখানে একজন নিরপরাধ মানুষকে কখনো কষ্ট দেওয়ার অনুমতি থাকতে পারে? যারা ইসলামকে কলুষিত করার জন্য জিহাদের অপব্যাখ্যা করে, তারা নিজেরাও গোমরাহ, অন্যকেও গোমরাহির পথে নিয়ে যেতে চায়"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** জিহাদ একটি সচিত্র বিষয়। কেন যে এর ব্যাখ্যা করতে হয়, আবার অপব্যাখ্যার দোষে দুষ্ট হতে হয় বুঝেই আসে না। তাই জিহাদের ব্যাখ্যা মাঠ এবং ময়দান থেকে বুঝে নিলেই ভলো হয়। বইয়ের পাতা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আর যে পৃথিবীতে কুফর কোন অপরাধ নয়, সে পৃথিবীতে জিহাদ শব্দের উচ্চারণই অন্যায়। দুর্ভাগ্যবশত এসব কথা শোনা যেত কুফরের দরবার থেকে। এখন শোনা যায় ঈমান ও সুন্নতের দরবার থেকে।

**পৃঃ ১০৯, অনুঃ ২ =** "আমি বলি, অশান্তি দূর করার জন্য আশু ব্যবস্থা হলো দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি করা, ইবাদত করা, নামাজ পড়া এবং এস্তেগফার পড়া। এগুলোই আমার বাস্তবভিত্তিক, বিশ্বাসভিত্তিক ব্যবস্থা। স্থায়ী ব্যবস্থা হলো জিহাদের যে গলদ অর্থ করা হচ্ছে সেটা মেধার বিকারগ্রস্ততা। মেধা ঠিক করতে হবে সঠিক শিক্ষার ভিত্তিতে। সুতরাং সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলেই কেবল স্থায়ীভাবে সন্ত্রাস দূর হবে"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** সন্তান লাভের জন্য সেজদায় পড়ে কান্নাকাটি কি বিয়ে করার আগে করতে হবে? না কি পরে করতে হবে? জিহাদের বিকারগ্রস্ত গলদ অর্থ হচ্ছে, যে জিহাদে আল্লাহর দুশমনদের গিরায় গিরায় মারার কথা আছে, ঘাড়ে মারার কথা আছে, রশি দিয়ে বাঁধার কথা আছে, কর আদায় করার কথা আছে, রক্তারক্তির কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে, মরার কথা আছে, কঠোরতা করার কথা আছে (?)। আর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে জিহাদে এসব কিছু নেই (?)। এটাইতো বলতে চান? না কি আরো কোন কথা আছে?

**পৃঃ ১১০, অনুঃ ১** = "আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, সবচেয়ে বড় ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর যুগেও অন্যায় কাজ হয়েছে। মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর সঙ্গে কানেকশন করে বলেছেন, হে আল্লাহ! কাফেররা সন্ত্রাস করছে, মদিনায় হামলা করতে আসছে, মক্কায় হামলা করছে। সুতরাং এ সন্ত্রাস ও অস্থিরতাকে দূর করার জন্য বাস্তবভিত্তিক কিছু কাজ দেন, যে কর্মসূচি গ্রহণ করলে মানুষের মাঝে শান্তি আসবে। তখন আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমরা আমার একাত্মবাদকে মেনে নাও। নামাজ পড়তে শুরু কর, জাকাত আদায় কর, রোজা রাখ, হজ্জ কর, তাহলে অস্থিরতা দূর হবে"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** এ ভাষা হচ্ছে মুলহিদ ও যিন্দীকদের ভাষা। এর জন্য কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয় না। মক্কা মদীনায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের হামলার মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের কর্মসূচি দিয়েছেন! আর জিহাদের শত শত আয়াত নাযিল হয়েছে তা পড়ে পড়ে তাবিজে ফুঁক দেয়ার জন্য?! দাজ্জাল কোথাকার!!

**পৃঃ ১১২, অনুঃ ১** = "অর্থাৎ ফেতনার কারণে ঈমান-আমল বিনষ্টের আশঙ্কা হলে মৃত্যুকামনার বৈধতা আছে। পবিত্র কোরআনেও ফেরাউনের ফেতনা থেকে ঈমানের সাথে মুক্তি পাওয়ার জন্য জাদুকরদের দোয়া উল্লেখ হয়েছে যে, 'হে পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে ধৈর্য ধরার তাওফিক দাও আর মুসলমানিত্বের সাথে টিকে থাকার শক্তি দাও।' (সূরা আরাফ১২৬)

এ দোয়াও অনেকটা মৃত্যুকামনার নামান্তর। কারণ, এ দোয়ার বিপরীত অর্থ এটাই বুঝে আসে যে, হে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিম হয়ে বাঁচিয়ে রাখো, নয়ত মৃত্যু দিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাও"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** না এটা মৃত্যু কামনা নয়। এটা হচ্ছে সত্যের উপর অটল থাকার প্রার্থনা।

**পৃঃ ১২৬, অনুঃ ৩** = "অনেকে বলে থাকেন, 'দেশ বিধর্মীর হাতে যাই যাই করছে আর হুজুর সুন্নত নিয়ে বসে আছেন।' তাদের উদ্দেশ্যে বলি, 'আরে ভাই! দেশ তো হযরত ওমর রাযি. এর যুগেই যাই যাই করছিল। মেসওয়াক করেই না তারা দেশ বাঁচিয়েছিল। ওমর রাযি. এর খেলাফতকালে মুসলমানরা নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে প্রাণপণ যুদ্ধ চালালেও যখন শত্রুদের দমন করতে পারছিল না, তখন মুসলমানরা ভাবলেন তাদের আরো অস্ত্র ও সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন। তাই তাঁরা খলীফার কাছে খবর পাঠালেন, 'আমরা শত্রুদের সাথে পেরে উঠছি না। কিছু অস্ত্র, সৈন্য ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি পাঠানো হোক।' কিন্তু ওমর রাযি. মুসলিমবাহিনীকে বলেছিলেন,

'অস্ত্র লাগবে না! তোমাদের কার্যপন্থায় মনে হয় কোনো ভুল হচ্ছে! বোধ হয়, তোমাদের দ্বারা কোনো গোনাহ হচ্ছে। খতিয়ে দেখো, তোমরা কোনো গোনাহ করছ কিনা, না হয় বিজয় আসছে না কেন?'

মুসলমানরা চিন্তা করে দেখলেন, কোনো গোনাহ হয়নি তবে মদিনার তুলনায় যুদ্ধের ময়দানে মেসওয়াক কমে গেছে। সে মতে তাঁরা আগের মতো মেসওয়াক শুরু করলেন। কাফেররা তা দেখে নিজেদের মাঝে বলাবলি শুরু করল। একজন বলল, 'তারা ডাল কেটে এমন করছে কেন? এটা নুতন কোন পরিকল্পনা নয় তো?' এরই মধ্যে তার কথায় সুর দিয়ে আরেকজন বলে উঠল, 'শুনলাম, তাদের অস্ত্রও নেই; খাদ্যও নেই। ঘষে-মেজে দাঁত ধারালো করে নিচ্ছে। আমাদের একেকজনকে ধরবে আর কামড়ে নিবে।'

এ কথা ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝে। তারা ভাবল, সত্যিই এমনটি হবে। তাই ভয়েই তারা পালিয়ে গেল। এ ঘটনাতে কাফেরদের ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। তবুও ভয়ে পালিয়ে গেল আর মুসলমানরা পেল সহজ একটি জয়। এর কারণ হলো আল্লাহ তায়ালা দেখেছেন, তাঁর বান্দারা একটি সুন্নত জিন্দা করেছে মেসওয়াকের মাধ্যমে। তাই তিনি কাফেরদের সামান্য বিষয়েও ভীতিসঞ্চার করে মুসলমানদের জয়ী করলেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'তোমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী (অস্ত্র) প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে' (সূরা আনফাল : ৬০)

প্রশ্ন হলো, কাফেররা ভয় পেলেই তো আর বিজীত হচ্ছে না? তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন- (ভাবার্থ) 'বিজয় শুধু আমার কাছে পাবে।' (সূরা আনফাল : ১০) এ আয়াতেও আল্লাহ বলছেন, 'বিজয় আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। অস্ত্র বিজয়ের জন্য নয়; অস্ত্র তো শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য। তাই অস্ত্র দিয়ে তাদের ভয় দেখাও, আর বিজয় আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও।' কীভাবে বিজয় চাইবে? যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয় চেয়ে নিয়ে ছিলেন। আর সেটাই হলো সুন্নত তরিকা।

উক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যদি মেসওয়াক ও সুন্নতের মাধ্যমে দেশ বাঁচাতে পারেন, তাহলে আমরা আরো বেশি পারব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন একটি যুগ আসবে, তখন যদি কেউ দশ ভাগের এক ভাগ আমল করে, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের সমান সওয়াব ও পুরস্কার পাবে।'

সবকথার এক কথা, সুন্নতের বাইরে ইসলাম নেই"।

**-? গ্যালারি থেকে:** ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে  মনে রাখতে হবে, মুসলমানরা তখন খানকাহের কোনে বসে মিসওয়াক করেনি, যুদ্ধের ময়দানে মিসওয়াক করেছে। ফরযগুলো পুরা করে একটি সুন্নতের ত্রুটি ছিল। আর আমরা ফলাফল বের করছি, সকল ফরয ছেড়ে, এমনকি প্রয়োজনে ঈমান ছেড়েও তা সুন্নতের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। যাইহোক ঘটনাটির নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি দরকার।

আর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের সুন্নত তরিকা হচ্ছে, যুদ্ধের আগে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া, যতটুকু শক্তি আছে তা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া এরপর যুদ্ধে জেতার জন্য একদিকে সর্বশক্তি ব্যয় করা, অপর দিকে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করা।

**পৃ: ১২৮, অনু: ২** = "এজন্য আমাদের প্রয়োজন একতাবদ্ধ হয়ে সমষ্টিগতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব জায়গায় সুন্নত প্রতিফলন করা"।

**-? গ্যালারি থেকে:** রাষ্ট্রের সব জায়গায়তো ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন কি সব ধর্মের লোকদের নিয়ে সবার মাঝেই সুন্নতের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হবে? সুন্নত তরিকা বলতে কি এটাকেই বোঝানো হয়েছে?

**পৃ: ২২৮, অনু: ১** = "আমরা যদি মাদরাসা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারি এবং এর গুরুত্ব বোঝাতে পারি, তবে সমাজে যারা কুফরির নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা একদিন ইসলামের প্রাণ হয়ে যাবে। আমাদের"।

**-? গ্যালারি থেকে:** কীভাবে বুঝলেন? কুফরীর যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা তো মাদরাসার কিতাব পত্র আপনার চাইতে বেশি পড়েছে। এবং সীরাত সম্পর্কে আপনার চাইতে বেশি জানে। কুরআনতো বলছে ভিন্ন কথা-

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ **فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ** إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣)

এরপরও ঈমান টিকে যায় কীভাবে?!

**পৃ: ০০০ কভার পেইজ ও সূচিপত্র = নাম** 'ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা'। **সূচিপত্র** যথাক্রমে : সুন্নতি জীবন ও কালেমার তাৎপর্য, সাহাবিদের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, দেশের অস্থিরতা নিরসনে খতমে বুখারি, আল্লাহর ভয় মানুষকে গোনাহ থেকে দূরে রাখে, আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্তি, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের সহজ পদ্ধতি, সুন্নতের পরিচয়, আল্লাহর সুন্নত, রাসূলের সুন্নত, সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত, মালদ্বীপে ইসলাম প্রচার হয়েছিল যেভাবে,

মেয়ে সন্তান : মা-বাবার জান্নাত, মুসলমানের পরিচয়, মুসলমানের মৌলিক পাঁচটি গুণ, মৃত্যুর স্মরণে দুনিয়ার মায়া কাটাবে, মৃত্যু একটি অবধারিত সত্য, আল্লাহর ক্ষমা যেভাবে পাওয়া যায়, আমরা কিভাবে মোবাইল ব্যবহার করব?, মোবাইলের রিংটোন কেমন হবে, রিংটোনের ইসলামীকরণ ও তার সমস্যা, মসজিদে মোবাইল ব্যবহার, মসজিদ সংশ্লিষ্টদের করণীয়, মাদরাসায় মোবাইলের ব্যবহার, খানকায় মোবাইলের ব্যবহার, নামাযের সময় কল করা, কল রিসিভ করে কি বলব, মোবাইলে ফটো তোলা, আজানের ইতিহাস, আজানের জবাবের গুরুত্ব, আজানের সঠিক জবাব দিতে হবে, আজান-ইকামতের সঠিক জবাব, শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদে ইমামতির যোগ্যতা, মসজিদের প্রতি সম্মান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, মসজিদে ঢুকতে পারা আল্লাহর অনুগ্রহ, মসজিদে অবস্থান করার ফজিলত, চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান, আপনার সংসার আপনার আখেরাত, কলবের উপর নিয়ন্ত্রণ, মানবাত্মার ধরন, বিপদ মুসিবত আমাদের কর্মেরই ফল, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ববোধ, দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি দুটি, রমযানে কী করবো, কী করবো না, করণীয় কাজ, বর্জনীয় কাজ, রোজার বর্জনীয় বিষয়সমূহ, বিভিন্ন নবীর যুগের রোজা, হযরত আদমের যুগে রোজা, হযরত নূহের যুগে রোজা, হযরত মূসার যুগে রোজা, মোনাজাত কবুল হওয়ার আলামত, আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে দুনিয়াতে আমল, ইখলাস ও সুন্নত মোতাবেক আমলই নেক আমল, জান্নাতিদের পাঁচটি আলামত, জান্নাত লাভের আমল, যে তিনটি আমলে নবীর সঙ্গে জান্নাত, যাকাত প্রদানের সর্বোত্তম খাত, শবে বরাত : না বাড়াবাড়ি, না ছাড়াছাড়ি, বরকতময় শবে বরাত, কোরআন পাঠের ফজিলত, দরূদ পাঠের ফজিলত, হজ্জ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান, শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার মূল কারণ, আহলে বাইত বা নবী পরিবারের মর্যাদা, আশরাফুল মাখলুকাত, দুনিয়ার সর্বপ্রথম মাদরাসা গারে হেরা, কর্জ বা ঋণ হক্কুল ইবাদ।

**-? গ্যালারি থেকে:** আমরা সাধারণ পাঠকরা বুঝতে পারিনি যে, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে এ শিরনামগুলো এবং এসব শিরনামে যা আলোচনা করা হয়েছে তার কী সম্পর্ক?

'ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা' থেকে উদ্ধৃতির উল্লেখ এখানে শেষ করা হল। পাঠক চাইলে মূল বই থেকে বিষয়গুলো আরো বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন। এতে সংশয় দূর হবে। সত্যের আরো কাছাকাছি পৌঁছতে সহজ হবে।

**আর্তনাদ**

এ বইয়ের হাজার হাজার কপি ছেপেছে। হাজার হাজার মানুষের কাছে বিলি হয়েছে। এতে কোন মুনকার বিষয় কারো চোখে পড়েনি। এমন কোন বিষয় চোখে পড়েনি যে বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করা যায়। সতর্ক করা দরকার।

**সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ**

'ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা' থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে হুবহু এ উদ্ধৃতিগুলোই 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ' বইয়ে রয়েছে। সে কারণে একই রকমের উদ্ধৃতি দুই বই থেকে উল্লেখ করে পাঠকবর্গকে বিরক্ত করতে চাই না। এমনিতেই আমার উপর পাঠকের বিরক্তির কারণের কোন অভাব নেই। তাই আর বাড়াতে চাই না।

তবে দু'টি উদ্ধৃতি উল্লেখ না করলেই নয়। তাই করছি। এক. অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা। দুই. দেবালয় রক্ষার ফরয জিহাদের দায়িত্ব।

**অস্ত্রবিহীন জিহাদ**

এ বইয়ে জিহাদের সংজ্ঞা করা হয়েছে:

"জিহাদ হলো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের যাবতীয় অনুমদিত পন্থা এর মধ্যে শামিল। ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রিয় পরিমণ্ডলের যাবতীয় কল্যাণ প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কল্যাণকর যাবতীয় প্রয়াসের নাম জিহাদ"।

**-? গ্যালারি থেকে:** জিহাদের এ সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, ঈমানের সাতাত্তর ভাগ না করে বলে দিলেই হতো, এগুলো হচ্ছে মূলত জিহাদের সাতাত্তর শাখা। হাজার দেড় হাজার বছর যাবত সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ রচয়িতাগণ শুধু শুধুই তাঁদের কিতাবগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে শুধু মাত্র একটি মাত্র অধ্যায়কে জিহাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। তাও আবার সে অধ্যায়কে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, অস্ত্র, লাঠি, বল্লম, তলোয়ার, কামান, রক্ত, রশি, গোলাম, বাঁদি, যিম্মী, আগুন, বাঁদির সঙ্গে যৌনমিলন ইত্যাদি দিয়ে ভরে দিয়েছেন।

তাঁরা বলে দিলেই পারতেন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ওযু, গোসল, ইস্তেনজা থেকে শুরু করে নিকাহ, তালাক, মুযারাবা, মুরাবাহা, মুযারাআ পর্যন্ত সবই জিহাদ।

দাজ্জালের হাড্ডি কোথাকার!

**দেবালয় রক্ষা করা ফরয জিহাদ**

আর দেবালয় রক্ষার ব্যাপারে বলেছে-

“আল্লাহ বলেছেন, যদি তস্করদের প্রতিহত না করা হয় তাহলে গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরগুলিকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে। এই অপশক্তি মসজিদগুলোকেও ধ্বংস করে দিবে। অর্থাৎ কেবল মসজিদ রক্ষার জন্যই নয়, আল্লাহ পাক বলেছেন, গির্জা, প্যাগোডা এবং মন্দির তথা যেকোন উপাসনালয় রক্ষা করাটাও জিহাদ। এটা জিহাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য”।

এ সম্পর্কিত আয়াত-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

-এর অনুবাদ করেছে এভাবে-

“আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদলের দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয় গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয়, মন্দির অগ্নি উপাসকদের এবং মসজিদসমূহ যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী”।

**-? গ্যালারি থেকে:** এ হচ্ছে, ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ’ বইয়ে কৃত আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর।

অথচ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে এ আয়াতের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

“বিগত যামানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যামানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন অগ্নিপূজারী মাজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না”। -তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন ৬/২৮৬

## আর্তনাদ

বইটি নিজে পড়ে নিলে পাঠকবর্গ বুঝতে পারবেন, শরীয়তকে বিকৃত করতে চাইলে কী কী অনুশীলন কোন কোনভাবে করতে হয়? হাতে কলমে সবক ইয়াদ হয়ে যাবে।

এ বইয়ের হাজার হাজার কপি ছেপেছে। হাজার মানুষের কাছে বিলি হয়েছে। এতে কোন মুনকার বিষয় কারো চোখে পড়েনি। এমন কোন বিষয়

চোখে পড়েনি যে বিষয়ে তালিবুল ইলমদেরকে সতর্ক করা যায়। সতর্ক করা দরকার।

**ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া**

**পৃঃ ৫/৩০৭, অনুঃ ১ =** "প্রশ্নঃ জিহাদ ফরজে আইন হয় কখন? উত্তরঃ যখন কাফেররা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করে বসে এবং মুসলিম শাসক সকলকে জিহাদে বের হতে নির্দেশ দেন তখন ঐ দেশের সকল সক্ষম মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** যদি মুসলিম শাসক না থাকে, বা মুসলিম শাসক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়, বা মুসলিম শাসক তার ব্যক্তিগত স্বার্থে এ ফরয দায়িত্ব আদায় করতে না দেয় তখন এ ফরয আদায়ের পদ্ধতি কী? উদ্ধৃতি দরকার। এছাড়াও ফরজে আইন হওয়ার আর কোনো অবস্থা কি ফিকহের কিতাবাদিতে উল্লেখ হয়নি?

**পৃঃ ৫/৩০৭, অনুঃ ২ =** "প্রশ্নঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশে মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কি ফরজ? ফরজ না হলে তার কারণ কী? উত্তরঃ না, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ নয়। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা- এক. বাংলাদেশ দারুল হারব নয়। কেননা দারুল হারব হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা- ক. শুধু মুশরিকদের আইন চালু হওয়া। খ. দারুল হারবের পাশে হওয়া। গ. কোনো মুসলিম বা জিম্মি নিরাপদ না থাকা। আমাদের বাংলাদেশে এই তিনটির কোনটিই পাওয়া যাচ্ছে না।

দুই. বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেননি।

তিন. বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক না থাকার কারণে বা তার পক্ষ হতে জিহাদের সাধারণ ঘোষণা না আসার কারণে।

চার. বাংলাদেশে প্রত্যেকেরই স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। কাউকে তার ধর্ম পালনে বাধা দেয়া হয় না। এসব কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ নয়"।

**-? গ্যালারি থেকেঃ** কেন? দারুল হারবের সংজ্ঞা কী? এ দেশে কাদের আইন চালু আছে? পাশের দেশটি কাদের? মুসলিম ও যিম্মীর কোন পরিচয় কি এ দেশে আছে? দ্বিতীয়তঃ এটি কি দারুল হারব প্রমাণিত হওয়ার শর্ত নাকি দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার শর্ত? দু'টির পার্থক্য বুঝার মত অবস্থা কি আছে?

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. এ ভারত বর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা করার পর কবে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে?

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার দায়িত্ব কি ওলামায়ে কেরামের? একটু পরেই বলা হচ্ছে, এ দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের। আর যে ওলামা আহবারে ইয়াহুদ ও রুহবানে নাসারার দায়িত্ব পালন করবে তাদের ঘোষণার অপেক্ষায় থাকার মানেটা কী?

বাংলাদেশে যদি মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক না থেকে থাকে তাহলে যে রাষ্ট্রনায়ক আছে সে রাষ্ট্রনায়ক অমুসলিম। অমুসলিম রাষ্ট্রনায়কের অধীনে মুসলমানদের বসবাস করার শরয়ী বিধান কী? আর যে দেশের রাষ্ট্রনায়ক মুসলিম নয় সে দেশটি দারুল হারব নয় কেন? অথবা দারুল ইসলামের রাষ্ট্রনায়ক অমুসলিম হওয়ার পদ্ধতি কী?

বাংলাদেশের মুসলমানরা কি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মত দু'টি কুফরীর বিরুদ্ধে কথা বলা ও কাজ করার অধিকার রাখে? যদি না পারে তাহলে মুসলমানরা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাচ্ছে এর অর্থ কী? না কি কুফরের বিরুদ্ধে বলা ধর্ম পালনের কোন অংশ নয়।

সরকার অনুমোদিত প্রতিদিনের হাজার হাজার প্রকাশ্য হারামের প্রতিরোধ করার অধিকার কি বাংলাদেশের মুসলমানরা পাচ্ছে? যদি না পেয়ে থেকে তাহলে মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পাচ্ছে এর মানে কী? না কি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ধর্ম পালনের অংশ নয়? না কি এটা সরকারের কাজ? কিতাব খুলে দেখুন। বাপ-দাদার কাছ থেকে তো বহু কথাই শুনেছেন। কখনো কিতাব খুলে দেখার প্রয়োজন হয়নি।

শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর কোথাও কোন দারুল হারব আছে কি না? থাকলে কেন? এমন কোন কারণ তাতে রয়েছে যা বাংলাদেশ ও ভারতে নেই?

**পৃঃ ৫/৩০৮, অনুঃ ১** = "প্রশ্নঃ শরয়ি জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কী কী? উত্তরঃ শরয়ি জিহাদ ফরজ হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ : যথা- এক. মুসলিম ইমাম বা খলিফা বিদ্যমান থাকা, যার নেতৃত্বে জিহাদ করা হবে। দুই. মারকায বা ঘাঁটি বিদ্যমান থাকা। তিন. সার্বিক সামর্থ্য থাকা। যেমন অস্ত্র-সস্ত্র, পাথেয়, বাহন ইত্যাদি। চার. অমুসলিম শত্রুদল কর্তৃক মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা। পাঁচ. অমুসলিম কাফের কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করা। ছয়. যুদ্ধের কলাকৌশল জানা থাকা ইত্যাদি"।

**-? গ্যালারি থেকে:** বোঝা যায়নি, শর্তগুলো ফরযে আইনের না কি ফরযে কেফায়ার। কেন এমন হয়েছে বলা মুশকিল। আর জিহাদ ফরজ হওয়ার এই শর্তগুলো ফিকহের কোন কিতাবে আছে? উদ্ধৃতির প্রয়োজন।

আর যদি প্রশ্ন হয়, ওলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দেননি এ কারণে জিহাদ ফরয হয়নি, তাহলে ওলামায়ে কেরামের উপর এ ফাতওয়া দেয়া ফরয কি না? রাষ্ট্রনায়ক আদেশ দেয়নি এ কারণে ফরয নয়, তাহলে রাষ্ট্রনায়কের উপর এ আদেশ দেয়া ফরয কি না? আর রাষ্ট্রপ্রধান যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে তার কাছে কোন শর্তের অভাবের কারণে তার উপর জিহাদ ফরয হচ্ছে না? এবং জিহাদের আদেশ করাও ফরয হচ্ছে না?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কে দেবে?

**পৃ: ৫/৩০৯, অনু: ২** = "প্রশ্ন: ক্ষিপ্ত হয়ে রাসুল-অবমাননাকারীকে হত্যা করাটা শরিয়ত-সম্মত হবে কী? উত্তর: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকারী মুরতাদ। মুরতাদের শাস্তি হলো, তাকে হত্যা করা। তবে হত্যা সম্পাদনের অধিকার খলিফাতুল মুসলিমিন এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিনা অনুমতিতে কেউ তাকে হত্যা করলে দায়িত্বশীলদেরকে অবজ্ঞা করার কারণে তারা তাকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু মূলত হত্যার কারণে তার ওপর কোনো শাস্তি আরোপিত হবে না। কারণ তাকে হত্যা করাটা বৈধ ও শরিয়ত-সম্মত। তবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হত্যাকারীকে তখনই শাস্তি দিতে পারবে, যখন দেশীয় আইনে মুরতাদের যথাযথ শাস্তির বিধান থাকবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে যেহেতু এ সমস্ত কাজের কারণে অনেক ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়, তাই এগুলো থেকে বিরত থাকাটাই বাঞ্ছনীয়"।

**-? গ্যালারি থেকে:** রাসূলকে যারা অবমাননা করেছে তাদের হত্যাকারীকে রাসূল কখনো শাস্তি দেননি। আর ফিতনা মানে কী? ফিতনার সংজ্ঞা কুরআন, হাদীস, ফিকহ থেকে না নিয়ে বাজার থেকে নিয়ে যে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে এর কি কোন বিচার নেই? বিচার ইনশাআল্লাহ একদিন হবেই হবে।

## আর্তনাদ

ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়ার উদ্ধৃতির উল্লেখ আপাতত এখানে শেষ। কিতাবগুলোর পাতা উল্টে দেখার জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি।

কিতাবটি ফাতওয়ার কিতাব হিসাবে সমাদৃত। প্রত্যেক দারুল ইফতায় এর কপি রয়েছে। অনেক খণ্ডে ছেপেছে। উসূলে ইফতা ও উসূলে ফিকহের আলোকে এতে কী সমস্যা আছে তা বলার প্রয়োজন হয়নি। ইলমী আমানতের

খাতিরে সলফের কিতাবাদির সমালোচনার অনুমতি আছে। কিন্তু খলফের হাওয়ালা বিহীন কিতাব দিয়ে হাওয়ালা দিতেও কোন সমস্যা নেই। কোন মুনকার কারো নযরে পড়েনি। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা!

## পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি

**পৃ: ১৮, অনু: ৩ =** "দ্বীন সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ও 'মাসূর'-অনুসৃত পদ্ধতি ছিল পর্যায়ক্রমে দাওয়াত, জিহাদ, বিজয়, শাসন ও প্রশাসন -যা একটি ভূখণ্ডের সকল নাগরিককে ছুঁয়ে যায় এবং কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না, আড়াল করে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না, বরং দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে প্রতিযোগিতাপ্রবণ হয়ে ওঠে"।

**পৃ: ২৪, অনু: ৫ =** "ভারত উপমহাদেশে দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক দ্বীন চর্চার সবচাইতে বড়, ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্র হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ। এর সমকক্ষ আর দ্বিতীয়টি নেই"।

**পৃ: ৪৮, অনু: ৩ =** "সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলো উত্তরসূরিদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দেয়, অজুহাতের রাস্তা খোলে না। শত্রুর জন্যও না, মিত্রের জন্যও না"।

**পৃ: ৩২, অনু: ৫ =** "একটি মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন চিন্তা-চেতনা বা কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কখনো মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের উপর বর্তায় না"।

**পৃ: ৮৮, অনু: ৫ =** "প্রজন্মের মেধার অধিকারীরা ও মেধার যোগানদাতারা ন্যূনতম জীবন যাপনের জন্য বৈধ ও সম্মাজনক পদ্ধতিগুলোর পেছনে সময় ব্যয় না করে সে সময়টুকু বা তার চাইতে বেশি সময় ব্যয় করেছেন অর্থ যোগানদাতাদের পেছনে"।

**পৃ: ৯৩, অনু: ২ =** "আসলে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে জীবনের একটি মান আগেই কল্পনা করে ঠিক করে ফেলেছি। এর পর সে কাল্পনিক মানকে রক্ষা করা জরুরী মনে করেছি। এর পর সে কাল্পনিক জরুরত পুরা করার জন্য হারাম গ্রহণকে বৈধতা দিয়েছি"।

**এ বইটিও পঠকবর্গকে স্বচক্ষে দেখে পড়ার অনুরোধ করছি। অনুরোধ ছাড়া আর কী করতে পারি? এ বইয়ের শুরুতে কারো কোন তাকরীয নেই। লেখকের বিশেষ কোন পরিচয় নেই। তবুও যেহেতু বইটি পড়তে নিষেধ করা**

হয়েছে, তাই কমপক্ষে বিচারের সুবিধার্তে কমপক্ষে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়ার অনুরোধ করছি।

## আর্তনাদ

বইটি পড়তে বড়দের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যারা পড়েছে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। বইটির লেখককে বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে ছোটদের ফরিয়াদ, আজ হয়ত বড়ত্বের প্রভাবে ছোটকে মাড়িয়ে চলা গেছে, কিন্তু এমন এক দিন সবার জন্য অপেক্ষা করছে কি না যে দিন বড় ও ছোটর এ কৃত্রিম মাপকাঠি কাজে আসবে না? তাই ছোটদের পক্ষ থেকে আজ প্রশ্ন-

১. কোন একটি কাফেলার কিছু লোক যদি কোন ভুলের শিকার হয় তাহলে সে কাফেলার ভুল চিহ্নিত করা কতটুকু জরুরী? আর সে কাফেলাকে নির্ভুল বলে প্রচার করা কতটুকু জরুরী?

২. কোন একটি কাফেলা যদি যুগের পর যুগ একটি ভুল করতে থাকে তাহলে তার সে ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য কতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিৎ?

৩. শতকরা কত ভাগ লোক একটি ভুলের উপর চলতে থাকলে সে ভুল ধরিয়ে দেয়া বা অন্যদেরকে সে ভুলের শিকার হওয়া থেকে সতর্ক করা বৈধ হবে?

৪. দ্বীনের কর্ণধারদের কোন পর্যায়ের সমাদৃত ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার সামালোচনা করা বা তা প্রতিরোধ করার চিন্তা করা বৈধ নয়?

৫. একজন মুসলমান কত বছর বয়সে উপনীত হলে একটি মুনকারকে মুনকার বলা তার জন্য ফরয হবে? কত বছর বয়সে ওয়াজিব হবে? কত বছর বয়সে সুন্নত হবে? কত বছর বয়সে মুস্তাহাব হবে? কত বছর বয়সে মুবাহ হবে? কত বছর বয়সে মাকরূহ হবে? কত বছর বয়সে হারাম হবে? আর কত বছর বয়সে গোমরাহী হবে?

৬. একজন তালিবুল ইলম কত বছর বয়সে এবং কোন কিতাব বা জামাত পড়ার পর কিতাবের নির্দেশনা অনুযায়ী চলা তার জন্য ফরয? আর কত বয়স ও কোন জামাত পড়া পর্যন্ত কিতাবকে উপেক্ষা করে তার উস্তায ও বড়র অনুসরণ করা ফরয?

৭. তালিবুল ইলম কিতাবে যা পড়েছে বড়দেরকে যদি সে দেখে তাদের কেউ কিতাবের সে বিধান অনুযায়ী আমল করছে না, বা কেউ করছে কেউ

করছে না, বা কিতাবের অনুসরণ কেউ করছে না, আবার তারা সবাই মিলেও কোন একটির উপর নেই। বরং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা পদ্ধতির উপর চলছে তখন তালিবুল ইলমের করণীয় কী?

৮. উস্তায ঘন্টায় যা পড়িয়েছেন বাস্তব জীবনে তার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করলে তালিবুল ইলমের করণীয় কি?

৯. যে মাসআলা উস্তায দলিলসহ দরসে বুঝিয়েছেন উস্তায সে বিধানের বিপরীত আমল করার পর ছাত্র সে বিষয়ে জানতে চাইলে উস্তাদ যদি ধমক দিয়ে দেন এবং ইলমের আলোকে সমাধান দিতে আগ্রহবোধ না করেন তাহলে ছাত্রের করণীয় কী?

১০. কোন তালিবুল ইলমের যদি সন্দেহ হয়, উস্তায সম্ভবত এ মাসআলাটি কিতাবে দেখেননি তাই বিপরীত করে বলছেন। এ ক্ষেত্রে তালিবুল ইলম উস্তাযের কথা অনুযায়ী আমল করবে না কি কিতাবে নিজের দেখা অনুযায়ী আমল করবে?

১১. তালিবুল ইলমের যদি সন্দেহ হয়, উস্তায ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের ভয়ে সঠিক মাসআলা বলতে পারছেন না, তাহলে তালিবুল ইলম উস্তাযের দেয়া মাসআলা অনুযায়ী আমল করবে না কি কিতাবে দেখা অনুযায়ী আমল করবে?

১২. একটি কাফেলার ব্যাপারে যদি জানা যায় তারা কিতাব মুতালাআ করে না। তাহলে শুধু বড় হওয়ার করণে তাদের ঐক্যমতকে শরয়ী ইজমা বলা যাবে কি না?

১৩. বিশ্বের যে কোন ভূখণ্ডের কোন একটি বিশেষ জামাতের উপর কি 'ইয়াদুল্লাহি আলাল জামাআহ' হুকুমটি প্রযোজ্য হবে?

১৪. পনেরতম শতাব্দী হিজরীতে কোন একটি বিশেষ ভূখণ্ডের বিশেষ কোন জামাতের ঐক্যমতের ক্ষেত্রে কি 'লা তাজতামিউ উম্মাতী আলা দলালাতিন' কায়েদাটি প্রযোজ্য হবে?

১৫. একটি ভুল যদি বিশ্বাসে ও আমলে এমনভাবে স্থান করে নেয় যে, তার বিপরীত তথ্য তালাশ করাকেও গোমরাহী মনে করা হয়, তখন একজন তালিবুল ইলমের করণীয় কী?

১৬. কোন একটি ভুলের প্রচার যদি ব্যাপকভাবে করা হয়। লক্ষ লক্ষ জনতার মহাসমাবেশে, হাজার হাজার মুসলমানের মাহফিলে, হাজার হাজার মুরিদের ইসলাহী বয়ানে, হাজার হাজার মানুষের পঠিত বই-পত্রে, লক্ষ লক্ষ মানুষের পঠিত ও শ্রুত সামাজিক গণমাধ্যমে, -তখন সে ভুলের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, সংশোধন কীভাবে হওয়া উচিত? এবং সে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার সীমারেখা কী হওয়া উচিত?

১৭. একটি ভুলকে দলিল প্রমাণসহ ভুল হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য যিনি ভুলটি চিহ্নিত করবেন তাঁর বয়স কত হওয়া উচিত? তাঁর সনদের স্বীকৃতি কোন মানের হওয়া উচিত? তাঁর কত লক্ষ মুরিদ থাকা চাই? তাঁর কত হাজার ভক্ত ও অনুসারি থাকতে হবে? তাঁর অধীনে কমপক্ষে কতটি মাদরাসা পরিচালিত হতে হবে? তিনি কত বছর যাবত শায়খুল হাদীসের পদ দখল করে থাকতে হবে? তিনি কত পরিমাণ ছাত্রের উস্তায হতে হবে? সামাজিক গণমাধ্যমে তাঁর কত লক্ষ 'লাইক' থাকতে হবে?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ দিতেই হবে। সংজ্ঞাহীন বড়ত্বের চাকায় যখন দ্বীন ও শরীয়ত এবং দ্বীন ও শরীয়ত অনুসরণের আগ্রহীরা এত ভয়ঙ্করভাবে পিষ্ট হয়ে চলেছে তখন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেই হবে।

আমার খাতায় এমন এমন বড়র নামও আছে যাদের বড়ত্বের যাঁতাকলে হাজার হাজার তালিবুল ইলম পিষ্ট হয়ে চলেছে, একটি ফরয আমলের তালিকাও পকেটে রাখার অনুমতি পাচ্ছে না, কিন্তু সে বড় উর্দূ-ফারসী-আরবী-কুরআন-হাদীস-ফিকহ ইত্যাদিতো বহু দূরের বিষয়! সে আমার লেখা বাংলা বইয়ের একটি পৃষ্ঠাও সহীহভাবে বুঝে তার ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে পারবে না।

আমি অনুভব করছি, আমার পাঠকদের কাছে এ ভাষাগুলো অহংকারের ভাষা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়গুলো হাজার হাজার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চলেছে, কিন্তু অহংকারের দোষে, বেশি বোঝার দোষে, বেয়াদবীর দোষে দুষ্ট হওয়ার ভয়ে মুখ খুলছে না সে হৃদয়গুলোর পক্ষ থেকে এ বদনামগুলো বয়ে নেয়ার দায়িত্বটি আমি স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছি। কারণ: ১. সম্মানের বিচারে আমি শূণ্যের কোটায় আছি। নষ্ট হওয়ার মত কোন সম্মান আর আমার অবশিষ্ট রয়নি। ২. আমি এর চাইতে বড় বড় উপাধিও (?) জীবনে পেয়েছি, যার কাছে এসব ছোটখাট উপাধি (?) কোন স্থানই পাবে না। ৩. আমি কারো নই এবং কেউ আমার নয়। বন্ধনমুক্ত এক ভবঘুরে, যার বদনামের টানে কোথাও কোন টান পড়বে না। ৪. আমার ক্ষুদ্র অধ্যয়নে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন বৈধতা আমি পাইনি।

১৮. বিপক্ষের কারো ভুল ধরার জন্য এবং বিপক্ষের কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যে পরিমাণ শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয়, স্বপক্ষের কারো ভুল ধরার জন্য এবং স্বপক্ষের কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার চাইতে কত বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয়? এ বিষয়ে শরীয়তের মূলনীতি কী?

১৯. স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নির্ণয়ের শরয়ী মাপকাঠি কী? একটি পক্ষের সঙ্গে কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে পরে সে বিপক্ষ হয়ে যাবে? এবং তার মতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য খুব বেশি শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হবে না। আর কয়টি মাসআলায় দ্বিমত হলে সে বিপক্ষ হবে না; বরং স্বপক্ষের আওতায় থেকে যাবে? এবং তার কোন মতকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে অনেক বেশি শক্তিশালী দলিল লাগবে এবং দলিল আসার পরও তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে অসম্ভব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়িম, আল্লামা শাওকানী, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আহমদ রেযা খান বেরেলভী, আবুল আলা মওদূদী, মিয়াঁ নযীর হোসাইন দেহলভী, হোসাইন আহমাদ বটালভী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ কত অযোগ্য, কত ছোট হওয়ার কারণে এবং তাদের ভুলের মাত্রা কত বেশি হওয়ার কারণে আমাদের যে কোন ব্যক্তি, যে কোন দলিলের ভিত্তিতে, যে কোন ভাষায় তাদের সমালোচনা করতে পারে এবং তাদের ভুল ধরতে পারে?

এরই বিপরীত অপর কিছু মানুষ কত বড় হওয়ার কারণে, কত যোগ্য হওয়ার কারণে এবং কত সঠিক হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তি, কোন দলিল এবং কোন ভাষায়ই তাদের ভুল ধরার অনুমতি পাচ্ছে না?

২১. শরীয়ত ও ইলমের উসূল অনুযায়ী একটি ভুল ভুল হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পর তা চিহ্নিত করা, ধরিয়ে দেয়া এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য কত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ? কেমন পরিবেশ তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ? উপস্থাপন কত সুন্দর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বৈধ?

২২. যিন্দীকের সংজ্ঞা কী এবং কোন ব্যক্তিকে যিন্দীক বলে ফয়সালা দেয়ার পদ্ধতি কী? বিশেষত যিন্দীক যেহেতু কখনো নিজেকে কাফের বলে স্বীকার করে না। কুফরী করে করেও নিজেকে সে সব সময় মুসলমান হিসাবেই দাবি করে এবং ধরা পড়ার পর সে তার কুফরী কাজ বা কথার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বাঁচতে, নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

আজ দারুল উলূমকে বেছে নিতে হবে, কোন চিন্তা ও মানসিকতাগুলো তার বন্ধুত্বের আর কোন মানসিকতাগুলো তার শত্রুতার। এ এক মহাপরীক্ষা। কারণ, বিচার তার মানহাজে ইলমী অনুযায়ীই হবে।

********************

# হাল্লাজের তথ্য উপস্থাপন-বহিষ্কার

হাল্লাজ অর্থাৎ হোসাইন ইবনে মানসূর আলহাল্লাজ সজ্ঞানে, প্রকাশ্যে খোদা হওয়ার দাবি করে এবং সে দাবির উপর অটল থেকেও খাঁটি মুমিন ও আসল মুওয়াহহিদ হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে -এ তথ্য অমাদের প্রায় সবার কাছেই আছে। এ বিষয়ক একটি চিত্রও সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা যায়।

**বড়**

আপনি যদিও একজন ভালো শিক্ষক, কিন্তু ইবনে কাসীর রহ. এর 'আলবিদায়া ওয়াননিহায়া' থেকে মানসূর হাল্লাজের বিরুদ্ধে যে তথ্য বের করে দেখিয়েছেন সে হিসাবে বোঝা যায় আপনি একজন সর্বস্বীকৃত আল্লাহর ওলীর প্রতি খারাপ ধারণা রাখেন। অতএব আপনি এ মাদরাসায় পড়ানোর যোগ্যতা হারিয়েছেন। আগামী কালের মধ্যে চলে যাবেন। (বিদায়ের সময়) আপনি যে অপরাধ করেছেন সে কারণে চলে তো যাবেনই, তবে আপনার অবস্থানটি একটি ঈমানের প্রশ্ন, তাই তওবা করে নিজের ঈমানের হেফাযত করে নেবেন।

**ছোট**

হাল্লাজ হাজার বছর আগের একজন মানুষ। তার বাস্তব অবস্থা জানতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসেরই শরণাপন্ন হতে হবে। রিজাল শাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে হবে। হাল্লাজ যে শতাব্দীর মানুষ সে শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীকাল পর্যন্ত ইতিহাসবিদগণ তার ব্যাপারে কী বলেছেন? তা দেখা একজন মুসলমানের বিশেষত একজন আলেমের দায়িত্ব। কোন ইতিহাসবিদ কোন ভিত্তিতে বলেছেন তাও দেখা একজন আলেমের দায়িত্ব। এমতাবস্থায় 'আলবিদায়া ওয়াননিহায়া' কিতাব থেকে একটি তথ্য বের করে তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার প্রস্তাব দেয়া কেন কুফরী হল? কেন মাদরাসা থেকে বহিষ্কারের কারণ হল? কেন এটি এমন একটি গুনাহ হল যা থেকে তাওবা করে নতুনভাবে মুসলমান হতে হবে? ছোটদের ছোট মেধা দিয়ে এ বিষয়গুলো বুঝে নেয়া একটু কঠিন।

**দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মানহাজ**

দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য যে ইলমী মানহাজ তৈরি করেছে সে মানহাজের আলোকে দারুল উলূম দেওবন্দের আবা ও আবনা-পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের একটি সত্য অতীত রয়েছে। রিজালশাস্ত্র ও ইতিহাসশাস্ত্র এ দু'টি শাস্ত্রের যেসকল মহাপুরুষদের উপর নির্ভর করে দারুল উলূম দেওবন্দের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষগণ ইতিহাস ও রিজালশাস্ত্রের হাজার নয় লক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, রিজাল ও ইতিহাসের সে মহাপুরুষদের কোন কিতাব থেকে কোন তথ্য উপস্থাপন করা কত বড় অপরাধ?! বিশেষত এমন একটি ঐতিহাসিক বিষয়, যে বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ একমত।

ইতিহাসের পাতা থেকে যদি ইমাম আবু বকর আলজাসসাস রহ., ইমাম খতীব বাগদাদী রহ., ইমাম ইবনুল জাওযী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম যাহাবী রহ., ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ও ইমাম ইবনে হাজার রহ. এর মত রিজাল ও ইতিহাসশাস্ত্রবিদগণকে বিয়োগ করে দেয়া হয়, তাদের সিদ্ধান্তকে বাম হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে রিজাল ও ইতিহাসের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তদাতা কে হবেন?

আর বড়রা বা বড়দের শিরনামে যারা উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তারা নিজেদেরকে মাদরাসা ও ইলমের পরিচয়ে পরিচয় দিতে কেন আগ্রহবোধ করছে? এ দেশে কি মাটির টুকরি আর কোদালের অভাব পড়েছে? আর না মাটি কাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে? এ দেশে কি রিক্সা-ভ্যানের অভাব পড়েছে? না কি যাত্রী ও বহনের মালামালের অভাব পড়েছে?

সর্বস্বীকৃত ইতিহাস ও রিজালবিদদের গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিক বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনাকে যারা কুফরী মনে করে, গোমরাহী মনে করে, মাদরাসা থেকে বের করে দেয়ার মত যোগ্য কারণ মনে করে তাদের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী মানহাজ কী সিদ্ধান্ত নেবে? তারা এবং তাদের এ মাদরাসা দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে জুড়ে থাকার সূত্র কী হবে?

**وابك على ذلك –إن استطعت– دما**

প্রসঙ্গক্রমে এ ধরনের কিছু নষ্ট মানসিকতার কিছু কারগুজারী এখানে তুলে ধরা যেতে পারে-

ক. আমার ধারণামতে যুগহারে চলনসই আলেম। দুনিয়ামুখীও বলা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যকে মেনে নিতে পারে বলে মনে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, হাল্লাজ প্রকাশ্যে সচেতন অবস্থায় নিজেকে খোদা বলে দাবি করার পরও কেন সে মুসলমান? বললেন, এটাতো তার মুখের শব্দ। তার মনের অবস্থাতো আমরা জানি না? বললাম, একজন মানুষ নিজেকে খোদা বলে দাবি করার পরও কি ফাতওয়া দেয়ার জন্য তার মনের অবস্থা জানতে হবে?

বললেন, জানতে হবে। কারণ সে তো একজন মুসলমান। কেন সে এ শব্দ উচ্চারণ করেছে তা জানতে হবে। বললাম, নিজেকে খোদা বলার পরও তাকে মুসলমান হিসাবে বিচার করেই তার মনের অবস্থা জানতে হবে? বললেন, হাঁ জানতে হবে। না জেনেই কারো কলবের উপর হাত দেয়ার কোন অধিকার আমাদেরকে দেয়া হয়নি।

বললাম, দেওয়ানবাগী কেন কাফের? বললেন, সে বলেছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উলঙ্গ অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছে। বললাম, উলঙ্গ অবস্থায় স্বপ্ন দেখার কারণে কাফের হয়ে যাবে?! বললেন, হাঁ কাফের হয়ে যাবে। বললাম, স্বপ্নতো নিজের ইচ্ছায় হয় না। আল্লাহ পাক দেখান এতে স্বপ্নদ্রষ্টা কফের হবে কেন? আর এমন কোন কথা কি কোন কিতাবে আছে? বললেন, সে এ স্বপ্নের কথা প্রচার করেছে। বললাম, স্বপ্ন প্রচার করা কি কুফরী? বললেন, এর মাধ্যমে সে রাসূলকে এহানত তথা হেয় প্রতিপন্ন করেছে। বললাম, কেন সে তো তার স্বপ্ন প্রচার করেছে। এতে হেয়প্রতিপন্ন করার কী আছে? বললেন, সে রাসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যই প্রচার করেছে। বললাম, আপনি কিন্তু তার ক্বলবের উপর হাত দিয়ে ফেলেছেন। একটু আগে যা থেকে আমাকে নিষেধ করেছেন। বললেন, সে তো ভণ্ড, খারাপ মানুষ। বললাম, সে খারাপ হবে কেন? সে তো আশেকে রাসূল। আপনারা সর্বোচ্চ অঞ্চলিক আশেকে রাসূল, আর সে হচ্ছে বিশ্ব আশেকে রাসূল। সে ভণ্ড ও খারাপ হবে কেন? সঠিক কোন উত্তর না পেয়ে আবদারের সুরে বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু কিতাব মুতালাআ করবেন। আমাদের উপর মন খারাপ করে বদদোয়া দিয়ে কোন লাভ নেই। কিতাবে যা পড়েছেন তা একটু বিশ্বাস করবেন।

**খ.** আগের আলেম সাহেবকেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছি যে, একজন ব্যক্তিকে তার যামানার মুফতিয়ানে কেরাম একমত হয়ে কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, সে ফাতওয়া কার্যকর হয়েছে। ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী আদালতের অধীনে কাফের হিসাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার বছর পরের ওলামায়ে কেরাম কীভাবে জানতে পারলেন, সে কাফের লোকটি খাঁটি মুমিন ও আসল মুওয়াহহিদ ছিল?

বললেন, কাফের হিসাবে ফাঁসি হলেও পরবর্তীতে এমন কিছু আলামত প্রকাশ পেয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার সমকালের মুফতীগণের ফাতওয়া ভুল ছিল। তিনি বাস্তবে কাফের ছিলেন না। একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আলামতগুলো কী? বললেন, তার রক্ত, গোশত,

হাড্ডি, তার পোড়া ছাই ইত্যাদি থেকে 'আনাল হক' দাবিটি উচ্চারিত হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় তাঁর দাবিতে তিনি হক ছিলেন।

বললাম, এ আলামতগুলো আপনি ইতিহাসের কোন কিতাবে পেয়েছেন? কিছুক্ষণ এ দিক ওদিক হাতড়ে পরে একটি শের বললেন। বললাম, এ শের দিয়েই শেষ পর্যন্ত একটি যামানার সকল মুফতীর ঐক্যমতের একটি ফাতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করবেন?

বললেন, এগুলো কি মিথ্যা? বললাম, মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন? মিথ্যা হওয়ার জন্যতো নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসে না থাকলেই হল। কিন্তু সত্য হওয়ার জন্যতো তা সত্য ইতিহাসে থাকতে হবে। সে সত্য ইতিহাস উপস্থাপন করাতো আপনার দায়িত্ব। আপনি বলুন, এ ইতিহাসটা সত্য ইতিহাসের কোথায় আছে? তিনি মিষ্টি একটা হাসি দিলেন। অযোগ্যতাবশত সে হাসিতে আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।

তিনি আরেকটি কথাও বলেছেন। বলেছেন, কুফরীর ফাতওয়া হলেও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম কাশফ ও স্বপ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, হাল্লাজ খাঁটি মুমিন ছিলেন। যদিও কাশফ ও স্বপ্ন দলিল নয়, তবুও ...। বললাম, বলুন, তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে তা শরীয়তের ঐক্যমতে গৃহীত দলিলের বিপরীতে প্রাধান্য পেয়ে যায়। বললেন, না তা নয়। বললাম তাহলে কী? দলিল নয় যেনেও কেন বিষয়টি উত্থাপন করলেন? আর যে কাশফ ও স্বপ্নের মাধ্যমে একশত বছরের পরবর্তীদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সে কাশফ ও স্বপ্ন থেকে একশত বছর আগের লোকেরা বঞ্চিত হলেন কেন? সে স্বপ্ন ও কাশফ থেকে তার উস্তায, তার পীর ও শশুর বঞ্চিত হলেন কেন?

বললেন, তারপরও। আমাদের আকাবির তাকে ভালো বলেছেন। বললাম, দলিল যখন শেষ পর্যন্ত এটাই তাহলে এতক্ষণ আকাশ পাতাল বিচরণ করার কী প্রয়োজন ছিল? আরো বললাম, আকাবিরের বদনাম করবেন না। দুয়েকজনের কথা পুরা জামাতের উপর প্রয়োগ করবেন না। নিজের স্বার্থে আকাবিরের হাওয়ালা দেবেন না। আকাবিরের হাজার হাজার সহীহ কথা আমরা মানি না, একটি ভুলকে মানার প্রতি আমাদের এত আগ্রহ কেন? এটা ভালো লক্ষণ নয়।

যাই হোক, এমন একটি মাসআলা তাহকীকের প্রস্তাবের অপরাধে বড়রা ছোটদেরকে মাদরাসা থেকে বের করে দিয়েছে। এখন মাদরাসার বিধান কী? যে মসজিদে সুদ-ঘুষ-যিনার বিরুদ্ধে আলোচনা করলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হয় সে মসজিদের শরয়ী বিধান কী? যারা বের করে দেয় তাদের বিধান কী? তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের করণীয় কী?

গ. একজনকে বললাম, হাল্লাজকে যে কুফরীর কারণে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে কেরামের ঐক্যমতে ফাঁসি দেয়া হয়েছে সে কথাটি প্রায় সবাই লিখেছেন। যাঁরা লিখেছেন তাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আবু বকর আলজাসসাস রহ., ইমাম খতীব বাগদাদী রহ., ইমাম ইবনুল জাওযী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম যাহাবী রহ., ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ও ইমাম ইবনে হাজার রহ. এ নামগুলো উল্লেখ করেছি।

তিনি সবগুলো নাম থেকে শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নাম উল্লেখ করে বললেন, তিনিতো সূফীদের বিষয়ে একটু কট্টর ছিলেন। আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সূফিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বললাম, আমি নাম উল্লেখ করলাম আট/দশ জনের। আপনি সবার কথা বাদ দিয়ে মাঝখান থেকে শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়াকে তুলে এনে তাঁর উপর এক চোট নিলেন। তাহলে বাকিদের ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য? কোন জবাব দিলেন না।

দ্বিতীয়ত বললাম, ইবনে তাইমিয়া কি এ পর্যায়ের নিচে নেমে গেছে যে, তিনি যদি দলিল প্রমাণের আলোকেও কোন কথা বলেন তবু তাঁর কথা মানা যাবে না। যদি এমন হয় যে, তাঁর কথা মানাই যাবে না তাহলে শিয়াদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার জন্য, এমনিভাবে বিভিন্ন রকমের বিদআতের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় তাঁর কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতিগুলো কেন উল্লেখ করা হয়? তাঁর কিতাব কেন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়? তাঁকে সবাই কেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলে উল্লেখ করে থাকে?

ঘ. একজন বললেন, যাই বলুন না কেন, বড়দের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। বললাম, কোন প্রসঙ্গে বলছেন? হাল্লাজের বিষয়ে? না কি যে কোন বিষয়ে? বললেন, আপাতত হাল্লাজের বিষয়টাই ধরা যাক। বললাম, হাল্লাজকে কাফের ফাতওয়া দিয়ে যারা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে তারা চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর ওলামায়ে কেরামের একটি বিশাল জামাত। আর তাকে খাঁটি মুসলমান ও মুওয়াহহিদ মনে করা শুরু হয়েছে একশত বছর পর থেকে। সে থেকে বর্তমান যামানা পর্যন্ত ছোট্ট একটি জামাত কোন প্রকার ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই তাকে খাঁটি মুমিন ও মুওয়াহহিদ এবং উম্মতের মুকতাদা হিসাবে উপস্থাপন করছেন।

এমতাবস্থা দু'টি মতের কোনটির পক্ষের লোকদেরকে আমরা বড় বলব? আর কোনটির পক্ষের লোকদেরকে আমরা ছোট বলব? আমাদের তুলনায় তাঁরা সবাই বড়। কিন্তু তাদের মাঝেতো কেউ বড় আবার কেউ ছোট আছেন। সে বড়-ছোটর মাঝে কারা বড় আর কারা ছোট? আমি সবার ছোট হিসাবে

কারটা গ্রহণ করব? তিনি আমার কথা মানেনি। আমাকে সান্ত্বনামূলক কোন জবাবও দেননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বড়দের অনুসরণের যে মাপকাঠি আজ আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে, এমন কোন মাপকাঠি কি আমাদের বড়দের জন্যও ছিল? যদি থেকে থাকে তাহলে তাঁরা সে মাপকাঠি উপেক্ষা করেছেন কেন? এক শতাব্দীর বড়রা যখন সম্মিলিতভাবে একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন তখনতো পরবর্তী ছোটদের দায়িত্ব ছিল তা মেনে নেয়া এবং বড়দের সঙ্গে দ্বিমত করে কোন প্রকার বেয়াদবীর শিকার না হওয়া। কিন্তু তাঁরা তা করেননি; বরং দ্বিমত করেছেন।

এখন তাদের এ দ্বিমত যদি দলিল ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাবে দলিল ছাড়াই বড়দের সঙ্গে দ্বিমত করা যায়। আর যদি তাঁরা দলিল দিয়ে দ্বিমত করে থাকেন তাহলে বোঝা যাবে, বড়রা যাই করেন না কেন দলিলের আওতায় আনা না গেলে তা কোনভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। এখন বাস্তবতা কী ছিল? তাও দেখিয়ে দেয়া বড়দেরই দায়িত্ব হয়ে যায়। আমরা নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। এড়িয়ে যাওয়াকে মানতে পারছি না।

**********

## পঁয়ষট্টি বছর-ছোট

বড় ও ছোটর ভালো কোন সংজ্ঞা আমরা দিতে পারিনি। তবে এতটুকু বলে এসেছি যে, প্রচলিত অর্থে বড় শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, বড় হওয়ার জন্য বয়স বা যোগ্যতা কোনটাই ছোটর চাইতে বেশি হওয়া জরুরী নয়। এটা আসলে কোন সংজ্ঞা নয়; বরং সংজ্ঞার সহায়কমাত্র। প্রচলিত অর্থে বড়র সংজ্ঞা বড়রাই দিতে পারবেন। আমরা আলামত হিসাবে শুধু বলতে পারি, বড়ত্বের পদটি যে আগে দখল করে ফেলেছে সে বড়, এমনিভাবে যে কথায় কথায় বড়র উদ্ধৃতি দেয় সে বড়। তবে এটা শুধু আলামতই মাত্র,

সংজ্ঞা নয়। সঠিক সংজ্ঞা জেনেই এ বিষয়ে নিশ্চিত কথা বলা যাবে। এখন এখানে আমরা যে চিত্রটি তুলে ধরব তা থেকেও বড়-ছোটর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

**বড়**

বড়দের সিদ্ধান্তের বাইরে তাকে এসব বিষয়ে হাত দেয়ার সাহস দিয়েছে কে? সে হঠাৎ এসেই সব বুঝে ফেলেছে, আর আমাদের বড়রা এসব বোঝেননি? রাতারাতি একটি মাদরাসার রঙ্গ বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখে!

**ছোট**

যাঁকে ছোট বলে ধমকগুলো দেয়া হচ্ছে তাকে নিয়োগ দেয়াই হয়েছে এসব কাজের জন্য। ইঙ্গিতে তাঁকে বলাও হয়েছে, আপনার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে সাজানো একটি রূপ তৈরি করুন। সে হিসাবে তিনি করে চলেছেন। তাছাড়া, সংস্কারমূলক কাজ যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়; বরং উপকারী হয় তাহলে এতে সমস্যা কোথায়? সংস্কারের মধ্যে কোথাও কোন ভুল হয়ে গেলে সে ভুলকে সরাসরি ভুল বলে দিলেই হল। বড়দের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে ভারি করে তোলার কী প্রয়োজন? ছোট ও বড়কে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়ার কী প্রয়োজন?

ঘটনাটি আমার আব্বাজান মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির। বড়র পক্ষ থেকে যখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হচ্ছে, তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর। হাদীস পড়ানোর বয়স তখন তাঁর চল্লিশ বছরের উপরে। প্রচলিত পরিভাষায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর যাবত তিনি শায়খুল হাদীস। অর্থাৎ সহীহ বুখারীর উস্তায। অর্থাৎ বড় মাদরাসার বড় হুজুর। অর্থাৎ বড় হয়েছেন আরো ত্রিশ বছর আগে। এ হলো এক দিক।

অপর দিকে তাঁকে দূর থেকে আনা হয়েছে বড় হিসাবে। নিয়োগ দেয়া হয়েছে এমন এক পদে যেখানে কাজই হচ্ছে সংস্কার করা। দায়িত্বশীলগণ পিঠে হাত বুলিয়ে সংস্কারের সে দায়িত্বটাই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যার জন্য তাঁকে আনা হয়েছে। তিনি কাজ শুরু করেছেন। কাজের সুফলে দায়িত্বশীলগণ খুশি। তালিবুল ইলমরা খুশি। মাদরাসার রঙ্গ ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। একটা ভালো বাতাস বইতে শুরু করেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এমন সময়।

এমন সময় সহকর্মীদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। বিভিন্ন কাজের উপর আপত্তি আসতে শুরু করেছে। আসতেই পারে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে এমন কিছু সমস্যা অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়। সব জায়গায়ই এমন

হয়। কিছু দুর্বলতা উভয় পক্ষেই থাকে। এ কারণে এসব আপত্তি নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, বাক্যটি। যাকে ছোট বলে ভূষিত করা হচ্ছে তার বয়স ও যোগ্যতার কথাতো বলা হল। এ বয়স ও যোগ্যতার পর যিনি বড় হলেন না তার অপরাধটা কী? তিনি কোন অপরাধে ছোট রয়ে গেলেন? নিশ্চয় কাজের অপরাধে। আর এ কারণেই আমরা বড়র সংজ্ঞা দিতে বিব্রত বোধ করেছি। আর জরিপ করে দেখা গেছে, বড় হওয়ার জন্য বিশেষ কোন বয়স বা যোগ্যতার সীমারেখা নেই। ডিপ্লোমা কোর্সের মত এর একটা কোর্স আছে।

আরো অবাক কাণ্ড হলো, তিনি কার চোখে ছোট সে বিষয়টি। দেখা গেল তিনি তাদের চোখেই ছোট যারা তাঁর সমবয়সী বা ছোট। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সমস্যাটা আসলে কোথায়।

এখানে বড় ও ছোটর যে ব্যাপারটি ঘটেছে এটা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনামূলক একটি বিষয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর মৌলিক কোন সম্পর্ক নেই। বড়-ছোটর ব্যবধান বোঝানোর জন্যই মূলত এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শব্দের অপব্যবহার অনেক বড় সমস্যার কোন বিষয় নয়। সমস্যা হচ্ছে শরয়ী বিষয়াদির ক্ষেত্রে।

আশাকরি পাঠকবর্গ অনুমান করতে পেরেছেন, কোন ধরনের পরিস্থিতির শিকার হলে 'বড়' ও 'ছোট' পরিভাষাগুলোর ব্যবহার বেড়ে যায়। বর্তমান যামানায় খেয়ানত এবং ইলম না থাকার যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এ পরিস্থিতিতে এসব পরিভাষার ব্যবহার যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং তা যে কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে তা অনুভব করা দায়িত্বশীলদের দায়িত্বে পড়ে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা যাদেরকে দায়িত্বশীল ভাবতে পছন্দ করি তারাও এ পরিভাষাগুলোর আড়ালে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আর এরই সাথে সাথে খেয়ানত ও মূর্খতার অপরাধে লিপ্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে এ অন্ধকার গলিতে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

**************************

# ইলম-আমল বা مراتب ترك العمل بالعلم

দারুল উলূম দেওবন্দের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ইলম মোতাবেক আমল। এটি মূলত দারুল উলূম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের মূল দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীসের যত বক্তব্য রয়েছে সকল বক্তব্যে আমলকে ইলমের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আমলমুক্ত ইলমের কোন ধারণা ইসলামে নেই। আয়াত ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আমলমুক্ত ইলমের নিন্দা করা হয়েছে।

দারুল উলূম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে ইসলামের সে বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে। ভারত উপমহাদেশে যখন ইলমের সঙ্গে আমলের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তখন দারুল উলূম দেওবন্দ ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছিল। ইলমের সঙ্গে আমলের দাওয়াত দিয়েছিল।

ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য সভ্যতাকেন্দ্রগুলো ইলম ও আমলের সমন্বয় না করে যে দুর্বলতার শিকার হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ সে দুর্বলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানরা আজ কী অবস্থায় আছে তা জরিপ করার জন্যই মূলত এ শিরনাম। এর জন্য কয়েকটি কাজ করতে হবে।

### কয়েকটি কাজ করতে হবে

**প্রথমত** ইলম মোতাবেক আমলের সঠিক জরিপ উদ্ধার করতে হলে সবার আগে দরকার হবে ইলমের তালিকা। এরপর আসবে আমলের তালিকা। এরপর ইলমের তালিকার সামনে আমলকে বসানোর পর সুস্পষ্টভাবে দর্শকের সামনে ফুটে উঠবে ইলমের তালিকার কোন কোন নম্বরের ইলমের সামনে খালি দেখা যায়। কোন কোন ইলমের ঘর আমল দ্বারা পূর্ণ করা হয়নি।

**দ্বিতীয়ত** তৈরি করতে হবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ, হারাম, কুফর এর তালিকা। সে তালিকার সামনে খালি ঘরে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন দিতে হবে। কোথাও কোথাও শতকরা হার বসাতে হবে। এতে করে দর্শকের সামনে ও পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে ইলম ও আমলের সমন্বয়ের দৃশ্য।

**তৃতীয়ত** তৈরি করতে হবে ফরয ইলমের তালিকা। ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া দু'টি তালিকাই তৈরি করতে হবে। ফরয ইলমের পূর্ণ তালিকা

সামনে আসার পর সামনের খালি ঘরে টিক চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন বসবে। কোথাও কোথাও শতকরা হার বসবে।

**চতুর্থত** তৈরি করতে হবে আমরা যেসব ইলমের চর্চা করছি, জীবনের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যয় করছি তার কোনটি ফরযে আইন, কোনটি ফরযে কেফায়া, কোনটি সুন্নাত, কোনটি, মুবাহ, কোনটি মাকরূহ, কোনটি হারাম আর কোনটি কুফর।

**পঞ্চমত** তৈরি করতে হবে আমাদের আমালের তালিকা। আমরা যে আমলগুলো করছি। সে আমলগুলো সামনের খালি ঘরে লিখতে হবে কোন আমলটির উপর ঈমান নির্ভরশীল, কোন আমলটি ফরয, কোন আমলটি ওয়াজিব, কোন আমলটি সুন্নত, কোন আমলটি মুস্তাহাব, কোন আমলটি মুবাহ, কোন আমলটি মাকরূহ, কোন আমলটি হারাম আর কোন আমলটি কুফর।

**ষষ্ঠত** তৈরি করতে হবে শোয়াবুল ঈমানের তালিকা। ঈমানের তালিকায় যেসব শাখা রয়েছে তার কতটি আমাদের মনে আছে, কতটির হুকুম আমাদের জানা আছে এবং কতটি আমাদের আমলের সাথে আছে। সেখানে আরো লাগবে, কোন শাখাটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কোন শাখাটির সঙ্গে আমার বাবার কোন সম্পর্ক নেই। আর কোন কোন শাখার সঙ্গে আমার উস্তায ও পীরের কোন সম্পর্ক নেই। কোন শাখাটি কার সাথে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করেই তালিকাটি তৈরি করতে হবে।

### মনে রাখতে হবে

মনে রাখতে হবে, এসব তালিকা তৈরি হবে কুরআন-হাদীসের আলোকে ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। ফিকহের সিদ্ধান্তেই হবে, কিন্তু দলিলমুক্ত ফিকহ দিয়ে নয়। মুফতীর হাতেই হবে, কিন্তু মুফতীর আবেগ দিয়ে নয়, মুফতীর ব্যক্তিগত দুর্বলতা দিয়ে নয়।

এ ছক তৈরি আজ সময়ের দাবি। সময়ের অন্যতম ফরীযা। যখন কুফরের দাওয়াত ফরয দাওয়াত (?) হয়ে গেছে, যখন গুনাহের দাওয়াত ফরয দাওয়াত হয়ে গেছে, যখন ফরয ইলম বিতর্কিত ইলম হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যখন ফরয আমল হারাম হয়ে যাচ্ছে, যখন ফরয ফিকর বিচ্যুত ফিকর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন এ বিষয়গুলো আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাই এ ছয়টি তালিকা তৈরি করতে হবে।

আমরা এ বইয়ে তা পারব কি না এখন বলতে পারছি না। তবে এ বইয়ে হোক বা অন্য বইয়ে হোক তা করতেই হবে। কাজটি যদি অন্য কেউ করে দেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হব। আর কেউ না করলে আমাদের কাঁচা হাতেই তা করতে হবে। তখন ঠিকই অপনারা বলবেন, ছোট মুখে এত বড় কথা

সাজে না। তাই ছোটরা কেউ তাতে হাত দেয়ার আগেই বড়রা কেউ করে ফেলুন। এটা আমরা চাই।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ও ভাসা ভাসা যে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব তা হচ্ছে, ইলম অনুযায়ী আমল না করার যে ধরনগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে যাব। তরকে আমলের সবগুলো প্রকার এতে হয়ত আসবে না, কিন্তু প্রসিদ্ধ ও ব্যাপকভাবে আমরা যেগুলোর শিকার সেগুলোর অধিকাংশ এসে যাবে বলে আশা করতে পারি।

### একটু জটিল

যে ইলমগুলো আমাদের উপর ফরয হয়ে আছে সেগুলো দিয়েই কথা শুরু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে যে কথাই বলা হবে সে কথাই অনেক জটিল এবং অনেক বড় জায়গায় আঘাত করবে। কিন্তু নিজের চোখে দেখে যা উপলব্ধি করছি তা না বলার কোন সুযোগ নেই বিধায় বলে যাই। বিশেষ কোন বিন্যাস খুঁজে পাচ্ছি না তাই মনে যেভাবে আসছে সেভাবে বলে যাই। সম্মানিত পাঠক নিজের মত করে তা বিন্যস্ত করে যাবেন।

আরেকটি কথা হচ্ছে, যদিও ফরযের একটি অংশের নাম হচ্ছে ইলম এবং আরেকটি অংশের নাম হচ্ছে আমল, কিন্তু একটি বিচারে দু'টিই আমল। অর্থাৎ আমার উপর কী কী ফরয আমল রয়েছে -এ প্রশ্ন আসলে স্বভাবত ইলম শেখার ফরয দায়িত্বও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ জন্য শিরনাম হিসাবে ফরযের তালিকা হলেই সহজ হয়। সে হিসাবে ফরয ও ফরযের সঙ্গে আমাদের আচরণের একটি তালিকা দিয়ে যাই। আশাকরি এ ছোট্ট বই হিসাবে এতটুকু আমাদের জন্য উপকারী হবে। এর চাইতে বেশি কিছু হয়তো অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে।

### ফরয ও আমরা

#### কী কী ফরয তা জানা ফরয:

একজন মুসলমানের উপর দৈনন্দিন কী কী ফরয তা জানা ফরয। এটা আমরা জানি না। কোন কোন আল্লাহর বান্দা তাঁদের ভক্ত ও অনুসারীদেরকে দৈনন্দিন ফরযের তালিকা দিয়ে থাকেন। এটা অত্যন্ত ভালো কথা। এর মাধ্যমে ফরযগুলোর উপর আমল করার একটা মুযাক্কির বা সতর্ককারীর ব্যবস্থা হয়ে যায়। কখনো কোন ফরয আমল আদায় করতে না পারলে না পারার লজ্জা তার মনোপ্রাণে থাকে। আপরাধবোধ জেগে থাকে। এতে করে ফরয তরকের উপর অটল থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এক সময় ছেড়ে দেয়া ফরযটির উপরও সে আমল করতে শুরু করে।

কিন্তু এখানে যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, ফরযের তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ফরযের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। আর তা করি ইবাদতের গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করার কারণে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানরা কাফের ও কুফরী শাসনের অধীনে জীবন কাটাতে কাটাতে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এককে প্রজন্ম একেকটি ফরযকে ভুলতে ভুলতে এখন ফরয ও ইবাদতের সীমা অমার্জনীয় রকমের ছোট হয়ে গেছে।

বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুসলমানরা যখনই কোন ফরয আমল আদায় করার ইচ্ছা করেছে, তখনই প্রশ্ন এসেছে রাষ্ট্রীয় আইনে তার বৈধতা আছে কি না? যে ফরয আদায় করা রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ সে ফরয আর আদায় করা হয়নি। এক প্রজন্ম আদায় করেনি। আর এর পরবর্তী প্রজন্ম একই তরিকার ইজতিহাদের (?) মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, ঐ ফরযটি ফরয নয়। এর পরবর্তী প্রজন্ম ইজতিহাদের (?) মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে, ঐ ফরযটি হারাম। এর পরবর্তী প্রজন্ম যখন ফরযের তালিকা তৈরি করেছে তখন কুরআন-হাদীস-ফিকহের স্বীকৃত সে ফরযটি আর ফরযের তালিকায় স্থান পায়নি।

কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমলকে ফরয বলে গেছেন তা কেন ফরযের তালিকায় আসল না, এ বিষয়ে ভাবার মত পরিস্থিতিও আর রয়নি। দলিলের আলোকে এ বিষয়ে ইস্তিফতা ও ইফতা দু'টিরই পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

### ইলমে দ্বীন শেখা ফরয:

ইলমে দ্বীন শব্দ থেকে এ ইলমের পরিচয় একেবারে স্পষ্ট। হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং কাযী ইয়ায রহ. এর বক্তব্য অনুসারে একজন মুসলমানের উপর যে আমলগুলো ফরয তা আদায় করার পদ্ধতি জানাও তার উপর ফরয। আর এ ফরয ইলম হাসিল করার জন্য যে মাধ্যমগুলো গ্রহণ করতে হয়, অর্থাৎ যে মাধ্যমগুলো ছাড়া ফরয ইলম হাসিল হবে না সে মাধ্যমগুলো গ্রহণ করাও ফরয।

মাটি কাটা শেখা, রিক্সা চালানো শেখা, চাঁদে যাওয়া শেখা, যেতে না পারলে মিথ্যা কাহিনী বানানো শেখা, এগুলো কখনো ফরয ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন ইলম যা শেখা পর্যন্ত শেষ, শরীয়তের কোন বিধান বাস্তবায়নের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই তা শেখা ফরয নয়। যে জ্ঞান শিখলে ইসলামের বিধানগুলোকে দলিত মথিত করা যায় সে জ্ঞান দ্বীনী ইলম নয় তাই তা ফরয নয়। যে ইলম শিখলে পঁচা কুমড়া দিয়ে শরবত তৈরি করা যায়, পঁচা ডিম দিয়ে কেক তৈরি করা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়। যে ইলম শিখলে প্লাস্টিকের ডিম ও প্লাস্টিকের চাল তৈরি করা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়।

যে ইলম শিখলে মিথ্যা কথা বলার কৌশল শেখা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়। যে ইলম শিখলে কুরআন-হাদীস-ফিকহকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় সে ইলম শেখা ফরয নয়। ঐ ইলম শেখা ফরয যা শিখলে কোন ব্যক্তির উপর অর্পিত ফরয দায়িত্বগুলো আদায় করা যায়।

## অবাক হওয়ার প্রয়োজন নেই

অনেক পাঠক হয়তো ভাবছেন, আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইলমগুলো শেখা ফরয নয় এ কথাও আমাদেরকে বলতে হবে -আমাদেরকে এতটা বোকা ভাবা উচিৎ হয়নি। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। এ ইলমগুলো ফরয হওয়ার ব্যাপারে পুরা দেশ ও সারা বিশ্ব এখন একমত। মুসলমানদের কর্ণধার হওয়ার দাবিদাররা সে ফরযের পক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে দলিলের যোগান দিয়ে চলেছেন। এ ইলমগুলো শেখার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ফটকে, দেয়ালে দেয়ালে, মনোগ্রামে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমানের আলোচনায়, হুজুর স্যারের বয়ানে, আমন্ত্রিত মাওলানা সাহেবের বয়ানে এ ইলমগুলো ফরয হওয়ার কথা কুরআন-হাদীসের আলোকেই চলছে।

এ ইলমগুলোর জন্য জান্নাতের আশায় দানবীররা দান করে চলেছে। এ ইলমের পরীক্ষাগুলোর জন্য মুস্তাজাবুদ দাওয়া খাস বান্দারা নেক দোয়া করে চলেছেন। এ ইলমগুলোর পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ইসলামী নেতৃবৃন্দ তোরণ তৈরি করে চলেছেন। এ ইলমগুলোর পরীক্ষার সফলতার জন্য নেক বান্দারা কলম পড়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছেন। এ ইলমগুলোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মিষ্টির জোয়ারে খাস বান্দারা ভেসে চলেছেন। এ ইলমগুলোর শিক্ষার্থীদের সফলতার গর্বে মুসলমানদের পা মাটিতে পড়তে পারছে না। এ ইলমগুলোতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দিয়ে মুসলমানরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে চলেছে।

## ফরয ইলম এখন ভবঘুরে

এ ইলমগুলোকে যখন মুসলিম অমুসলিম সবাই ফরয বলে চলেছে তখন ধর্মীয় ইলমের বিষয়েও এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, তা ফরয নয়। ধর্মীয় শিক্ষা কোন ফরয বিষয় নয়। এটি একটি ঐচ্ছিক বিষয়। যা শিখলে শেখা যায়, আবার না শিখতে চাইলেও কোন সমস্যা নেই। আর যদিও বলা হচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষা ইচ্ছা করলে শিখতে পারবে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা শিখতে গেলে ধোলাই দেয়ার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের ঈমানের সাতাত্তর শাখার যে কোন শাখার ইলম কেউ শিখতে চাইলেই তাকে শিখতে দেয়া হবে, সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় আইন সেভাবে তৈরি হয়নি। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে হারাম কাজ করতে হবে এমন

আইন রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম শিক্ষক রাখতে হবে এমন আইনও রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধায়ক, নিরীক্ষক অমুসলিম হতে কোন সমস্যা নেই। আপত্তি করলে সমস্যা আছে।

### ইলমের নভোচারীদের বলছি

আর ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য যারা নিজের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছেন তাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে। ইলমের শিরনাম যত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণই হোক না কেন সর্বাবস্থায় সে ইলম যদি ফরয আমল আদায়ের মাধ্যম না হয় তাহলে তা ফরয ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে এ কথাও খতিয়ে দেখতে হবে যে, ফরয ইলম অর্জন না করে ফরয নয় এমন ইলম অর্জন করার পেছনে মেধা ও সময় ব্যয় করা জায়েয আছে কি না।

তালিবুল ইলমদের দরবারে আরেকটি নিবেদনও করব। প্রত্যেক তালিবুল ইলম যেন তাদের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে ফিকহের আলোকে যাচাই করে দারুল ইফতা থেকে মাসআলা জেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি করেন। আকেল, বালেগ, মুসলমানের কোন কাজই যেন শরয়ী সিদ্ধান্তের বাইরে না হয়। এর কোন সুযোগ নেই। এক বিন্দু সুযোগও নেই। আল্লাহ আমাকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

### আরেকটি নিবেদন

আরেকটি নিবেদন হচ্ছে, ইলমের যে অধ্যায়গুলো পড়াকে জরুরী মনে করা হচ্ছে না, তা কেন? সে বিষয়ে তালিবুল ইলমদের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। একই কিতাবের আগে পরের বিশটি অধ্যায় পড়া হচ্ছে, কিন্তু মাঝের কয়েকটি অধ্যায় পড়া হচ্ছে না -এর যৌক্তিক কারণ কী? সাধারণত যে কারণগুলো দর্শানো হয়ে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কারণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি না? তা একজন তালিবুল ইলমকে অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।

### ইলমে দ্বীন শেখানো ফরয:

একজন মুসলমান যে ইলম শিখেছে তা যে জানে না তাকে শেখানো ফরয। যে ইলম না শেখানোর কারণে আমলে সমস্যা হচ্ছে সে ইলম শেখানো ফরয। যে ইলম জানতে চাওয়া হয়েছে সে ইলম শেখানো ফরয। যে ইলমের উপর আমল মওকূফ রয়েছে সে ইলম শেখানো ফরয। শরীয়তের যে সমস্যাটির সমাধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ দিতে রাজি নয় সে

মাসআলাটির সমাধান দেয়া একটি তাৎক্ষণিক ফরয, যাতে কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই।

মাদরাসার পদ্ধতিতে বর্তমানে ইলম শেখানোর যে পদ্ধতি রয়েছে সে পদ্ধতি না থাকলেও ইলম শেখানো ফরয। মাদরাসার গণ্ডিতে থেকে যে ইলম শেখানো যাচ্ছে না সে ইলম শেখানোও আলেমের উপর ফরয। মাদরাসার বর্তমান প্রচলিত অবকাঠামো সে ফরযকে মাফ করে দেয় কি না তাও খতিয়ে দেখা ফরয। মাদরাসা বেতন ঠিকমত না দিলেও ইলম শেখানো ফরয।

## ইলম ফরয ইলমের আওতায় আসতে হবে

মনে রাখতে হবে, কুফরী অঙ্গনে ইলম শব্দের ব্যবহার যেমনিভাবে কুফরী শিক্ষার উপর হচ্ছে, তেমনিভাবে ইসলামের অঙ্গনেও ইলম শব্দের ব্যবহার এমন অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে যা কখনো ফরয ইলমের আওতায় পড়ে না। ইলম ফরয ইলমের আওতায় আসতে হলে অবশ্যই সরাসরি আমলের ইলম হতে হবে, নয়তো কমপক্ষে আমলের ইলমের মাওকূফ আলাইহি হতে হবে। এর বাইরের ইলম হয়তো মুবাহ হবে, নয়তো মাকরূহ হবে, নয়তো হারাম হবে।

এমন কোন ইলমী বিষয় যা যথাযথ তাহকীক হওয়ার পর কোন বিলুপ্ত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা মুবাহ যিন্দা হবে না, এমনিভাবে যে তাহকীকের পর কোন একটি বিষয় মাকরূহ, হারাম বা কুফর হিসাবে প্রমাণিত হবে না, এমনিভাবে যে তাহকীকের পর কোন একটি বিষয় উপরোল্লিখিত বিষয়াদির মাওকূফ আলাইহি হিসাবে সাব্যস্ত হবে না -এমন তাহকীক ইলম অর্জনের কোন পর্যায়ে পড়ে তা খতিয়ে দেখা একজন তালিবুল ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইলম বিতরণের ক্ষেত্রে একজন আলেমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একজন তালিবুল ইলম যেসকল ফরয দায়িত্বের মুখোমুখী সেসব ফরয দায়িত্বের ইলম তাকে কতটুকু দেয়া হয়েছে এবং যতটুকু দেয়া হয়েছে তা তার উপর অর্পিত ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট কি না। যথেষ্ট হয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পরই তাকে এমন ইলম দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে যা তার মানকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। ইলমের মধ্যে ধার ও নূর পয়দা করবে।

মাদরাসার প্রচলিত পাঠ্যসূচি ও প্রচলিত ধারা ফরয ইলম আর্জনে বাধা হওয়ার জন্য ওযর হিসাবে যথেষ্ট কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। শরীয়তের মানদণ্ডেই তাকে মাপতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমলের জন্য ইলম, আর ইলমের জন্য মাদরাসা। আমাদের কোন আচরণে যেন এমন বোঝা না যায় যে, আমরা ইলমের ব্যস্ততার কারণে আমল করতে পারছি না, আর মাদরাসার ঝামেলায় ইলম অর্জন করতে পারছি না। যে ইলম আমলের জন্য সহায়ক ছিল

সে ইলম যেন আমলের জন্য বাধা না হয়ে যায়। এমনিভাবে যে মাদরাসা ইলমের জন্য সহায়ক ছিল সে মাদরাসা যেন ইলমের জন্য বাধা না হয়ে যায়। ইলম টিকানোর জন্য যেন আমলকে ছেড়ে দেয়া না হয় এবং মাদরাসা টিকানোর জন্য যেন ইলমকে ছেড়ে দেয়া না হয়।

### মাধ্যমের জন্য উদ্দেশ্যের কতটুকু কাটছাট করা যাবে?

প্রায় বলতে শোনা যায়, এ ফরয আমলগুলো করতে গেলে ইলমের চর্চা বিঘ্নিত হবে, আবার বলতে শোনা যায় ইলমের এ অধ্যায়গুলো আলোচনা করতে গেলে মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এ বাক্যগুলো ব্যবহারের শরয়ী বিধান জেনে নেয়া ফরয।

ইলমে দ্বীন শিখানোর শিরনামে কোন কোন হারাম ও কুফরকে আলিঙ্গন করা যাবে এর একটি তালিকা হয়ে গেলে ভালো হয়। এ নিয়ে খুব বিতর্ক চলছে এবং পেরেশানিও চলছে। মূর্তি, ছবি, পুষ্প-অর্ঘ্যদান, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, সুদের টাকা, ঘুষের টাকা, চুরির টাকা, ডাকাতির টাকা, মুরতাদের তাযিম, মুরতাদকে খওফ ও খশয়াত করে চলা, মুরতাদের নসীহত গ্রহণ, কাফেরের নসীহত গ্রহণ, অমুসলিমের জন্য আখেরাতে শান্তির দোয়া, বিদআতীর জন্য বিদআতী পদ্ধতিতে দোয়া, মুরতাদের জন্য মুরতাদের পদ্ধতিতে দোয়া, গুনাহগারের জন্য গুনাহের ফাউন্ডেশনের দীর্ঘ হায়াতের দোয়া, কাফেরের জন্য কুফরী ফাউন্ডেশনের দীর্ঘ হায়াতের দোয়া -এ সবইতো চলছে। এর সঙ্গে আর কী কী যোগ হতে পারে?

### গতিপথ আগে ঠিক করে নিলেই ভালো

ইলম বিতরণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইসলামের ফাউন্ডেশনগুলো প্রতিষ্ঠার পেছনে ইলমী মেধা ব্যয় হওয়া কতটুকু জরুরী, আর হারাম ও কুফরের ফাউন্ডেশনগুলোতে হালাল ও ঈমান খুঁজে পাওয়ার ছিদ্র তালাশ করা কতটুকু জরুরী। পবিত্র পানির সরোবর তৈরি করা কতটুকু জরুরী, আর ময়লার গহ্বরে পবিত্র থাকার জন্য পন্থা খুঁজে বের করা কতটুকু জরুরী। হারাম ও কুফরপ্রুফ জ্যাকেট পরে হারাম ও কুফরের গহ্বরে ডুবে থাকার শরয়ী বিধান কী এবং এর মেয়াদ কতকালের এবং এর নিশ্চয়তা কতটুকু। মদ্যশালায় হালাল শরবত তালাশ করার শরয়ী বিধান কী? আর পতিতালয়ে হালাল যৌন মিলনের পদ্ধতি খুঁজে বের করার শরয়ী বিধান কী? ইলম বিতরণের ক্ষেত্রে কথাগুলো মনে রাখতে হবে। ফরয দায়িত্ব কতভাবে আদায় হচ্ছে তা শরীয়তের আলোকে বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে।

ইলম বিতরণের দায়িত্বশীলগণ দৃষ্টি রাখতে হবে, কেউ কূপের মধ্যে মরা বিড়ালকে বের না করেই কূপের পানি বের করে তা পবিত্র করার চেষ্টা করে যাচ্ছে কি না। আজ এ লেখাটি আমি যখন লিখছি তখন থেকে সর্বোচ্চ দুই ঘন্টা আগের একটি কারগুজারি এখানে তুলে ধরছি-

## একটি নগদ কারগুজারী

এক তালিবুল ইলমের বাবা মারা গেছেন সপ্তাহ দশ দিন হবে। তার ছোট ভাইয়ের চাকুরীর বিষয়ে কথা হচ্ছে। একজন প্রস্তাব দিলেন, ওকে ব্যাংকের একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দাও। তাতে ঋণগুলো তাড়াতাড়ি শোধ হয়ে যাবে। কারণ লোন টোন নিতে সহজ হবে। তালিবুল ইলম বলল, না তা করা যাবে না। এসব হারাম পথ। মঙ্গলকামী আহত স্বরে বললেন, হারাম হবে কেন? ওতো আর ঘুষ টুস খাবে না। কত বড় বড় দাড়িওয়ালারা ব্যাংকে চাকরী করে না?! ইসলামী ব্যাংকে হুজুররা চাকরী করে না? তালিবুল ইলমটি বলল, এর জবাবে আমি কিছু বলতে পারিনি।

আসলে বলতে পারার কথাও নয়। এখানে বলার কিছুই নেই। মদ্যশালায় ও পতিতালয়ে যাওয়ার বৈধতা যখন দেশের সেরা সেরারা দিয়ে দেবেন তখন সেখানকার ছোট খাট সমস্যাগুলো জনগণ নিজে নিজেই সমাধান (?) করে ফেলতে পারবে। এর জন্য কোন মুফতীরও প্রয়োজন হবে না, মুহাদ্দিসেরও প্রয়োজন হবে না। পীরেরও প্রয়োজন হবে না, নেতারও প্রয়োজন হবে না।

তাই বলছিলাম, ইলম বিতরণের দায়িত্বশীলগণ ভেবে দেখতে হবে, হারাম ও কুফরের ফাউন্ডেশনে কী কী হালাল ও ঈমান পাওয়া যায় এর পেছনে আর কতকাল মেধা ও সময় ব্যয় করবেন?! এর মেয়াদ আর কত বাড়বে? শরীয়তের পক্ষ থেকে কত যুগ পর্যন্ত, কত শতাব্দী পর্যন্ত এর মেয়াদ দেয়া আছে? একটু ভাবতে হবে।

## জাল হাদীস বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকা ফরয:

এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। জাল হাদীস তৈরি করাকে কেউ কেউ কুফর বলেছেন। তবে তা হারাম হওয়ার বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং জাল হাদীস বানানো বা জাল হাদীস বর্ণনা করা সর্বাবস্থায় হারাম -এ কথাটি জানা সবার জন্য ফরয। ওয়ায়েয, মুবাল্লিগ, মুসলিহ, নেতা, মুআল্লিম, মুফতী, মুহাদ্দিস সবার জন্যই জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক তা বয়ান করা হারাম। জাল হাদীস দ্বারা উম্মতের ফায়দা হচ্ছে বলে মনে হলেও তা বর্ণনা করা হারাম। উম্মতকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর

উদ্দেশ্যেও জাল হাদীস বয়ান করা হারাম। উম্মতকে ইবাদতের উপর উদ্বুদ্ধ করার জন্যও জাল হাদীস বানানো ও বর্ণনা করা হারাম। নিজের সঠিক মতকে শক্তিশালী করার জন্যও জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম। শরীয়তের স্বীকৃত ও অকাট্য বিষয়গুলোর পক্ষেও জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম।

জাল হাদীস বর্ণনা করা শুধু মাত্র একটি উদ্দেশ্যে জায়েয। আর তা হচ্ছে, এ কথা বলার জন্য যে, এ হাদীসটি জাল। এটি আল্লাহর রাসূলের হাদীস নয়। এর উপর বিশ্বাস করা যাবে না এবং এটিকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা যাবে না।

## ভারি স্বর ও কথা থেকে বিরত থাকা চাই

জাল হাদীস প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করা হলে এমন ভারি কোন বয়ান করা যাবে না যার দ্বারা প্রশ্নকর্তা বিব্রত বোধ করে। বরং জাল হাদীসকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুস্পষ্ট মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। কোন প্রকারের প্রভাবেই মিথ্যাকে বুকে জড়িয়ে রাখার মনোভাব জিইয়ে রাখা যাবে না। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাব্য সকল পন্থা সাধারণ তালিবুল ইলম ও সাধারণ জনগণকে শিখিয়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামের ইতিহাসের সকল বাতিল ফিরকা জাল হাদীসের উপরই টিকে আছে। শিয়া, রাফেযী, নাসেবী, খারেজী, মুতাযিলা, মুস্তাশরিক, বেরেলভী, ভাণ্ডারী, আটরশী, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগীসহ আরো যত নামী বেনামী বাগী আছে সবাই এ জাল হাদীসগুলোর উপরই টিকে আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআহ তথা সিরাতে মুস্তাকীমের কর্ণধারগণ কখনো এ বিষয়ে শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই। ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে আগে ফিতনার সদর দরজা বন্ধ করতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদেরকে এসব বিষয়ে সতর্ক করতে হবে।

বিদআতের আদি ও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো সহীহ-হাসান হাদীস দিয়ে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি বলেই জাল ও বানোয়াট হাদীসের শরণাপন্ন হয়েছে। মিথ্যুকদের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিদআত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ণধার, দাবিদার ও অনুসারীরা মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের মতবাদের কোন অংশই তাদের নিজেদের আবিষ্কার করা নয়। নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে দলিল তালাশ করা হয়নি। বরং কুরআনে হাদীসে যা আছে তাকেই তারা মতবাদ বানিয়েছে। কুরআন হাদীসে যা নেই তাকে তারা

তাদের মতবাদের অন্তর্ভুক্তই করেনি। এটাই মূলনীতি। এতে পেরেশানীর কিছুই নেই।

### আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী বয়ান থেকে বিরত থাকা ফরযঃ

যারা বয়ান ও নসীহত করেন সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে দ্বীনের ও ইলমের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মনে করে থাকে। এ কারণে সিরাতে মুস্তাকিম তথা নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা যদি তাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা উম্মত বড় ধরনের গোমরাহীর শিকার হয়ে যাবে। তাই একজন বয়ানকারী ও ওয়ায়েজকে এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়।

অনেক সময়ই দেখা যায়, সাময়িক কোন সুবিধা অসুবিধাকে সামনে রেখে সহীহ আকীদা পরিপন্থী কথা সাধারণ মানুষের সামনে প্রচার করা হয়। এ ক্ষেত্রে সাময়িক সুবিধা ও আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে শরীয়তের মাসআলা অনুযায়ী যে কথা বলা বৈধ এবং জরুরী সে কথাগুলোই বলা চাই। রাসূলের নামে একটি মিথ্যা কথা বলে বোঝালে উম্মতের ফায়দা হবে, আকীদার বিপরীত একটি ঘটনা শুনালে শ্রোতারা আমলে উদ্বুদ্ধ হবে, কোন মিথ্যা কারামাত শোনালে শ্রোতারা দ্বীনী কথা শোনার প্রতি আগ্রহী হবে, আখেরাতের বিষয়ে সহীহ আকীদার খেলাফ কোন আশ্বাসবাণী শোনালে শ্রোতারা দ্বীনের প্রতি বেশী ধাবমান হবে -এ ধরনের বিষয়গুলো পরিহার করতে হবে।

এভাবে সাময়িক সুবিধার জন্য যদি সহীহ আকীদার খেলাফ কথা বলা, জাল হাদীস বলা, মিথ্যা কথা বলা এবং অসত্য প্রচার করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে প্রত্যেকেই নিজের মত করে দ্বীন ও শরীয়তের ছবি এঁকে ফেলবে, যার সঙ্গে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াস ভিত্তিক দ্বীন ও শরীয়তের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

### কুফরকে প্রকাশ্যে কুফর বলা ফরযঃ

কুফরের বিবরণে অস্পষ্টতার কোন সুযোগ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে বৈরি পরিবেশগুলো ছিল যখন কোন উম্মতের কাছে নবী এসেছেন এবং উম্মত নবীর কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ নবীকে সমর্থন করার মত কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেক নবী পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বোচ্চ বৈরি পরিবেশেই কুফরকে স্পষ্ট করে কুফর বলেছেন। প্রকাশ্যেও

বলেছেন এবং স্পষ্ট করেও বলেছেন। অপ্রকাশ্য ও অস্পষ্ট করে বলার দ্বারা কখনো দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে না।

দ্বিতীয়তঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আরেকটি সুন্নত হচ্ছে, প্রত্যেকের যামানায় উম্মত যে কুফরীতে লিপ্ত ছিল সে কুফরীর কথাই সবার আগে স্পষ্ট করে বলেছেন। ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছেন।

সত্যকে স্পষ্ট করে বলার পরও যেখানে বুঝতে রাজি নয় সেখানে সত্যকে আট কুঠরী নয় দরজার ভেতর থেকে বললে উম্মত কীভাবে তা বুঝতে পারবে।

উম্মত যত প্রকারের কুফরীতে লিপ্ত আছে প্রত্যেক প্রকারকে স্পষ্ট উল্লেখ করে করে দেখিয়ে দেয়া ফরয। এ হচ্ছে দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব। দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে মনে করলেই যে ছুটি হয়ে যাবে তা নয়; বরং তখন বর্তাবে এর পরবর্তী ফরয।

**হারামকে প্রকাশ্যে হারাম বলা ফরযঃ**

ঈমান কুফরের ন্যায় হারামকেও প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট করে হরাম বলা ফরয। না বলা হলে দাওয়াত ও তালীমের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে না। হারামকে হারাম বললে উম্মত বিগড়ে যাবে, কুফরকে কুফর বললে উম্মত বিগড়ে যাবে, ফরযকে ফরয বললে উম্মত বিগড়ে যাবে -এ ধরনের আবেগনির্ভর মানসিকতার দোহাই দিয়ে ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

ফরযকে ফরয বলার কারণে কত হাজার বিগড়ে গেছে, হারামকে হারাম বলার কারণে কত হাজার উম্মত বিগড়ে গেছে, কুফরকে কুফর বলার কারণে কত হাজার উম্মত বিগড়ে গেছে, সীরাতের সত্য অংশগুলো তুলে ধরার কারণে উম্মতের কত হাজার বিগড়ে গেছে -এ ধরনের ঘটনাবলির দোহাই দিয়েও এ ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

মক্কী জীবনের মানসূখ-রোহিত হুকুমের উদ্ধৃতি দিয়েও এসব ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। মোটকথা কুরআন হাদীসের আলোকে গৃহীত ফিকহের কোন সিদ্ধান্তকেই আবেগ ও কাল্পনিক হেকমত দিয়ে উপেক্ষা করা যাবে না।

**ইলহাদ ও যানদাকা ধরিয়ে দেয়া ফরযঃ**

মুলহিদ ও যিন্দীক হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের জন্য সবচাইতে বেশি ভয়ঙ্কর। তাই কোন মুলহিদ বা যিন্দীকের একশত নেক আমলের কারণে

একটি কুফরকেও এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইলহাদ ও যানদাকাকে লালন করার জন্য উন্মুক্ত ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে কাফের বলে দেয়া জঘন্য অপরাধ তেমনিভাবে একজন কাফেরকেও মুসলমান মনে করা জঘন্য অপরাধ এবং তা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধ। মুসলমানকে কাফের বলার দ্বারা সমাজ ঐভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাফেরকে মুসলমান বলার দ্বারা। একজন কাফের, যিন্দীক ও মুলহিদকে মুসলমান বলার দ্বারা তার কুফর, যানদাকা ও ইলহাদকে বৈধতা দেয়া হয় এবং সুযোগ সন্ধানীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়।

সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে, একজন মানুষের অন্তরের খবর নেয়া কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তাই একজন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কথা ও কাজ দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তার অন্তর খোঁদাই করে নয়। তাই যে কথা ও কাজগুলোকে ফিকহের কিতাবাদিতে কুফর বলা হয়েছে সেসব কথা ও কাজের ভিত্তিতেই তাকে কাফের বলার সুযোগ দিতে হবে এবং সে ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

নচেৎ নিজেকে খোদা বলে দাবি করার পরও যেভাবে খাঁটি মুওয়াহহিদ হওয়ার কৌশল আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে হিসাবে পৃথিবীতে কুফরের তুফান চলতে থাকবে কিন্তু কাউকে কাফের বলা যাবে না। ৯০/৯৫% মানুষ কুফরী কথা, কাজ ও বিশ্বাসে লিপ্ত আছে স্বীকার করেও আমরা ৯২% মানুষ মুসলমান হওয়ার দাবি করে চলেছি।

সাধারণ ওলামায়ে কেরাম, তালিবুল ইলম ও সাধারণ মুসলমানদের ঈমানকে বাঁচাতে হলে কাফের, যিন্দীক ও মুলহিদকে কাফের, যিন্দীক ও মুলহিদ বলে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। নচেৎ আহবারে ইয়াহুদ ও রুহবানে নাসারার সঙ্গে আমাদের পার্থক্যগুলো কোথায় তা খুঁজে বের করতে হবে।

**দারের ইলম ফরয:**

একজন মুসলমানকে জানতেই হবে সে দারুল ইসলামে বাস করছে না কি সে দারুল হারবে বাস করছে? কারণ তার প্রতিদিনের শত শত মাসআলা, তার সারা জীবনের মাসআলা এর সঙ্গে জড়িত। একজন সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একজন আলেমকে সিদ্ধান্তের পক্ষের দলিল বুঝিয়ে দিতে হবে। সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।

লুকোচুরি খেলার পথ বন্ধ করতে হবে। ধমক দিয়ে, তিরস্কার করে, ব্যক্তিগত দুর্বলতার উপর হাত দিয়ে, কুফরী শক্তির ভয় দেখিয়ে, বদদোয়ার ভয় দেখিয়ে, কোন কারামাত দেখিয়ে, ভবিষ্যৎবাণী করে, ধৈর্য ধরার কথা বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না।

**শাসকের ধর্ম সম্পর্কে জানা ফরয:**

একজন মুসলমান যে শাসকের অধীনে বাস করছে সে শাসক কোন ধর্মের অনুসারী তা অধীনস্ত মুসলমানকে জানতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদী, নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, শিখ না কি মুসলমান তা একজন মুসলমানকে অবশ্যই জানতে হবে। একজন মুসলমানের প্রতিদিনের শত শত মাসআলা এর সঙ্গে জড়িত।

যে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে চাপিয়ে দিয়ে আমরা শত শত ফরয দায়িত্ব পালন করা থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যেতে পারছি, সে রাষ্ট্র প্রধানের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সিদ্ধান্তের পক্ষে কেউ দলিল চাইলে তাকে দলিল বুঝিয়ে দেয়ার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। দলিল দেখাতে আগ্রহ না থাকাটা দলিলের দুর্বলতাকে প্রমাণ করে। তাই ইলমী মুযাকারার উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ইলমী মুনাকাশার মধ্যে 'বেয়াদবী' শব্দটিকে টেনে এনে ইলমী মুনাকাশার মানকে ক্ষণ্ন করা যাবে না।

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে সে বিষয়ে অবশ্যই পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করতে হবে। উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার আলোকে সামনে বাড়তে হবে। নেকাহ তালাকের অভিজ্ঞতা দিয়ে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না।

**মোটকথা**

মোটকথা ঈমানের সাতাত্তর শাখার প্রত্যেকটি সম্পর্কে ইলম অর্জন করতে হবে। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ফরয আমলের তালিকা এখানে দেয়া সম্ভব নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, ফরয ইলমের প্রথম সারিতে রয়েছে ঈমানের সাতাত্তর শাখা। এর সঙ্গে রয়েছে সাতাত্তর শাখার সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রচলিত প্রতিটি বদদ্বীনী।

তাই একজন মুসলমান তার ইলমের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে হলে সাতাত্তর শাখার প্রত্যেকটিকে সামনে আনতে হবে। প্রত্যেকটির আলোকে নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। ফিকহের কিতাবের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম হাসিল করতে হবে। প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টাতে হবে। নির্বাচিত অধ্যায়গুলো পড়ার

অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত রুচি ও কিতাবের বিপরীত বয়ান না করে কিতাবের প্রতিটি কথা কিতাবের মত করে তালিবুল ইলমদের সামনে তুলে ধরতে হব। তবেই আমরা আমাদের প্রতিদিনের ফরয দায়িত্বের তালিকা পেয়ে যাব। ইনশাআল্লাহ।

وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما

**সংযুক্ত**

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

# পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা

**'দারুল উলূম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি'** বইটির বয়স একেবারেই সামান্য। সর্বোচ্চ দুই মাস হবে। কিন্তু এরই মধ্যে পাঠক মহলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে। একজন লেখককে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য আরেকটু সময় দেয়ার দরকার ছিল। এতে লেখকের জন্য একটু সুবিধাজনক হলেও পাঠকের এমন কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেত না। বিশেষত একজন নবীন ভাবুক বা বলা যায় একজন অপরিপক্ক কাঁচা পেরেশান হাল তালিবুল ইলমের একটি ভাবনাকে এতটা কঠিনভাবে আঘাত না করে লেখকের মনের অবস্থা এবং চলমান পৃথিবীর অবস্থাকে তুলনা করে আমাদের কী করা উচিৎ সে দিকটা নিয়ে ভাবার পেছনে মেধা বেশি ব্যয় করলে আমার মনে হয় উম্মতের বেশি ফায়দা হত।

এ বইয়ে বিবৃত সমস্যাগুলো যদি বাস্তবিক সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এর উপর যে মন্তব্যগুলো করা হচ্ছে এবং যেভাবে করা হচ্ছে এভাবে কি এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব? এই বইয়ের লেখক হওয়ার অপরাধে আসামী হিসাবে বইয়ের উপর কৃত আপত্তিগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত জবানবন্দি আমি দিয়ে যাব। কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার করাতো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই পাঠকের মন্তব্য পাঠকের আদালতেই আমি তুলে ধরলাম। **কারণ, সর্বাবস্থায় পাঠক পাঠকের আপন। আর লেখকের মত অপরাধী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।**

যদি শুধু লেখাটাই একটা জঘন্য অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে একটি লেখা কেন তৈরি হয়েছে? প্রেক্ষাপটটা কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে? লেখাটার উপকারিতা কতটুকু? শতকরা কত ভাগ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত

হচ্ছে, একটি গর্হিত কাজ, চিন্তা, পদ্ধতি থেকে বাঁচার জন্য যে ফরয দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা অতিক্রম করে চলছি কি না? -এ সকল বিবেচনাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত রুচিবহির্ভূত হওয়ার কারণে, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিপরীত হওয়ার কারণে একটি লেখাকে কেন এতভাবে আঘাত করা হবে?! একজন সমালোচকও এ দাবি করছেন না যে, এ বইয়ের এ কথাটি বাস্তবভিত্তিক নয়, বা এ কথাটি শরীয়তের উসূলের আলোকে ভুল। কিন্তু আঘাতমূলক শব্দের ব্যবহারে কারো কোন কমতি নেই। ওয়া ইলাল্লাহিল মুশতাকা।

বইয়ের প্রশংসা যে করা হয়নি এমন নয়। শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পাঠকের পক্ষ থেকেই ভালো ভালো মন্তব্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য পেয়েছি। কিন্তু সেসব প্রশংসার কিছু আছে আমার প্রতি স্নেহের আতিশয্যে, কিছু আছে এমন যা 'ইতরাউল মাদিহ' বা স্তাবকের মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি, আর কিছু আছে এমন যা শুধুমাত্র আমাকে উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে। আর কিছু বাস্তবিক প্রশংসা থাকতেও পারে যা উপযুক্ত পাত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে কি না তা নিয়ে পাঠকের যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে এবং এ সন্দেহের যথেষ্ট পরিমাণ কারণও রয়েছে।

যাই হোক প্রশংসার কথাগুলো শুনে পাঠকের কোন লাভ নেই। আমাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকলে উদ্দেশ্য আদায় হয়ে গেছে। আমি প্রয়োজন পরিমাণ উৎসাহ বোধ করছি। অতএব এখানে পাঠকের সমালোচনাগুলোকেই তুলে ধরছি। পাঠকের আদালতে পাঠকের ভাবনা তুলে ধরতে গিয়েও আমার যথেষ্ট পরিমাণ ভুল হবে। এটা আমি জানি। তবু আমার মনে হয় বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবাই একসাথেই ভাবি। কারণ সমস্যা সবার। আমার একার নয়। তাই আমি একা তা হজম করতে চাই না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করুন। আমীন।

**১. পাঠক:** প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত উচ্চমাধ্যমিকের একজন তালিবুল ইলম।

**ভাবনা:** মনে হয় শুধু ওনারাই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না।

**লেখকের জবানবন্দি:** 'কেউ বোঝেনি' এমন কোন কথা বা এমন কোন ইঙ্গিত এ বইয়ে নেই।

**২. পাঠক:** উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষাবিদ। এক সময় আমাকে ভালোবাসতেন, এখন কি অবস্থা জানি না।

**ভাবনা:** আসল যে কথাটি লিখতে চেয়েছেন তা শেষ করলেন না কেন?

**লেখকের জবানবন্দি:** এটা একেবারেই একটি সন্দেহমাত্র।

**৩. পাঠক:** সেরা আলেমগণের একজন

**ভাবনা:** মারাত্মক! এসব কথা লিখার কী প্রয়োজন?

**লেখকের জবানবন্দি:** প্রয়োজনটা ‘একান্ত আলাপন’ এবং এসব কথার আগে পরে বলা হয়েছে।

**৪. পাঠক:** তরুণ আলেম। এক সময় আমাকে খুব ভালোবাসতেন, এখন আর ভালোবাসবেন কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

**ভাবনা:** কারো বাবা মদ খেলে কি তিনি তা লিফলেট লিখে প্রচার করবেন?

**লেখকের জবানবন্দি:** বাবার সমস্যা নিয়ে লেখা লিফলেট বাবার কাছেই পাঠানো হয়েছে। আর পাঠানো হয়েছে বাবা মদ খাওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পর। এর আগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয়েছে।

**৫. পাঠক:** বড়দের অনুসরণের দাবিতে পদকপ্রাপ্ত তরুণ আলেম।

**ভাবনা:** এ লেখায় মনের ব্যথা আছে ঠিক, তবে ক্ষোভও রয়েছে অনেক।

**লেখকের জবানবন্দি:** কার বিরুদ্ধে?! কার উপর?! কিসের জন্য? দ্বীনের জন্য না কি পার্থিব স্বার্থের জন্য?

**৬. পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার, মুফতী, মুহাদ্দিস।

**ভাবনা:** দরসের মধ্যে কতো কথাই এসে যায়, আমরা কি জিহাদ অস্বীকার করি না কি?!

**লেখকের জবানবন্দি:** হাদীস-তাফসীরের দরসে অস্বীকার করার পর স্বীকার করার ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাচ্ছে?

**৭. পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার যিম্মাদার। এক সময় আমাকে খুব পছন্দ করতেন। এখন একদম পছন্দ করেন না

**ভাবনা:** বড় হলে মানুষ গোঁয়ার হয়ে যায়।

**লেখকের জবানবন্দি:** কথাগুলো আর কীভাবে বললে এ বদনাম থেকে বাঁচা যাবে?! চলমান পৃথিবীতে গোঁয়ারের সংজ্ঞা হচ্ছে, ইসলামের যে কোন বিধানকে শক্ত করে ধরে রাখা। পরিস্থিতির হাতে শরীয়তের বিধানকে ন্যস্ত করে দিলেই এ বদনাম থেকে বাঁচা যাবে।

**৮. পাঠক:** উচ্চ মাধ্যমিকের তালিবুল ইলম। প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

**ভাবনা:** (যে উস্তাযের মাধ্যমে সে বইটি পেয়েছে তাঁর ব্যাপারে) বেয়াদব।

**লেখকের জবানবন্দি:** বেয়াদবের সংজ্ঞা তালাশ করছি। মিলাতে পারছি না।

**৯. পাঠক:** দরজা উলয়া-স্নাতকের তালিবুল ইলম।

**ভাবনা:** (ধমকের সুরে) এসব তথ্য লেখককে কে সরবরাহ করেছে?!

**লেখকের জবানবন্দি:** সরবরাহকারীর বিচার হলে কি মূল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

**১০. পাঠক:** রাজধানীর শীর্ষ পর্যায়ের মাদরাসার যিম্মাদার।

**ভাবনা:** যেসব বইয়ে আমাদের আকাবিরের তাকরীয নেই সেসব বইয়ের কোন নিশ্চয়তা নেই, সেসব বই পড়বে না।

**লেখকের জবানবন্দি:** আকাবিরের একটি সংজ্ঞা ও বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করলে লেখকদের জন্য সুবিধা হতো। আর দলিলের পেছনে, তথ্যের পেছনে সময় ব্যয় না করে তাকরীয সংগ্রহের পেছনে সময় ব্যয় করা একজন লেখকের জন্য অবশ্যই অনেক সহজ। আমার বয়সের অর্ধেক বয়সের তরুণরা বিভিন্ন বইয়ের তাকরীয লিখে দিয়ে আকাবির হচ্ছে। আমরা কি তাদের পেছনে একটু সময় ব্যয় করবো? আকাবিরের তাকরীযগুলো বর্তমানে কীভাবে সংগ্রহ করা হয় তা কি মন্তব্যকারীরা জানেন না?

**১১. পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার।

**ভাবনা:** كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

**লেখকের জবানবন্দি:** আমি বইয়ে বলেছি, ঘটনাগুলোর নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি আমার কাছে আছে। মন্তব্যকারী নিজেও জানেন তিনি এবং তাঁর মত লোকেরা এ ঘটনাগুলো অহরহ ঘটিয়ে চলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রশ্নের সম্মুখিন হবেন বলেই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়নি। এটাই যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাসহ লিখে দেব।

**১২. পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বড় হুজুর। যিনি আমাকে ভালোবাসতেন, এখনো আশা করি ভালোবাসেন।

**ভাবনা:** সবাই খালি মুসলিহ হয়ে যায়!

**লেখকের জবানবন্দি:** এই বইয়ে ইসলাহের পথ খুঁজতে বড়দের কাছে আবদার করা হয়েছে মাত্র।

**১৩. পাঠক:** সিনিয়র মাদরাসার সিনিয়র যিম্মাদার।

**ভাবনা:** এটা কি ইসলাহের কোন পদ্ধতি হল?!

**লেখকের জবানবন্দি:** কোন পদ্ধতিই পাইনি। এটাও কোন পদ্ধতি নয়। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র পরিস্থিতির উপলব্ধি। তবে এতটুকু বলা যায় যে, থানভী রহ. এর 'ইসলাহুর রুসূম' 'আলইলমু ওয়ালউলামা' একটা লেখাই। 'প্রচলিত জাল হাদীস' 'প্রচলিত ভুল' লিখিত কর্মই।

সহজ একটি প্রশ্ন এখানে আসতে পারে, আপনি কি আশরাফ আলি থানভী হয়ে গেছেন? নিজেকে আশরাফ আলি থানভী মনে করছেন?

এক্ষেত্রে আমার নিবেদন হচ্ছে, আশরাফ আলি থানভী রহ. নিজেকে মুজাদ্দিদে আলফেসানী মনে করে কাজগুলো করেননি। নিজেকে আশরাফ আলি মনে করেই করেছেন। আমিও নিজেকে যুবায়ের মনে করেই করেছি। জরুরী কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেকে আরেক জন মনে করতে হবে কেন? আর নববী আদর্শের অনুকরণে কাজ করার অর্থ কি নিজেকে নবী মনে করা?

আমরা কি আসলে সমস্যাগুলোকে সমস্যা মনে করছি না? না কি এর সমাধানের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই?

**১৪. পাঠক:** আমার ধারণামতে একজন রুচিশীল সচেতন আলেম। আমাকে ভালোবাসেন বলেই আমি ধারণা করি। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন।

**ভাবনা:** ইখলাসের সাথে লিখে থাকলে ঠিক আছে।

**লেখকের জবানবন্দি:** লেখকের ইখলাসে ত্রুটি থাকলেও বাস্তব সমস্যার সামাধান খুঁজে বের করতেই হবে। বাকি ইখলাসের দুর্বলতা থেকে আল্লাহ সবাইকে হিফাযত করুন।

**১৫. পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক।

**ভাবনা:** বলতে সবাই পারে। পারলে উনি একটা করে দেখাক!

**লেখকের জবানবন্দি:** অনেকেতো বলেন, এ কথাগুলো মিথ্যা। তাহলে সবাই বলতে পারে কীভাবে বুঝি? আর অভিযোগকারী সম্ভবত চাঁদাবিহীন মাদরাসা করার কথা বলছেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে কেন নতুন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে? দেশে কি এর বাস্তব উদাহরণের অভাব আছে? আর উদাহরণ দিলে যদি অজুহাত বের হয় 'উনি ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি। উনার সঙ্গে আমাদের উদাহরণ চলে না' তখনতো লেখক আবারো অসহায়।

**১৬. পাঠক:** পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক।

**ভাবনা:** উনি মুহতামিম নয়তো এ কারণে। যদি মুহতামিম হতেন তাহলে বুঝতেন।

**লেখকের জবানবন্দি:** সেই আদি ও আসল উক্তি। যার অর্থ হচ্ছে, বাদশাহের ভুল ধরতে হলে নিজে বাদশাহ হতে হবে এবং মেথরের ভুল ধরতে হলে নিজে মেথর হতে হবে এবং লেখকের ভুল ধরতে হলে লেখক হতে হবে।

**১৭. পাঠক:** ইলম ও আমলে অনুসরণীয় দেশের শীর্ষ কয়েক জনের একজন। শারাফত ও ভদ্রতায় আমার দেখা অদ্বিতীয়। আমাকে অনেক স্নেহ করেন। আশা করি এখনো করেন, সামনেও করবেন।

**ভাবনা:** কোন মুরুব্বী নেইতো! এই কারণে।

**লেখকের জবানবন্দি:** আমার মুরুব্বী আছে। মুরুব্বীদের নাম ভাঙ্গিয়ে অতীতে বহু পুল পার হয়েছি। যেখানে বাবার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে বাবার নাম বিক্রয় করেছি। যেখানে নানার নামের মূল্য বেশি ছিল সেখানে নানার নাম বিক্রয় করেছি। আর যে অঙ্গনে মারকাযুদ দাওয়ার মূল্য বেশি সেখানে মারকাযের নাম বিক্রয় করে খেয়েছি। কিন্তু যে কাজে সবার নাক এক সঙ্গে কাটা যাবে সে কাজের বদনাম মুরুব্বীদের উপর চাপাতে চাইনি। তবে মুরুব্বী ছাড়া করিনি। পরামার্শ ছাড়াও করিনি। খুব তড়িঘড়িও করিনি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিন্তা না করেও করিনি।

**১৮. পাঠক:** সাবেক মুহতারাম

**ভাবনা:** এর দ্বারা একজনের দোষ সবার উপর চাপানো হয়েছে।

**লেখকের জবানবন্দি:** শত্রু যেন স্খলিত ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্খলিত অংশ দিয়ে সবার বদনাম করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বই লিখা হয়েছে, তাই সে কথাটিই বার বার উচ্চারণ করা হয়েছে।

**১৯. পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

**ভাবনা:** জীবনের সব ক্ষোভ এক সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছেন।

**লেখকের জবানবন্দি:** কার উপর এ ক্ষোভ? এর কোন বিষয়টি লেখকের ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত? একান্ত যদি ক্ষোভ হয়ও তবু এ লেখক কি البغض في الله এর একটি সাওয়াব পাওয়ার অধিকার রাখে না?

**২০. পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

**ভাবনা:** যে কাজটি নাস্তিকরা করতো সে কাজটা তিনি করে দিয়েছেন।

**লেখকের জবানবন্দি:** নাস্তিকরা কয়েক দশক আগে থেকেই অডিও, ভিডিও, সিনেমা, নাটক, লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং ভয়ঙ্করভাবে দিয়ে চলেছে, যার খবরও আমরা পাইনি। যারফলে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে বিপজ্জনক হারে বিগড়ে গেছে এবং বিগড়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের শুধরানোর সুযোগ হয়নি। তাই আমাদের শুধরানোর পথ খুঁজে চলেছি। কিন্তু বড়দের মন্তব্যের আলোকে মনে হচ্ছে, এ পথও কঠিন। আখের কী হবে? আমরা কী করব?!

**২১. পাঠক:** উচ্চতর শিক্ষা-তাখাসসুস বিভাগের মুশরিফ।

**ভাবনা:** পরবর্তীদের উপর দোষ চাপিয়ে আকাবিরে দেওবন্দকে যতটা ত্রুটিমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা কি বাস্তবেই এতটা ত্রুটিমুক্ত? মনে হয় এ ক্ষেত্রে বেশি পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেছে।

**লেখকের জবানবন্দি:** বাস্তবে এতটাই ত্রুটিমুক্ত। শুধুমাত্র মানবিক দুর্বলতার কারণে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই তাঁদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর যতটুকু ত্রুটি প্রকাশ পেতেই পারে ততটুকু আমরা স্বীকার করেছি। অন্যায় পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই আসতে পারে না।

**২২. পাঠক:** দাওয়াতী কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মুতালাআর প্রতি আগ্রহ আছে। আমার প্রতি ভালো ধারণা রাখতেন। এখন কি অবস্থা জানি না।

**ভাবনা:** বইয়ের উপস্থাপনায় মনে হয় দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ হচ্ছে হকের মাপকাঠি এবং একমাত্র মাপকাঠি। উসূলে শরীয়তের আলোকে এ মানসিকতা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

**লেখকের জবানবন্দি:** আকাবিরে দেওবন্দকে একটি فئة مجددة সংস্কারক কাফেলা হিসাবে এবং ভারত উপমহাদেশের জন্য সবচাইতে বড় সংস্কারক কাফেলা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখকের বিশ্বাস এখনো এটাই এবং এ বিষয়ে লেখকের কোন দ্বিধা নেই।

**২৩. পাঠক:** একজন জুনিয়র ইসলামী চিন্তাবিদ

**ভাবনা:** তিনি দ্বীনের প্রত্যেক বিভাগের কাজের ভুল ধরেছেন, তাহলে আমরা কি শুধু উনাকেই আকাবির হিসাবে মেনে চলব?

**লেখকের জবানবন্দি:** এ মুহতারাম সম্ভবত রাগের মাথায় বইটি পড়েছেন। এই বইয়ে বলা হয়েছে, দ্বীনের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতার কারণে যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে তার কারণে দ্বীনী কাজের ঐ বিভাগটি দায়ী হবে না, দায়ী হবে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তির বিশেষ চিন্তা-চেতনা।

আর আকাবির হওয়ার কোর্সে এ লেখক এখনো ভর্তি হয়নি। তাই পাঠক ভুল করলে সে জন্য লেখক দায়ী থাকবে না।

**২৪. পাঠক:** তরুণ, যোগ্য গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

**ভাবনা:** এটা হুজুরের তাফাররুদ।

**লেখকের জবানবন্দি:** এ বইয়ের কোন বিষয়টি, কোন দাবিটি, কোন তথ্যটি এবং কোন মাসআলাটি এমন যা এ লেখকের কলম দিয়ে সর্ব প্রথম বের হয়েছে এবং এর কোন গ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না। আর যদি 'তাফররুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, স্বীকৃত এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে 'তাফাররুদ', অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কেউ কথা বলেনি, তাহলে পরিভাষাটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে কেমন?

**২৫. পাঠক:** আমার উস্তাযে মুহতারাম। অনেক মুহাব্বত করেন। এখন মনে হচ্ছে মনে খুব ব্যথা পেয়েছে।

**ভাবনা:** ইলিয়াস মানতেকীর মতো হয়ে গেছে। যে টুপি মাথায় দেয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল।

**লেখকের জবানবন্দি:** আশা করি এমন হয়নি এবং হবেও না। আল্লাহ হিফাযত করুন। সবার কাছে দোয়া চাই। বদদোয়া দিয়ে নিজেদের ছেলের ক্ষতি করলে শত্রুই খুশি হবে।

**২৬. পাঠক:** সাবেক মুহতারাম।

**ভাবনা:** আহ হা! আফসোস। একটা প্রতিভা লাইনচ্যুত হয়ে গেল!

**লেখকের জবানবন্দি:** আলহামদু লিল্লাহ প্রহরী আছে। উসূলে শরীয়াহ, উসূলুদ দাওয়াহ, উসূলুল হাদীস, উসূলুল ইসলাহ কোনটির আলোকে কোন ভুল এখনো কেউ উপস্থাপন করেনি। তাই এখনই নিরাশ না হয়ে ভালো কিছু আশা করলেই ভালো হবে। শুনেছি, বাবা মনে কষ্ট পেলেও ছেলেকে বদদোয়া দেয় না। বাবার মনোকষ্টের চাইতে ছেলের আবদারটাই নাকি বড়। তাই আমিও সে আবদার করতে পারি।

আর আকাবিরের পথ ত্যাগ করার কোন চিন্তা আলহামদু লিল্লাহ এখনো মাথায় আসেনি। কিন্তু এ অশুভ কথাটি বার বার উচ্চারণ করার কারণে যদি আমাদের কোন পক্ষের কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে আমি সঠিক বিচার পাব। এ বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস আছে।

**২৭. পাঠক:** এক বিদেশী সাহায্যনির্ভর মাদরাসার যিম্মাদার।

**ভাবনা:** ...... (এক হক্কানী বুজর্গ) এর (গোমরাহ) ছেলে ......র মতো হয়ে গেল।

**লেখকের জবানবন্দি:** নাহ! এখনই এ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। গোমরাহীর উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন না করে, অবস্থার সঠিক উপলব্ধি মাথায় না এনে, সমস্যা সামাধানের কোন কর্মকাণ্ড হাতে না নিয়ে, এত কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরেকটু ভাবার দরকার ছিল। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন। বেরেলভী ও গায়রে মুকাল্লিদদের মত শুধুমাত্র নিজের মতের বিপরীত হলেই গোমরাহ ফাতওয়া দিলে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন আশা করা যায় না।

**২৮. পাঠক:** প্রচলিত ইসলামী রাজনীতির জেলা যিম্মাদার। যার কাছে আমি এখন কাবাবের হাড্ডি হয়ে আছি। ফেলতে গেলে গোশতসহ লোকমা ফেলে দিতে হয়।

**ভাবনা:** যুবায়ের সাহেব একটা বই লিখেছেন, সে বইটা যেই পড়বে সেই মনে করবে, বইটা তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে।

**লেখকের জবানবন্দি:** হাঁ! খোদ লেখকেরও একই অবস্থা! খোদ লেখকও বইটা পড়লে লেখকের মনে হয় কথাগুলো লেখকের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। আসলে সমস্যাগুলো এতটাই ব্যাপক হয়ে গেছে যা থেকে আমরা কেউই বেঁচে থাকতে পারছি না। কিন্তু বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে, প্রতিকারের চিন্তা না করে বোঝা আর বাড়াতে চাই না। আমরা আসলে সবাই আসামী।

**২৯. পাঠক:** ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে বিশ্বাসীদের কাছে পড়ুয়া এক তালিবুল ইলম, যার অনুসৃত এ মুহূর্তে বৌদ্ধদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, তাদেরকে অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা বুঝিয়ে এখন এক মাসের সফরে ইহুদী-খৃস্টানদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এবং অস্ত্রবিহীন জিহাদের সংজ্ঞা মুখস্থ করছেন এবং করিয়ে চলেছেন।

**ভাবনা:** এ বইয়ের লেখক ইহুদী-খৃস্টানের দালাল।

**লেখকের জবানবন্দি:** ছোট ভাই মনে হয় ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ও তাদের দালালদের যৌথ মহড়ার ছবি, ভিডিও, অডিওগুলো কখনো দেখেনি। উভয়ের যৌথ বিবৃতি, বক্তব্য ও লেখাগুলো দেখেনি। দেখলে চেহারাগুলো চিনতে এত কষ্ট হত না।

আর ছোট ভাই! সমস্যাগুলো সঠিক হয়ে থাকলে বাঁচার চেষ্টা কর, বাঁচানোর চেষ্টা কর। লেখকের দুর্বলতার কারণে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না।

**৩০. পাঠক:** উচ্চতর মাদরাসার সিনিয়র উস্তায।

**ভাবনা:** (না পড়েই ছাত্রদের থেকে বইয়ের কিছু বক্তব্য শুনে বই ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়ে) এ লেখক কি শায়খুল হাদীস সাহেব, আমিনী সাহেবদের থেকেও বেশি বোঝে? আমরা অর্থ কালেকশনের সময় মানুষের প্রতি হুসনে যন্-সুধারণা রাখি।

**লেখকের জবানবন্দি:** বইটি নিজে পড়ে দেখলে হয়তো মুহতারামের এ পেরেশানিটুকু হতো না। এ লেখক শুধুমাত্র নিজের কষ্টের কথা এবং বিপরীতমুখী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজছে।

**৩১. পাঠক:** তরুণ মাদরাসাশিক্ষক।

**ভাবনা:** লোকটা আহলে হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদ।

**লেখকের জবানবন্দি:** আমার জীবনের সর্ব প্রথম ছাপানো বই আহলে হাদীস-গায়রে মুকাল্লিদদের আসল চেহারা উন্মোচন বিষয়ে। ইলমে হাদীসে ইমাম আবু হানীফার মকাম নিয়ে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই লিখেছি। হানাফী মাযহাবের পক্ষে সিরিজ আকারে বই চলছে। নিয়মিত এ বিষয়ে সেমিনার করে চলেছি। শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমি আর কি করতে পারি?!

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

***************************************

# وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

লেখকের যেসব বই বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে

## ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

(হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবনে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবদান)

## ইত্তিবায়ে রাসূল সিরিজ ১-৮

সিরিজ-১ হাদীসের অনুসারীদের প্রতি

সিরিজ-২ মাযহাব ও তাকলীদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির কিছু প্রশ্নের জবাব

সিরিজ-৩ সালাতুত তারাবীহ

সিরিজ-৪ তিন তালাকের বিধান

সিরিজ-৫ جزء طلاق الثلاث

সিরিজ-৬ পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্য

সিরিজ-৭ জানাযা ও গায়েবানা জানাযার নামায

সিরিজ-৮ সালাতুল বিতর

## আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ ১-২

সিরিজ-১ দারুল উলূম দেওবন্দ : পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি

সিরিজ-২ দারুল উলূম দেওবন্দের শত্রু-মিত্র

বই পেতে: ০১৮৪৫৯১৩৬১৩